# পরার্থপরতার অর্থনীতি

আকবর আলি খান

# পরার্থপরতার অর্থনীতি

# পরার্থপরতার অর্থনীতি

আকবর আলি খান

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০২) ৯৫৬৫৪৪১, ০১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ২০০০
চতুর্দশ মুদ্রণ ২০১৬

স্বত্ব © দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

*প্রচ্ছদ*
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

ISBN 978 984 8815 31 1

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। কম্পিউটার ফরমেটিং: মোঃ নাজমুল হক। এএমএস এন্টারপ্রাইজ, ২৬২/ক ফকিরাপুল, ঢাকা-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

*Pararthoparatar Arthaniti* by Akbar Ali Khan, published in August 2000 by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh.

**উৎসর্গ**

হামীমকে

"অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে ॥"

# সূচী

*ভূমিকা* ix
পরার্থপরতার অর্থনীতি ১
"শূয়রের বাচ্চাদের" অর্থনীতি ১১
সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি ২৩
মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের অর্থনীতি ৩৫
বাঁচা-মরার অর্থনীতি ৪৫
আজি হতে শতবর্ষ পরে : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ৫৫
শোষণের রাজনৈতিক অর্থনীতি ৬৯
লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি ৮১
খোলা ম্যানহোলের রাজনৈতিক অর্থনীতি ৯৩
বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক অর্থনীতি ১০৫
শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অসাম্য ১১৭
সোনার বাংলা : অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১২৭
"ভারতীয় অর্থনীতির" উত্থান ও পতন ১৩৯
"অর্থনৈতিক মানুষ" ও মানুষ হিসাবে অর্থনীতিবিদ ১৫১
অর্থনীতির দর্শনের সন্ধানে ১৬১
*পরিভাষা কোষ*
ইংরেজী থেকে বাংলা ১৭৩
বাংলা থেকে ইংরেজী ১৮৩
*নির্ঘণ্ট* ১৯৩

# ভূমিকা

প্রায় সাতাশ বছর আগে আমি যখন ক্যানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে এম. এ. পড়তে যাই তখন আমার শিক্ষকদের কণ্ঠে গণিত বিনা কোন গীত ছিল না। তাই আমাকে সাড়ে পাঁচ বছর ধরে অর্থনীতির বুলি (jargon) ও দুরধিগম্য পদ্ধতি রপ্ত করতে হয়। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর (এম. এ) ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রী শেষ করে ১৯৭৯ সালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

গবেষণার গজদন্ত মিনার থেকে আমলাতন্ত্রের আটপৌরে জীবনে ফিরে বুঝতে পারলাম যে, আমার শিক্ষকরা যত্ন করে আমাকে অর্থনীতি শিখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যারা আদৌ কোন তত্ত্বের ধার ধারে না তাঁদের কিভাবে অর্থনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে তা শেখাননি। যে কোন তত্ত্বের সার্থকতা তার প্রয়োগে। অথচ বাস্তব জীবনে যাঁরা অর্থনীতি সম্পর্কে বড় বড় সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে আদৌ অর্থনীতি জানেন না। তাই অর্থনীতিবিদদের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব হল অর্থনীতির ভাগ্যবিধাতাদের কাছে সঠিক সমাধান তুলে ধরা। কিন্তু অর্থনীতির দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব ও দুর্বোধ্য পদ্ধতি রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের মধ্যে প্রবল অনীহা সৃষ্টি করে। ফলে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের “বিদায় অভিশাপ” কবিতার অভিশপ্ত কচের মত; তাঁরা যা শিখেছেন তা প্রয়োগ করতে পারেন না। একবার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তাঁর একটি প্রিয় প্রকল্পের দুর্বলতা বোঝাতে গিয়ে “opportunity cost” (বিকল্পের নিরিখে ব্যয়) সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশের চেষ্টা করেছিলাম। কর্মকর্তাটি রেগে বললেন যে, “opportunism” (সুবিধাবাদ) তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, নীচের ও একই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা। সহকর্মীদের পরিমাণগত বিশ্লেষণ ও লেখচিত্র বোঝাতে গিয়ে ঔদাসীন্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বার বার হোঁচট খেয়েছি।

শিক্ষকরা আমাকে যা শেখাননি, অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে তা তিলে তিলে শিখতে হয়েছে। সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখলাম যে, যা সহজভাবে বোঝানো যায় না তা কোন দিনই বোঝানো হয়ে ওঠে না। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে

অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে আমার নিজের অজান্তেই অর্থনীতি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি গড়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা হতে দেখতে পেলাম যে, গণিতের বিভীষিকা ও লেখাচিত্রের কণ্টক এড়িয়ে রম্যরচনার অবয়বে অর্থনীতির অপ্রিয় বক্তব্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। তবে অতি সরল করতে গেলে বক্তব্য অনেক সময় বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে অর্থনীতির গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সাথে রম্যরচনার হালকা ও চটুল ভঙ্গি মেলানো সব সময়ে সহজ হয় না। কিন্তু যেখানে যথাযথ বক্তব্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব সেখানেই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের সুষ্ঠু আদান প্রদান ঘটে। তাই যাঁরা গুরুগম্ভীর অর্থনীতিতে ঠাট্টা-মশকরাকে সন্দেহের চোখে দেখেন আমি তাঁদের সাথে একমত নই। অধ্যাপক পল ক্রুগম্যান (Paul Krugman) তাঁর "Accidental Theorist" গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, "You cannot do serious economics unless you are willing to be playful" (গভীরভাবে চিন্তাশীল অর্থনীতির চর্চা করতে হলে আপনাকে কৌতুকপরায়ণ হতে হবে)। আমি তাই মনে করি যে, হালকা ও চটুল ভঙ্গি অর্থনীতির বক্তব্যকে লঘু করে দেয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে গভীরতর দ্যোতনা দেয়। যাঁরা আমার বলার ভঙ্গি নিয়ে কৌতুকবোধ করবেন তাঁদের অতি বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই বই ভিন্ন স্বাদের হলেও অবশ্যই অর্থনীতির মূলধারার প্রতি অনুগত। কবির ভাষায় বলতে গেলে,

"আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল;
বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল।"

এ গ্রন্থে সংকলিত কোন কোন রচনার পেছনে ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ পড়ে আমার শিক্ষক ও প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী স্কট গর্ডন এ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য উপদেশ দেন। গত পঁচিশ বছরে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। এ গ্রন্থে একটি রচনায় এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছি। "সোনার বাংলা" সম্পর্কে আমার বক্তব্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথম পেশ করেছিলাম। পরবর্তীকালে আমার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ডক্টর সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত History of Bangladesh-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে রম্যরচনার আকারে একই বক্তব্য আবার তুলে ধরেছি। বিশ্বের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী কর্তৃক আয়োজিত নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য একটি প্রবন্ধ রচনা করি। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে Natural Resource Forum নামে একটি বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের "বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক অর্থনীতি"-তে পূর্ববর্তী প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি রয়েছে। "আজি হতে শতবর্ষ পরে : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" শীর্ষক প্রবন্ধটি ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারী "দৈনিক সংবাদে" প্রকাশিত হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে আমি ১৯৯৫

সালে ম্যানিলাতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত একটি সেমিনারে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করি। এসব বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যাবে "সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি" শীর্ষক নিবন্ধে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলো একেবারেই নতুন এবং এর আগে কোন আকারেই উপস্থাপিত হয়নি।

এ গ্রন্থের পাঠকরা সহজেই লক্ষ্য করবেন যে, এ গ্রন্থে অনেক জায়গাতে অধ্যাপক স্কট গর্ডনের উদ্ধৃতি রয়েছে। তাঁর কাছে আমি অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস ও দর্শন পড়েছি। তাঁকে আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে জনাব এ. কে. এন. আহমেদ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এ গ্রন্থের "শুয়রের বাচ্চাদের অর্থনীতি" শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখিত মাইকেল ক্যারিটের আত্মজীবনীর অনুলিপি আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি। গত দশ বছর ধরে ডক্টর কামাল সিদ্দিকী এই বইটি লেখার জন্য আমাকে তাগাদা দিয়ে আসছেন। তিনিও অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও সাময়িকী আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু জিয়াউল আনসার। পাণ্ডুলিপিটি সংশোধনে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমার বন্ধু ও সুসাহিত্যিক এ. বি. এম. আব্দুশ শাকুর এবং আমার প্রাক্তন কনিষ্ঠ সহকর্মী আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া। বিভিন্ন নামের উচ্চারণ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্য সচিব ডক্টর সৈয়দ আব্দুস সামাদ। এদের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এঁরা সবাই বইটির গুণগত মান বাড়াতে সহায়তা করেছেন। যা ভুলত্রুটি রইল তার জন্য অবশ্য আমিই এককভাবে দায়ী।

এই বইয়ের প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ অতি যত্নের সাথে স্বল্পতম সময়ে প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। ইউপিএল-এর জনাব বদিউদ্দিন নাজির প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থ বিভাগের মোঃ আতায় রাব্বি বইটি নিষ্ঠার সাথে টাইপ করে দিয়েছেন। তাঁদেরও জানাই ধন্যবাদ।

আমার একমাত্র মেয়ে নেহরীন ও আমার স্ত্রী হামীম নিশ্চয়ই বইটি শেষ হওয়াতে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। অবশ্যই এ ধরনের বই লেখতে গেলে তাঁদের জন্য নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তবু তাঁরা হাসি মুখে সবকিছু মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মুখের হাসি চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকুক, এটাই আমার প্রার্থনা। আমার মা হাজেরা খান, আমার শাশুড়ি জাহানারা রহমান, আমার ভাই জিয়া ও কবির ও আমার বড় বোন বীনা আপা ও রেখা আপা এবং আনুদা ও জোহরা ভাবী সব সময়েই লেখালেখির ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদেরও জানাই কৃতজ্ঞতা।

২৫ শে বৈশাখ, ১৪০৭
ঢাকা

**আকবর আলি খান**

# পরার্থপরতার অর্থনীতি

যা ঘটে গেছে তা বিধাতা পরিবর্তন করতে পারেন না; ঐতিহাসিকগণ পারেন–শুধু যে পারেন তাই নয়, হরহামেশাই করে থাকেন। অবশ্য এখানেই ঐতিহাসিকগণ বিধাতার কাছে হেরে গেলেন–বিধাতা সম্পূর্ণ সত্যটুকু জানেন, তাঁর ইতিহাস পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। ঐতিহাসিকগণ কখনও সবটুকু সত্য জানেন না; অন্ধের হাতি দেখার মত সত্যের খণ্ড খণ্ড রূপ তাঁদের কাছে ধরা পড়ে। তাই যে কোন ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বার বার পরিবর্তিত হয়। এ সব খণ্ডিত ব্যাখ্যা হতেই আমরা সত্যের বহুমাত্রিক রূপ দেখতে পাই। ঐতিহাসিক ঘটনার নতুন নতুন ব্যাখ্যাতে আমি তাই উদ্বিগ্ন হই না, আনন্দিত হই। বরং যে সব ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই সে সব ঘটনা নিয়েই আমার মনে খটকা লাগে।

পরার্থপরতার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রবাদ-পুরুষ হলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন। তিনি সপ্তম শতকে কনৌজের সম্রাট ছিলেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে হর্ষবর্ধন ছিলেন অতি দানশীল রাজা। প্রতি চার বছরে একবার তিনি প্রয়াগের মেলায় তাঁর সর্বস্ব দান করতেন। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে তিনি তাঁর নিজের গায়ের কাপড় দান করে গঙ্গায় স্নান শেষে অন্যের বস্ত্র ধার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। ইতিহাসের এ কিংবদন্তী নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবু কিংবদন্তীটি সম্পর্কে ছাত্রজীবনে আমার মনে কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব আমি কোন ঐতিহাসিকের কাছে পাইনি।

দীর্ঘদিন পরে আমার নিজের জীবনেই এ ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। একবার পবিত্র শবে বরাতের পূর্বে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার মা শবে বরাতের দিন আমার হাতে এক টাকার নোটের একটি বান্ডিল দিয়ে ভিখারিদের তা দান করতে হুকুম দিলেন। আমি পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বাড়ির দরজার বাইরে প্রতিটি ভিখারিকে একটি করে এক টাকার নোট দেওয়া শুরু করি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ভিখারিদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যাই। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে ভিখারিরা আমার পাঞ্জাবি ছিঁড়ে

ফেলে এবং আমার হাত থেকে নোট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আত্মরক্ষার্থে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে আমি চলে এলাম। সেই মুহূর্তে হঠাৎ হর্ষবর্ধনের ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। আমার বদ্ধ ধারণা যে, সম্রাট হর্ষবর্ধনও হয়ত ইচ্ছে করে প্রয়াগের মেলায় তাঁর পরনের কাপড়-চোপড় দান করেননি। হয়ত আমারই মত সম্রাট হর্ষবর্ধনও ঘেরাও হয়েছিলেন, তিনি গায়ের কাপড় দান করার সময়ই পাননি। হয়ত তাঁর পরনের কাপড় ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে গঙ্গাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। হর্ষবর্ধনের জীবনীকার ছিলেন তাঁর সভাসদ্। কাজেই কাপড় ছিঁড়ে নেবার পর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষার অসম্মানজনক ঘটনাকে তিনি একটু রঙ লাগিয়ে লিখে গেছেন। তাঁর বয়ানে তাই হর্ষবর্ধন ইচ্ছে করেই তাঁর পরনের কাপড় দান করে গঙ্গাস্নান করেন।

হর্ষবর্ধনের ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটেছে। সত্যি কি ঘটেছে একমাত্র বিধাতাই জানেন। তবে আমার অভিজ্ঞতা সত্য ঘটনা এবং তা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। প্রতি বছরই ঈদের সময় জাকাতের শাড়ি বিতরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশে এ ধরনের অজস্র ঘটনা ঘটেছে। সোমালিয়াতে জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দুর্গত লোক ও ত্রাণসামগ্রী থাকলেই সাহায্য করা সম্ভব হয় না। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য কোথাও কোথাও প্রয়োজন হয় সশস্ত্র রক্ষীদের। অথচ অনেক দার্শনিকই বিশ্বাস করেন যে, দান করতে চাইলেই যত খুশি দান করা যায়। তাই দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন লিখেছেন[১]:

> The desire of power in excess caused the angels to fall, the desire of knowledge in excess caused man to fall, but in charity there is no excess, neither can angel or man come in danger by it.
>
> (অতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ দেবদূতদের স্খলন ঘটায়, অপরিমিত জ্ঞানস্পৃহা মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু দান-খয়রাতে কোন আতিশয্য নেই। দান-খয়রাত মারফত দেবদূত বা মানুষ কারও কোন বিপদ আসবে না)।

বেকন সাহেব বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বা সোমালিয়াতে দান-খয়রাতের নতিজা দেখেননি। যদি দেখতেন তবে দান-খয়রাত সম্পর্কে তাঁর এ উক্তি অবশ্যই প্রত্যাহার করতেন।

দীর্ঘদিন ধরে দান-খয়রাত বিষয়টি ধর্মতত্ত্বের একচেটিয়া দখলে রয়েছে। দান-খয়রাত হচ্ছে আখেরাতের পাথেয়। বাইবেলের মতে দান-খয়রাত অজস্র পাপ মুছে দেয়। পবিত্র কোরানে দান-খয়রাতকে বীজ বপনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একটি ভুট্টার বীজ হতে জন্ম নেয় সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষে শত শত দানা ধরে। তেমনি ছোট্ট একটি দানের বরকত অনেক। সমাজবিজ্ঞান ইহকাল নিয়ে ব্যস্ত; পরকাল সমাজবিজ্ঞানের চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে। যে মূল্যবোধের উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত তা দান-খয়রাতের অনুকূল নয়। দান-খয়রাতের জন্য প্রয়োজন স্বার্থহীন ব্যক্তি। অর্থনীতির পূর্বানুমান (assumption) হচ্ছে, সকল মানুষই স্বার্থপর। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এডাম স্মিথের ভাষায়[২]:

> It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from the regard of their own interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love and never talk to them of our necessities but of their advantage.
>
> (আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতা হেতু আমাদের আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি)।

এ ধরনের স্বার্থপর অর্থব্যবস্থায় দান-খয়রাত হচ্ছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আচরণ। পরকালের ভয়কেই তাই এক পর্যায়ে দান-খয়রাতের একমাত্র কারণ গণ্য করা হত।

দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক তত্ত্বে ব্যক্তিগত দান-খয়রাত ছিল উপেক্ষিত। অথচ বাস্তব জীবনে দান-খয়রাতের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী ও আত্মীয়-স্বজনকে বছরে কত দান-খয়রাত করা হয় তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ১৯৯০ সালে একটি হিসাব হতে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহস্থালি আয়ের প্রায় ১.৭ শতাংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নগদ দান-খয়রাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। এ হিসাবের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রম অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩] অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে উন্নত দেশসমূহে দান-খয়রাতের পরিমাণ বাড়ছে। উপরন্তু সকল শিল্পোন্নত দেশেই দীন দরিদ্রের কল্যাণের জন্য সরকারী খাতে ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে তাই দান-খয়রাত একেবারে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই। অর্থনীতিবিদ্‌রা তাই আস্তে আস্তে বিষয়টির প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। অবশ্য অর্থনীতিবিদ্‌রা দান-খয়রাতের অর্থনীতির নাম দিয়েছেন "পরার্থপরতার অর্থনীতি" (economics of altruism)। স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে এঁরা বলেন লাভের সাথে সম্পর্কহীন (non-profits) প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দান-খয়রাত সম্পর্কে সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা ২৭টি গ্রন্থ ও ৭৭টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।[৪]

পরার্থপরতা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবজন্তুর জগতেও এ ধরনের স্পৃহা দেখা যায়। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পরার্থপরতা হল সে ধরনের আচরণ যা পালন করতে গিয়ে সমাজের একজন সদস্য ত্যাগের অথবা ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যদের উপকৃত করে (behaviour that benefits others at some cost or risk, to onself)। আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা পরস্পরবিরোধী প্রবণতা। অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ মানুষের মধ্যে উভয় ধরনের স্পৃহাই লক্ষ্য করেছেন। ১৭৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই "The Theory of Moral Sentiments" গ্রন্থে এডাম স্মিথ একে অপরের ভাল করার স্পৃহাকে মানুষের সামাজিক আচরণের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত "Wealth of Nations" গ্রন্থে এডাম স্মিথের মূল বক্তব্য হলো এই যে, মানুষ স্বার্থপর এবং বাজারে অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে এ স্বার্থপরতা চরিতার্থ হয়। মানুষ একই সাথে কিভাবে স্বার্থপর ও পরার্থপর হয় সে সম্পর্কে এডাম স্মিথ কোন ব্যাখ্যা

দেননি। অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মানুষের মধ্যে এই দুই আপাতবিরোধী প্রবণতার উপস্থিতি "এডাম স্মিথ সমস্যা" নামে পরিচিত। এডাম স্মিথ এ সমস্যার সমাধান না করলেও, সমকালীন ইংরাজ দার্শনিক ডেভিড হিউম স্বতন্ত্রভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হিউমের মতে মানুষ নিজেকেও ভালবাসে (স্বার্থপর) ও শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালবাসে (পরার্থপর)। কিন্তু এই ভালবাসার নিবিড়তা নির্ভর করে সামাজিক দূরত্বের (social distance) উপর। সামাজিকভাবে যে যত কাছে থাকে মানুষ তাকে তত ভালবাসে। সামাজিক দূরত্ব যত বাড়ে ভালবাসার নিবিড়তা তত কমে। পরবর্তীকালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী বোগারডাস (Bogardus) সামাজিক দূরত্বের মাপকাঠি সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।

পরার্থপরতার অর্থনীতিতে তিনটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, কারা এবং কেন দান-খয়রাত করেন? দ্বিতীয়ত, কি ধরনের দান-খয়রাত সবচেয়ে উপকারী? সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, দান-খয়রাত সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য কতটুকু কল্যাণকর?

প্রথম প্রশ্নটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাতারা কি কারণে দান করে তা জানতে পারলে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দাতাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারে। বর্তমানে যে গবেষণা চলছে তাতে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, পরার্থপরতা হচ্ছে এক ধরনের স্বার্থপর কাজ। বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করার পেছনে থাকে বংশানুগত সম্পর্কিতদের রক্ষার জন্য জৈব তাড়না। তবে এ ধরনের সামাজিক-জৈববিজ্ঞান (socio-biology) অনাত্মীয়দের দান-খয়রাতের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, দান-খয়রাতের পেছনে দাতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকে। কোন কোন দাতা তাদের মর্জি মাফিক পথে দানগ্রহীতাদের চালাতে চান। যেমন, কোন দাতা হয়ত দানগ্রহীতাদের মাদকাসক্তি নিরুৎসাহিত করতে চান; তাই তিনি মাদকাসক্তিবিরোধী প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেন। কেউ কেউ আবার দানগ্রহীতাদের কল্যাণে আনন্দ লাভ করেন। আবার অনেকে দান করেন এই ভেবে যে, অন্যরা যখন দান করছে তখন নিশ্চয়ই তাতে কোন না কোন ফায়দা রয়েছে। তৃতীয় মতবাদ হচ্ছে, দাতারা শিল্পোন্নত দেশসমূহে করের সুবিধা লাভের জন্য দান-খয়রাত করেন। বেশিরভাগ দেশেই আয়কর আইনে দান-খয়রাতের জন্য কর-অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এ ধরনের কর-অব্যাহতি দান-খয়রাতের জন্য কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যদি করের হার বেড়ে যায় তবে দান-খয়রাত বাড়ালে কর-অব্যাহতির পরিমাণ বাড়ে। অন্যদিকে করের হার বাড়লে ব্যক্তির আয় হ্রাস পায়, এর ফলে দান-খয়রাত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই দান-খয়রাতের উপর করের প্রভাব সব সময়ে সুনিশ্চিত নয়। উপরোক্ত তিনটি মতবাদের পক্ষেই বাস্তব (empirical) প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পরার্থপরতার মৌল

প্রণোদনা সম্পর্কে কোন সরলীকরণ সম্ভব নয়। পরার্থপরতা এখনও আমাদের কাছে ধর্মীয় ও বৈষয়িক প্রেষণার এক আলো-ছায়ার জগৎ।

কি ধরনের দান-খয়রাত গ্রহীতার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক গবেষণা এখনও সীমিত। দান-খয়রাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, যারা দান-খয়রাতের উপযুক্ত নয় তারা দান-খয়রাতের সিংহভাগ নিয়ে যায়, অথচ যারা দান-খয়রাতের উপযুক্ত তারা কিছুই পায় না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা দান-খয়রাত করে তারা যথাযথ যত্ন নিলে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এটাই সবচেয়ে জটিল কাজ। এ সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে যেমন রয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যদাতাদের একটি বড় নালিশ হলো যে, দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যে সাহায্য তারা দিচ্ছে তা দরিদ্রদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। উন্নত দেশসমূহে বৈদেশিক সাহায্যের সমালোচকরা তাই বলে থাকেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের জন্য প্রদত্ত উন্নত দেশের গরীব করদাতাদের অর্থ দরিদ্র দেশের বড় লোকেরা তছরুপ করছে। দান-খয়রাতের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা যাতে সাহায্য উপযুক্ত লোকদের কাছে পৌঁছে।

ত্রাণসামগ্রীর আত্মসাৎ দু'ভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা ত্রাণসামগ্রী পাওয়ার উপযুক্ত নয় তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে ত্রাণসামগ্রী না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দানগ্রহীতাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রয়োজন। বাইরের কোন প্রশাসনের পক্ষে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল। বাইরের প্রশাসনকে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় মাতব্বরদের উপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় মাতব্বররা ইচ্ছে করে ত্রাণসামগ্রী তছরুপ করার চেষ্টা করে। তবে স্থানীয় মাতব্বরদের বাদ দিলে বেতনভোগী কর্মচারিদের দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে বেতনভোগী কর্মচারিরাও কম দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তাই তাত্ত্বিকভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় খয়রাতি মালের তছরুপ হ্রাস করা সম্ভব হলেও বাস্তবে তা সব সময় হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, গরীবদের উপকার করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হল বাজারভিত্তিক সমাধান। দান-খয়রাতের প্রকৃতি এমন হতে হবে যে, তা গরীবদের কাজে লাগবে, অথচ তা বড়লোকদের আকৃষ্ট করবে না। অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে তিন ধরনের পণ্য রয়েছে : বিলাস দ্রব্য (luxury), স্বাভাবিক পণ্য (normal goods), এবং নিকৃষ্ট পণ্য (inferior goods)। বিলাস দ্রব্য শুধু বড়লোকরা ভোগ করে। লোকের আয় বাড়লে যে পণ্যের চাহিদা বাড়ে তা হল স্বাভাবিক পণ্য। লোকের আয় বাড়লে যে পণ্যের চাহিদা কমে তাকে বলে নিকৃষ্ট পণ্য। নিকৃষ্ট পণ্য তাই শুধু গরীবদের ভোগে লাগে। গরীবদের আয় বেড়ে গেলে তাদেরও নিকৃষ্ট পণ্যের জন্য চাহিদা কমে যায়।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিত্তবানরা যে পণ্য ভোগ করে সেই পণ্যই দীনদরিদ্রদের দান করা উচিত। দরিদ্রদের নিকৃষ্ট পণ্য দান করা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক পণ্য দান করলে দেখা যায় যে যারা ত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত নয় তারাও এ পণ্য আত্মসাতের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট পণ্য দান করলে বিত্তবানরা এ পণ্যের জন্য গরীবদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে উৎসাহিত বোধ করে না। বাংলাদেশের খাদ্যশস্য সাহায্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি সংক্রান্ত গবেষণা পরিষদের (IFPRI) সমীক্ষা এ অনুমান সমর্থন করে।[৫] বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে গম একটি নিকৃষ্ট পণ্য। তাই ত্রাণসামগ্রী হিসাবে গম বিতরণ করলে তা গরীবদের কাছে অনেক সহজে পৌঁছে। কিন্তু চাল একটি স্বাভাবিক পণ্য। চাল বিতরণ করলে গরীবদের চাল বিত্তবানরা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। এ অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নিকৃষ্ট পণ্য দান করলে গরীবরা বেশি উপকৃত হয়। গরীবদের বেশি উপকার করতে চাইলে গরীবরা লাভবান হয় না। এমন পণ্য বিতরণ করতে হবে যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যগোষ্ঠীতে পৌঁছার প্রবণতা রয়েছে। লেডিজ সু কিংবা বাটার অয়েল ত্রাণসামগ্রী হিসাবে দিলে তা গরীবদের কাছে পৌঁছবে না, তা বিত্তবানরা আত্মসাৎ করবে। নগদ টাকা দিলে তছরুপের পরিমাণ আরও বাড়বে। নগদ অর্থের চেয়ে স্বাভাবিক পণ্য সাহায্য হিসাবে গরীবদের জন্য অধিকতর উপযোগী, তার চেয়েও বেশি উপকারী হল নিকৃষ্ট পণ্য দান।

ত্রাণের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, ভর্তুকির ক্ষেত্রেও তা সত্য। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যেখানে কৃষিঋণের সুদের হার কম সেখানে ঋণ গরীবদের কাছে পৌঁছে না। এ ধরনের ঋণের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে বড়লোকেরা। যে সব ঋণে সুদের হার বেশি সেখানে বিত্তবানরা ভিড় জমায় না। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সরকারী ব্যাংক কর্তৃক সহজ শর্তে প্রদত্ত ঋণ আদায় হয় না, কিন্তু বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক উচুঁ সুদের ঋণ ঠিকই পরিশোধিত হয়। গরীব লোকরা আইন কানুনকে ভয় পায়। তারা ঋণ পরিশোধ করে। বিত্তবানরা জানে তাদের সাত খুন মাফ; তারা ঋণ পরিশোধ করে না।

ভর্তুকি দিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তা গরীবদের ভোগে না লেগে ধনীদের আরো ধনী করে তোলে। কোন সরকারের পক্ষেই ভর্তুকির জন্য অঢেল সম্পদ বরাদ্দ করা সম্ভব হয় না। সীমিত ভর্তুকির জন্য তাই বিত্তবান ও গরীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এ প্রতিযোগিতায় গরীবরা টিকে থাকতে পারে না। তাই গরীবদের জন্য উচ্চ হারে ভর্তুকি দিতে গিয়ে গরীবদের অপকার করার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দল জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ভর্তুকি বাড়িয়ে সারের দাম কমায়। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়ার ফলে প্রচুর সার প্রতিবেশী দেশে চোরাচালান হয়ে যায়। ফলে দেশে সার-সংকট দেখা দেয়। সারের জন্য কৃষকদের রক্তাক্ত আন্দোলন রাজনৈতিক দলটির জন্য নির্বাচনে একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

গরীব চাষীরা সাহায্য চায় না। ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসময়ে পেলেই তারা খুশি। গরীবরা অল্পেই তুষ্ট হয়। বড়লোকদের মত তাদের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী নয়।

দান-খয়রাত কিভাবে কার্যকর করা যায়, সে সম্পর্কে অর্থনৈতিক গবেষণা নতুন হলেও অর্থনীতির জন্মলগ্ন হতেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর দান-খয়রাতের প্রভাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ বিতর্কের জন্ম আঠার শতকের ইংল্যান্ডে। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় হতে ইংল্যান্ডে গরীব আইন (poor law) চালু ছিল। এই আইনের বিধান ছিল যে, স্থানীয়-সরকারসমূহ তাদের আয় থেকে গরীবদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। আঠার শতকে ধ্রুপদী (classical) অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুস এই আইনের কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ম্যালথুসের মতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গরীবদের সাহায্য করার ব্যবস্থা তাদের রাষ্ট্রের উপর আরও নির্ভরশীল করে তোলে। সাহায্যপ্রাপ্ত গরীবরা কাজ করে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করে তারা বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। গরীবদের সন্তান সন্ততিরা দান-খয়রাতের উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একই যুক্তিতে ডেভিড রিকার্ডো গরীবদের স্থানীয় সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার প্রথা তুলে দেওয়ার দাবি জানান। তাদের সাথে একমত হন হিতবাদী (utilitarian) দার্শনিক জেমস মিল।

গরীব আইন সংশোধনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ড্রুমন্ড অধ্যাপক (যে পদ পরবর্তীকালে অমর্ত্য সেন অলংকৃত করেছেন) সিনিয়র (Senior)-এর। ১৮৩৪ সালে গরীব আইন সংশোধন করে নগদ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন আইনে সাহায্যের যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়। গরীবদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের সংস্কার ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে। যদিও তৎকালীন অর্থনীতিবিদ্গণ এ ধরনের সংস্কারের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ এ ধরনের সংস্কারকে অমানবিক বলে আখ্যায়িত করেন। দরিদ্র আইন সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন লন্ডনের টাইমস পত্রিকা এবং বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স। শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়ে প্রথম পর্যায়ে অর্থনীতিবিদ্গণই জয়যুক্ত হয়।

অবশ্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্গণের এ বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবার নতুন করে গরীবদের সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ শুরু হয়। এ উদ্যোগ অবশ্য অগ্নিগর্ভ সমাজতান্ত্রিক নেতাদের কাছ থেকে আসেনি, বরং বাস্তববাদী রক্ষণশীল নেতারা ছিলেন এ ধারার সারথি। ১৮৮০-এর দশকে জার্মানিতে প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করেন অটো ফন বিসমার্ক—যিনি ছিলেন অতি রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী রাজনীতিবিদ্। শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ও বার্ধক্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বীমার ব্যবস্থা তিনি প্রথম প্রচলন করেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে যুক্তরাজ্যে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাতে নেতৃত্ব দেন রক্ষণশীল নেতা উইনস্টন চার্চিল। ক্রমে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার জাল হয়েছে অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুরোধা বুনো-চোখো ও অনলবর্ষী বামপন্থীরা ছিল না। ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থার এ জাল বিছিয়েছিলেন বিসমার্ক আর চার্চিলের মত অতিদক্ষিণপন্থী নেতারা।

সামাজিক নিরাপত্তার বিতর্কে রাজনৈতিক আবেগের কাছে অর্থনৈতিক যুক্তি হেরে যায়। কিন্তু এতে বাস্তবতার কোন পরিবর্তন হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ গরীবদের সাহায্যের কুফল সম্পর্কে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা আজও সত্য। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেলে দরিদ্ররা চাকুরি খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী সরকারী খয়রাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সরকারী খয়রাত ব্যবস্থায় দেখা দেয় নানা দুর্নীতি। একদিকে অযোগ্য আমলাতন্ত্র দিন দিন স্ফীত হতে থাকে, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচীকে অপব্যবহার করে অনেকে বিলাস-বহুল জীবন ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুঃখ করে বলা হয়, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য উঁচু হারে আরোপিত করের ফলে যে সব গরীব লোক কাজ করে হালাল জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনই শক্ত হয়ে পড়ে। আর যারা কাজ না করে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল তারা ঢাউস ক্যাডিলাক গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আর্থিক। এর ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। যতই ব্যয় বাড়বে ততই সরকারের কর বাড়াতে হবে। কর বাড়লে, যারা কাজ করে তাদের আয় কমতে থাকবে। তাই যারা কাজ করে, তাদের কর্মস্পৃহা কমে যাবে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে। তাই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নতুন সম্পদের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে না। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাতে আমলারা করদাতাদের অর্থে দানগ্রহীতাদের উপকার করে। এ ব্যবস্থায় ব্যয় হ্রাসের কোন তাগাদা নেই। তাই বিশ্বব্যাপী আজ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য তোড়জোড় চলছে। সবাই চায় সমাজের উপর দরিদ্রদের নির্ভরশীলতা কমাতে। দান-খয়রাত নয় বরং সকলেই যাতে কাজ করে খেতে পারে এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই সামাজিক নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য।

দান-খয়রাতের মৌলিক তাগাদা পরার্থপরতা হতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক মৌল উপাদানসমূহ অস্বীকার করে দান-খয়রাত ফলপ্রসূ হয় না। গরীবের ভাল করার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। এমনভাবে ভাল করতে হবে যাতে গরীবরা উপকৃত হয়। এ কাজ শুধু আবেগের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা। বাজারের অদৃশ্য হাতকে অগ্রাহ্য করে যে নীতি প্রণীত হয় তার সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। বাজার-অর্থনীতির তিনটি অনুশাসন কখনও ভুলে গেলে চলবে না। প্রথমত, গরীবদের এমন সাহায্য দেওয়া সঠিক হবে না যা তাদের কাজ করতে নিরুৎসাহিত করবে। এ ধরনের ব্যবস্থা টেকসই হবে না। যে সমাজে অলসতা পুরস্কৃত হয় সে সমাজে সবাই ফাঁকি দিতে চাইবে। দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে বিত্তবানদের

আধিপত্য রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত গরীবদের জন্য নিকৃষ্ট পণ্য ত্রাণসামগ্রী হিসাবে অধিকতর উপযোগী হবে। নিকৃষ্ট পণ্য গরীবদের ক্ষুধা মেটায় অথচ ধনীদের আকর্ষণ করে না। তৃতীয়ত, গরীবদের কর্মসূচী সমাজের অন্যান্য কর্মসূচী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। সকলের জন্য অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করলে গরীবরা তার সুফল পাবে না। ডক্টর ইউনূস তাঁর আত্মজীবনীতে এ কথা সুন্দরভাবে বলেছেন[৬]:

> Like good old Gresham's law, it is wise to remember that in the world of development if one mixes the poor and the non-poor within a programme, the non-poor will always drive out the poor, and the less poor will drive out the more poor, and this may continue *ad infinitum* unless one takes protective measures right at the beginning. And what will happen is that in the name of the poor, the non-poor will reap the benefits.
>
> (গ্রেশামের সনাতন বিধির মত এটি মনে রাখা ভাল যে, উন্নয়নের জগতে একই কর্মসূচীতে যদি গরীবদের সাথে যারা গরীব নয় তাদের একত্রিত করা হয়, তবে যারা দরিদ্র নয় তারা দরিদ্রদের এবং যারা দরিদ্র তারা হতদরিদ্রদের বঞ্চিত করবে এবং এ পরিস্থিতি অনির্দিষ্টভাবে চলতেই থাকবে যদি প্রথমেই উপশমমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। যা ঘটবে তা হল গরীবদের নামে যারা গরীব নয় তারা সকল সুবিধা ভোগ করবে)।

দু'শ বছর আগে স্যামুয়েল জনসন লিখেছেন, "The road to hell is paved with good intentions"[৭] (দোজখের সড়ক সদিচ্ছা দিয়ে বাঁধানো)। দান-দক্ষিণার জন্য হামলার সম্মুখীন হওয়ার আগে এ আপ্তবাক্যের অর্থ আমি পুরোপুরি বুঝতাম না। আজ বুঝতে পারি যে, বেশি ভাল করতে গেলেও অকল্যাণ ডেকে আনা সম্ভব।

প্রাচীন গ্রীসে একটি পবিত্র স্থান ছিল ডেলফি নগরের ভবিষ্যদ্বাণীর মন্দির। এ মন্দিরের ফটকে মূলমন্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল "meden agan"– "কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করবে না"।[৮] এ সত্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরার্থপরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। দার্শনিক বেকনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আজকের দিনেও এ সত্য সমভাবে বলবৎ আছে। অর্থনীতির মৌলিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে টেকসই পরার্থপরতা সম্ভব নয়।

## তথ্যসূত্র

১. উদ্ধৃত, *Webster's Compact Dictionary of Quotations* (Merriam- Webster, 1992), p. 44

২. Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the *Wealth of Nations- a Selected Edition*, Sutherland, Kathryn, ed., (Oxford: Oxford University Press, 1993), Book-I, chapter II, p. 22

৩. Rose-Ackerman, Susan, "Altruism, Nonprofits and Economic Theory", *Journal of Economic Literature*, June 1996, vol. XXXIV. No. 2. pp. 701-729

৪. প্রাগুক্ত

৫. Ahmed, Raisuddin, et al, *Out of the Shadow of Famine* : Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh (Washington : IFPRI, 1998)

৬. Yunus, Muhammad, *Banker to the Poor* (Dhaka : University Press Ltd., 1999), p. 72

৭. উদ্ধৃত, Peter, Laurence, J., *Peter's Quotations* (New York: Quill 1977), p. 243

৮. Durant, Will, *The Life of Greece* (New York : Simon and Schuster, 1966), p. 118

# "শূয়রের বাচ্চাদের" অর্থনীতি

আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। "শূয়র কা বাচ্চাদের" আগে মাইকেল ক্যারিটের কথা বলতে হবে, কেননা এ রচনার অনুপ্রেরণা আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তবে ভুলেও মনে করবেন না যে, "শূয়র কা বাচ্চাদের" সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল। তিনি শুধু অতি সজ্জনই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়াতেন। তিনি নিজেও অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৯ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তাঁর চাকুরি শুরু হয় মেদিনীপুর জেলাতে। চাকুরির প্রথম বছরে তাঁরই সামনে উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদীদের হাতে পর পর দুজন ইংরাজ জেলা প্রশাসক নিহত হন। তৃতীয় জেলা প্রশাসক চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণ করে ভারত থেকে পালিয়ে যান। মেদিনীপুরে উপদ্রুত অঞ্চলে ক্যারিট সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চণ্ডরূপ প্রথমে প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে গিয়ে ইংরাজ শাসনের কপটতা দেখে তিনি স্তম্ভিত হন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে তিনি নিজেই ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৪ সালে ছুটি নিয়ে তিনি বিলাতে ফিরে যান এবং সেখানে কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বাংলা প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির দায়িত্ব লাভ করেন। এ পদে থাকাকালে তিনি বেআইনী ঘোষিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কাছে সরকারের গোপনীয় খবর পাচার করে দিতেন। এ কাজে তাঁর দোসর ছিল আরেকজন ইংরেজ মাইকেল – পাদ্রী মাইকেল স্কট। সরকারের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করে বিলাতে চলে যান। চাকুরি ছাড়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ক্যারিট তাঁর স্মৃতিকথা রচনা করেন। তিনি যখন আসানসোলে মহকুমা প্রশাসক ছিলেন সে সময়ে একজন পাঞ্জাবী ঠিকাদারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের নিম্নরূপ ঘটনা তাঁর স্মৃতিকথাতে লিপিবদ্ধ করেছেন[১]:

> Meanwhile the Punjabi with assumed humility pleaded forgiveness, and then, in quiet and dignified tones he recited his set piece ... Your honour is a noble man. In this sad country there are three sorts of men. These are the good men who take no bribes, of whom you are one; there are the bad men who take bribes, and (looking me in the eyes) there are the suer-ka-batchhas (sons of pig) who take bribes but do not help the bribe-giver. Salam, Your Honour, Salam.
>
> (ইতোমধ্যে পাঞ্জাবী লোকটি কপট বিনয়ের সঙ্গে মাফ চাইল। তারপর সে শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে তার মুখস্থ বক্তৃতা ঝাড়লো : হুজুর হচ্ছেন মহানুভব ব্যক্তি। এই দুর্ভাগা দেশে তিন কিসিমের লোক আছে। আছেন সজ্জন যাঁরা ঘুষ খান না, যেমন আপনি। আছে বদলোক যারা ঘুষ খায় এবং (আমার চোখের দিকে চেয়ে) আছে শুয়রের বাচ্চারা যারা ঘুষ নেয় অথচ ঘুষ প্রদানকারীকে কোন সাহায্য করে না। সালাম। হুজুর সালাম)।

স্মৃতিকথার উপসংহারে ক্যারিট লিখেছেন যে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে সজ্জন, বজ্জাত ও শুয়রের বাচ্চা–তিন কিসিমের লোকই দেখেছেন।

অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, এদেশে শুয়রের বাচ্চাদের পয়দা হয়েছে ব্রিটিশ শাসন আমলে। বেশির ভাগ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বদ্ধ ধারণা হল যে, ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে দুর্নীতি, অন্তত ব্যাপক দুর্নীতি ছিল না। তাঁদের মতে ইংরাজ শাসকরা সাধারণত (প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরাজ বিজেতারা ছাড়া) নিজেরা দুর্নীতিপরায়ণ না হলেও তারা যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা এদেশে ব্যাপক দুর্নীতির সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ রাজ এদেশে তাদের নিজেদের দেশের আদলে সকল আইন কানুন ও প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করে। অথচ বিলাতের সাথে কোন দিক দিয়েই এ দেশের বাস্তবতার মিল ছিল না। ফলে বিজাতীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয় জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য গড়ে ওঠে এক অন্তর্বর্তী শ্রেণী (intermediary class)। এই অন্তর্বর্তী শ্রেণীর হাতেই এদেশে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দুর্নীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণে ইতিহাসের অতিসরলীকরণ করা হয়েছে। দুর্নীতি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে নতুন কিছুই নয়। দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। প্রায় দু হাজার বছর আগে মনুস্মৃতি সংকলিত হয়। দুইজন মার্কিন অধ্যাপক মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ের ১২৩ ও ১২৪ অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ ইংরাজি অনুবাদ করেছেন[২]:

> (123) For the men who are appointed by the king to protect (his subjects) generally become hypocrites who take the property of others and he must protect those subjects from them. (124) The king should banish and confiscate all the property of those evil-minded men who take money from parties to law suits.
>
> [(১২৩) প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রাজা যাঁদের নিয়োগ করেন তাঁরাই ভণ্ডামি করে অন্যদের সম্পত্তি গ্রাস করে এবং রাজাকে এ ধরনের কর্মকর্তাদের হাত থেকে

প্রজাদের রক্ষা করতে হবে। (১২৪) রাজার দায়িত্ব হল যে সব দুষ্ট লোক মামলার বিভিন্ন পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা]।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের বয়সও প্রায় দু হাজার বছর হবে। চাণক্য লিখেছেন, সরকারী কর্মচারিরা দু'ভাবে বড়লোক হয় : হয় তারা সরকারকে প্রতারণা করে, অন্যথায় প্রজাদের অত্যাচার করে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে সরকারী কর্মচারিদের চল্লিশ ধরনের তছরুপের ও দুর্নীতির পন্থা চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩] দুর্নীতির কুফল সম্পর্কে সজাগ থাকা সত্ত্বেও চাণক্য রাজস্ব বিভাগে দুর্নীতি অনিবার্য মনে করতেন। অর্থশাস্ত্রের দুটি অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ ইংরাজি রূপান্তর করা হয়েছে[৪]:

> Just as it is impossible not to taste honey or poison that one may find at the tip of one's tongue, so it is impossible for one dealing with government funds not to taste, at least a little bit of the king's wealth. Just as it is impossible to know when a fish moving in water is drinking it, so it is impossible to find out where government servants in charge of undertaking misappropriate money.
>
> (জিহ্বার ডগায় বিষ বা মধু থাকলে তা না চেটে থাকা যেমন অবাস্তব তেমনি অসম্ভব হলো সরকারের তহবিল নিয়ে লেনদেন করে একটুকুও সরকারের সম্পদ চেখে না দেখা। জলে বিচরণরত মাছ কখন জল পান করে তা জানা যেমন অসম্ভব তেমনি নির্ণয় সম্ভব নয় কখন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিরা তহবিল তছরুপ করে)।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুর্নীতির জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম লিখেছেন[৫]:

"সরকার হইলা কাল খিল ভুমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি"

সরল ভাষায় এর অর্থ নিম্নরূপ : রাজস্ব কর্মকর্তা (সরকার) অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনাবাদী জমিকে কর্ষিত জমি গণ্য করছে (যার ফলে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হবে) এবং ধুতি ঘুষ নিয়েও সঠিকভাবে কাজ করছে না। মুকুন্দরামের লেখা পড়ে মনে হয় ঘুষ দেওয়াতে তার দুঃখ নেই। তার দুঃখ হল ধুতি উৎকোচ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী কবি ও ক্যারিটের বর্ণিত পাঞ্জাবী ঠিকাদারের নালিশ একই : "শুয়র কা বাচ্চারা" জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। বাংলা লোকসাহিত্যেও এই ধরনের দুর্নীতির উল্লেখ রয়েছে। মলুয়া লোকগীতিতে স্থানীয় কাজী সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দেখা যায়[৬]:

"বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেমতা অপার
চোরে আশ্রা দিয়া মিয়া সাউদেরে দেয় কার

ভাল মন্দ নাহি জানে বিচার আচার
কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার।"

(বড় দুরন্ত কাজীর অপার ক্ষমতা রয়েছে। সে চোরকে আশ্রয় দেয়, সাধুকে দেয় কারাবাস, ভাল মন্দ বা আচার বিচার জানে না। সে এতই খারাপ যে কুলের বধূদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে।)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ ধারণাই স্পষ্ট হয় যে, দুর্নীতি এ দেশে মোটেও অভিনব নয়। অন্যান্য সমাজেও দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি রয়েছে। দুর্নীতি একটি অতি পুরানো ও জটিল সামাজিক সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁদের তত্ত্বে দুর্নীতির ক্ষতিকর দিকসমূহ দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। এ উপেক্ষার কারণ দুটি : একটি ঐতিহাসিক ও অন্যটি তাত্ত্বিক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দুর্নীতির সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বৈরিতা নেই। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দুর্নীতির পঙ্কেই বিকশিত হয়েছে পুঁজিবাদের শতদল। ইউরোপে অনেক পুঁজিপতিই জীবন শুরু করেন একচেটিয়া ব্যবসায়ের লাইসেন্সের এবং কর ইজারার মত সরকারী দায়িত্বের অপব্যবহার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি বিশ্ব-বিশ্রুত। লুণ্ঠন হতে প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করে যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁরাই দস্যু-কুবের (robber baron) নামে পরিচিত। চীন দেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে : বড় ধরনের ডাকাতরা ব্যাংক স্থাপন করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে দুর্নীতি সত্ত্বেও উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। তবে এ সব তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতি ও উন্নয়নের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

তাত্ত্বিক দিক থেকেও অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, দুর্নীতি উন্নয়নের জন্য সহায়ক। পুঁজিবাদের বিকাশের পথে রাষ্ট্রযন্ত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া তাদের অপসারণ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে প্রশাসনিক অচলায়তনে দুর্নীতির মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন বাধা এড়ানো সম্ভব হয়। ঘুষের মাহাত্ম্যে লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরামর্শক হান্টিংটন তাই ফতোয়া দেন, অতি কেন্দ্রীভূত সৎ আমলাতন্ত্রের চেয়ে অতি কেন্দ্রীভূত ঘুষখোর আমলাতন্ত্র শ্রেয়।[৭] অবশ্য এ ধরনের যুক্তির দুর্বলতা রয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য একবার ঘুষ দেওয়া শুরু হলে, ঘুষ ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই পাওয়া যাবে না। ঘুষ না পাওয়া পর্যন্ত সকল সিদ্ধান্তই আটকে থাকবে। দীর্ঘ মেয়াদে দুর্নীতি দ্রুত সিদ্ধান্তের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হান্টিংটন সাহেবের বক্তব্যের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হল যে, তিনি দুর্নীতি-পরায়ণ আমলাদের নেহাত খারাপ লোক মনে করেন। কিন্তু তিনি "শূয়রের বাচ্চা" পর্যায়ের আমলাদের কথা চিন্তা করেননি। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলছেন, ঘুষ হচ্ছে এক ধরনের

অলিখিত চুক্তি। আদালতের মাধ্যমে এ ধরনের চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়। বিশ্বাস ভঙ্গের সম্ভাবনা এখানে বেশি। তাই অর্থনীতিবিদ্‌রা দু'ধরনের দুর্নীতির মধ্যে তফাৎ করে থাকেন : নির্ভরযোগ্য (predictable) দুর্নীতি ও অনির্ভরযোগ্য (unpredictable) দুর্নীতি। নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি হলো সে ধরনের ব্যবস্থা যেখানে ঘুষ দিলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত। বিনিয়োগকারীদের এ ধরনের দুর্নীতিতে অরুচি নেই, বরং এ ধরনের দুর্নীতি তাঁরা পছন্দ করেন, কেননা ঘুষ দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি, যাকে মাইকেল ক্যারিট সাহেব "শূয়রের বাচ্চাদের" দুর্নীতি বলে অভিহিত করেছেন। অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতিতে ঘুষ দিয়েও কার্যসিদ্ধির কোন নিশ্চয়তা নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একনায়কত্ব ও কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য দুর্নীতির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৮] যেখানে ক্ষমতা খণ্ডিত সেখানে ঘাটে ঘাটে নজরানা দিতে হয়। এর ফলে ঘুষ বাবদ ব্যয় বেড়ে যায়। অন্যদিকে বহু সংখ্যক ব্যক্তি ঘুষের ক্ষেত্রে নিমকহালালি করবে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাই "শূয়রের বাচ্চা" কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদ্‌গণ দুর্নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা দুর্নীতিকে একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে রাজি হননি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ্ গুনার মিরডাল (Gunnar Myrdal) ১৯৬৮ সনে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Asian Drama প্রকাশ করেন।[৯] এ গ্রন্থে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতি প্রতিহত করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। গত তিন দশক ধরে মিরডালের বক্তব্য ছিল নিছক অরণ্যে রোদন। তবে দুটো কারণে সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ দুর্নীতির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন। প্রথমত, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির দ্রুত প্রসার ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমলাতন্ত্র তস্করতন্ত্রে (kleptocracy) পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অতীতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উপেক্ষা করা হত। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক অগ্রগতির ফলে দুর্নীতি থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার কুফলসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দুর্নীতির চার ধরনের কুফলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। রাজস্ব বিভাগে দুর্নীতির ফলে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। আয় ও ব্যয়ের অসামঞ্জস্যের ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়ে চলে এবং মূল্যস্ফীতির ধাবমান ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। দুর্নীতির কারসাজিতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন কানুন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। তৃতীয়ত, দুর্নীতি সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে প্রকটতর করে। দুর্নীতির পূর্ণ দায় বহন করে সমাজের দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠী। যারা ধনী তারা ঘুষ দিয়ে সাত খুন মাফ পেয়ে যায়। দুর্নীতির মাশুল শোধ করে অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সর্বোপরি বিভিন্ন সমীক্ষা হতে দেখা যায়

যে, দুর্নীতি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে। নেহাত নিরুপায় না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণ ঘুষ দিয়ে বিনিয়োগ করতে চান না।

অবশ্য দুর্নীতির কোন সরলীকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দুর্নীতিকে "ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী দায়িত্বের অপব্যবহার" বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[১০] এ সংজ্ঞা অতি সংকীর্ণ। শুধু সরকারী কর্মচারিরাই দুর্নীতিবাজ হন না, বেসরকারী খাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও দুর্নীতি (যথা, প্রতারণা, ভেজাল ইত্যাদি) রয়েছে। উপরন্তু দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি দেখা যায়। ভারতে জনৈক রসিক ব্যক্তি বলেছেন, রাজনীতিবিদ্‌রা ও ডাকাতরা একই ধরনের কাজ করে থাকে, তবে সম্পূর্ণ উল্টো পরম্পরায়। ডাকাতরা প্রথমে ডাকাতি করে তারপর জেলে যায়; রাজনীতিবিদ্‌রা প্রথমে জেলে যান, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ডাকাতি করেন। তবু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির চেয়েও বড় সমস্যা হল প্রশাসনিক দুর্নীতি। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সুদৃঢ় তত্ত্বাবধান ছাড়া অর্থনৈতিক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

অপরাধ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে সাধারণত দু'ধরনের মতবাদ দেখা যায়। প্রথমত, এক ঘরানার (school) দার্শনিকরা মনে করেন যে অপরাধীরা নির্দোষ ও তারা সমাজের অন্যদের চেয়ে কোন মতেই ভিন্ন নয়। কিন্তু বিভিন্ন অনাচার ও অব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ নির্দোষ ব্যক্তিদের অপরাধীতে পরিণত করে। কাজেই অপরাধ দমনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। দ্বিতীয় ঘরানার দার্শনিকদের মতে অপরাধের জন্য সমাজ নয়, অপরাধীরাই দায়ী। তাই অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অপরাধ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে দুর্নীতির বিশ্লেষণেও তা প্রযোজ্য।

এক ঘরানার সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, দুর্নীতির মূল কারণ কতিপয় সরকারী কর্মচারিদের অন্তর্নিহিত অপরাধপ্রবণতা নয়; এর মূল কারণ হলো, বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে সরকারী কর্মচারিদের বেতন নেহাত অপ্রতুল। উন্নয়নশীল জগতে স্বল্প আয়ের সরকারী কর্মচারিদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। তাই তাদের পক্ষে উৎকোচ গ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ঘরানার পণ্ডিতদের সুপারিশ হল দুর্নীতি হ্রাস করতে হলে সরকারী কর্মচারিদের বেতন বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত বেতন পেলে সরকারী কর্মচারিরা তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে। এর ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে। উপরন্তু বেতন বাড়লে সরকারী কর্মচারিদের চাকুরির জন্য মমতা বাড়বে। তারা ঘুষ নিয়ে চাকুরি হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না। উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বিশ্বে সরকারী কর্মচারিদের বেতন বাড়ানোর যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কিন্তু এর ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ সন্দেহের চারটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, পর্যাপ্ত বেতন দিয়ে নতুন কর্মচারি নিয়োগ

করা হলে তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা হয়ত কমতে পারে। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের বেশি বেতন দিয়ে সৎ পথে ফেরানো কি সম্ভব? এদের অনেকেই বেশি বেতনও নেবে, ঘুষও খাবে। প্রশাসনে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারিরা সৎ কর্মচারিদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। মুদ্রার জগত সম্পর্কে লর্ড গ্রেশাম বলতেন: খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে তাড়িয়ে দেয়। প্রশাসনেও একই প্রবণতা দেখা যায়; দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারিরা সৎ কর্মচারিদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেরই সরকারী কর্মচারিদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সংগতি নেই। উপরন্তু সরকারী চাকুরের সংখ্যার আশঙ্কাজনক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এদের অনেকেরই কোন প্রয়োজন নেই। এ পরিস্থিতিতে সকল কর্মচারির বেতন বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও নয়।

তৃতীয়ত, উন্নত দেশসমূহে আশা করা হয় যে, সরকারী খাতে কর্মচারিদের মাইনে বেসরকারী খাতের মাইনের অনুরূপ বা বেশি হলেই সরকারের পক্ষে সৎ ও দক্ষ কর্মচারিদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশে সরকারী খাতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিদের মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেসরকারী খাতের অনুরূপ কর্মচারিদের থেকে বেশি। কিন্তু এ সব দেশের সরকারী খাতের কর্মচারিরা বেসরকারী খাতের চেয়ে সৎ বা কর্তব্যনিষ্ঠ নয়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, বেতন বেশি দিলেই দুর্নীতি দূর হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মার্কিন অর্থনীতিবিদ গর্ডন তুলক (Gordon Tullock) একটি আপাত-স্ববিরোধী সত্য তুলে ধরেছেন। এ বক্তব্য তুলকের আপাত-স্ববিরোধী সত্য (Tullock paradox) নামে পরিচিত।[১১] তুলক বলছেন যে, অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, যারা অনেক বেশি বেতন পায় তারাই অনেক সময় খুব অল্প টাকার ঘুষ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপ-রাষ্ট্রপতি স্পিরো এগ্‌নু (Spirow Agnew) অতি সামান্য উৎকোচের জন্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নিউইয়র্ক রাজ্যের এক বিধায়ক মাত্র তিন হাজার ডলার ঘুষের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ ডলার ভর্তুকির ব্যবস্থা করে। সরকারী কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি দুর্নীতি দমনে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই যথেষ্ট নয়।

আরেক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন যে, দুর্নীতি হ্রাসের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল দুর্নীতিপরায়ণদের আইন অনুসারে সাজা দেওয়া। এ মতবাদের সমর্থকগণ এ প্রসঙ্গে হংকং, চিলি ও নিউ সাউথ ওয়েলসের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে থাকেন। ষাটের দশকে হংকং নগর-রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। দুর্নীতি সংক্রান্ত নিরপেক্ষ কমিশন চিলিতে ও অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে দুর্নীতি দমনে কার্যকর হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন সংস্থা সফল হলেও বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সকল সমাজে সফল হয় না। শুধুমাত্র যে সব দেশে প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৎ কর্মকর্তা রয়েছে সে সব দেশে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সাজা দেওয়া সম্ভব। যে সব দেশে

প্রশাসনের অধিকাংশ কর্মকর্তাই ঘুষখোর সেখানে দুর্নীতি ধরবে কে? সর্ষেতে ভূত ঢুকে পড়ে। দুর্নীতি দমন সংস্থা নিজেই দুর্নীতিতে সংক্রমিত হয়। এ ধরনের সংস্থা দুর্নীতি দমন করতে পারে না, শুধুমাত্র ঘুষের বখরার সুষম বণ্টন করে। দুর্নীতি দমন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। দুর্নীতি দমনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে অভিযান করে দুর্নীতি তাড়ানো সম্ভব নয়।

দুর্নীতি যদি সমাজের কয়েকটি খাতে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা দমন করা সহজ; কিন্তু দুর্নীতি মুষ্টিমেয় লোকের বিচ্যুতি নয়, দুর্নীতি সারা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্নীতি একটি সামগ্রিক কাঠামোগত (systemic) সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের সমাজে দুর্নীতি নিরন্তর প্রতিক্রিয়ার (chain reaction) সৃষ্টি করে। এক ধরনের দুর্নীতি অন্য ধরনের দুর্নীতির জন্ম দেয়, এক খাত হতে দুর্নীতি অন্য খাতে সংক্রমিত হয়। এই পরিস্থিতিতে আইন সমাজের পরাক্রমশালীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট (Will Durant)-এর ভাষায়[১২]:

> Law is a spider's web that catches the little flies and lets the big bugs escape.
>
> (আইন হল মাকড়শার জালের মত যা ছোট ছোট পতঙ্গদের আটকাতে পারে, কিন্তু বড় পোকাদের ঠেকাতে পারে না)।

সরকারী প্রশাসনে যে কোন দুর্নীতিতে তিনটি পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষে রয়েছে সরকারী কর্মচারিরা, দ্বিতীয় পক্ষ হলো জনগণ ও তৃতীয় পক্ষে রয়েছে সরকার। বেতন বাড়িয়ে বা শাস্তি দিয়ে সরকারী কর্মচারিদের কিছুটা প্রভাবিত করা যেতে পারে। কিন্তু দুর্নীতি দূর করতে হলে সরকার ও জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন রাষ্ট্রের সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের একটি বড় তফাৎ রয়েছে। প্রাচীন রাষ্ট্রে যখন শোষণের মাত্রা বাড়ত তখন দুর্নীতির তীব্রতা বেড়ে যেত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার যখন জনগণের ভাল করতে চায় তখনও দুর্নীতি ফুলে ফেঁপে ওঠে। এর একটি কারণ হল আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে অনুপযোগী আর পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে অবাস্তব।

অনুপযোগী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় নজির হল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূল যুক্তি ছিল যে, এ সব প্রতিষ্ঠানের মুনাফা দিয়ে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থার অর্থের যোগান দেওয়া হবে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর সকল দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের জন্য প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সাংবাদিক উইল রজার্স (Will Rogers) যথার্থই পরামর্শ দিয়েছেন[১৩]:

> The business of the government is to keep the government out of business – that is, unless business needs government aid.
>
> (সরকারের কাজ হচ্ছে সরকারকে ব্যবসাবাণিজ্যের বাইরে রাখা যদি না ব্যবসায়ীরা সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে)।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা। সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। লাভের টাকা হাতে গোনা যায়; জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা মাপা সম্ভব নয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হল উৎপাদন। পক্ষান্তরে ঠিকমত ওজর-অজুহাত দেখানো হল সরকারী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় কাজ। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাই দুর্নীতির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। দুর্নীতি হ্রাস করতে হলে অবশ্যই সরকারের আকার ছোট করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় খাতের বাণিজ্যিক লেনদেন কমাতে হবে।

পদ্ধতিগত দিক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, আজকের রাজনীতিবিদ্গণ অর্থনৈতিক সমস্যার অর্থনৈতিক সমাধান না করে রাজনৈতিক সমাধান দিতে চান আর রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না করে আর্থিক সমাধান করতে চান। এর কারণ হল রাজনীতিবিদ্গণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু। ক্ষণভঙ্গুর হলেও তাঁরা চটজলদি যাদু দেখাতে চান। ভোটারদের দেখাতে চান যে, তাঁরা সব সমস্যার সমাধান জানেন। অথচ বাস্তবে এখন অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা রয়েছে যার কোন নিশ্চিত সমাধান নেই। এর ফলে হিতে বিপরীত হয়। একটি নজির দিচ্ছি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন জারি হয় তখন সামরিক শাসকরা শহরাঞ্চলের নাগরিকদের খুশী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলিতে একটি বড় সমস্যা ছিল খাঁটি দুধের অভাব। দুধে পানি মেশানো হতো। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধে পানি মেশানোর কারণ হল এই যে, খাঁটি দুধের দাম দেওয়ার মুরদ বেশিরভাগ ক্রেতারই নেই। ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার অভাবে দুধের উৎপাদন ছিল সীমিত। দুধের সরবরাহ না বাড়লে দুধের দাম বা দুধে ভেজাল কোনটিই কমবে না; কাজেই এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমাধান হল দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি। এ ধরনের সমাধানে সময় লাগবে, আরও লাগবে অর্থ। সামরিক শাসকরা তাই অর্থনৈতিক সমাধান উপেক্ষা করে এর রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করে। সামরিক শাসনের আগে দুধে ভেজাল দিলে বিচারক তার ইচ্ছামত নগণ্য জরিমানা করত। সামরিক শাসকরা মনে করে যে, ভেজালের জন্য জরিমানা বাড়ালেই ভেজাল দেওয়া কমে যাবে। তাই ১৯৫৯ সনে একটি নতুন আইন জারি করে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার সর্বনিম্ন জরিমানা ১৫০ টাকাতে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫৯ সনে ১৫০ টাকা আজকের কয়েক হাজার টাকার সমান। ষাটের দশকে এই আইন প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। এ আইনের অধীনে একটি মফস্বল শহরে প্রায় শ' খানেক আসামীকে আমি দেড় শত টাকা হারে জরিমান করি। এরপর আমি আশা করেছিলাম যে, দুধে পানি মেশান কমে যাবে। বাজার থেকে খবর নিয়ে জানা গেল যে, এসব শাস্তির পর দুধে পানি মেশানো বেড়ে গেছে। এর কারণ হল, আদালত কর্তৃক ভেজালের জন্য উঁচু হারে জরিমানা আরোপের ফলে বাজারে স্যানিটারি ইনসপেক্টরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তারা দুধ ব্যবসায়ীদের হুমকি দিতে থাকে যে, তাদের ঘুষ না দিলে তারা আদালতে মামলা ঠুকে দেবে এবং আদালতে গেলেই নতুন

হাকিম দুধওয়ালাদের জরিমানা করবে। স্যানিটারি ইনসপেক্টরদের ঘুষ দেওয়ার ক্ষতি পোষানোর জন্য দুধে পানি মেশানো আরও বেড়ে গেল। বিচারক হিসাবে আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম যে, সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যাটিকে আমি আরও প্রকট করে তুলেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে শুধু আইন করে সরকারের পক্ষে দুধে পানি মেশানো বন্ধ করা সম্ভব নয়। যে আইন সরকার কার্যকর করতে পারবে না সে আইন প্রণয়ন করে কোন লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হয়। প্লেটো যথার্থই বলছেন যে, আইন করে কোন লাভ নেই, কেননা যারা ভাল লোক তাদের না বললেও তারা দায়িত্বশীল থাকবে; আর যারা খারাপ লোক তারা আইন ফাঁকি দেওয়ার কোন না কোন পথ বের করে নেবে।[১৪] দুর্নীতি হ্রাস করতে হলে অবাস্তব আইনসমূহ বাতিল করতে হবে। সাথে সাথে সরকারের কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। যতদিন পারমিট ও লাইসেন্স থাকবে ততদিন দুর্নীতিও থাকবে। যেখানে সম্পদ অপ্রতুল ও দাবিদার অনেক সেখানেই লাইসেন্স ও পারমিটের জন্ম হয়। লাইসেন্স ও পারমিট হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান। অথচ এ ধরনের সমস্যার অর্থনৈতিক সমাধান খুবই সহজ। কোন জিনিষের সরবরাহ কম হলে তার দাম বাড়বে। নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলে বাজার যথাযথ মূল্যে যে কোন পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করবে। বাজারকে অস্বীকার করলে সমস্যার সমাধান হবে না, শুধুই দুর্নীতি বাড়বে।

নিজেদের দুর্নীতি হ্রাসে সরকারী কর্মচারিদের সাধারণত কোন আগ্রহ থাকে না; তাদের অনেকেই হচ্ছে দুর্নীতির প্রধান পোষক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেকেই দুর্নীতি দূর করতে চান। কিন্তু সরকারী কর্মচারিদের প্রতিরোধের সামনে তাঁরা অকার্যকর; অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। দুর্নীতি দূর করতে তাই প্রয়োজন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। তবু দুর্নীতি নির্মূল করা সহজ হবে না। শুয়রের বাচ্চারা একদিনে জন্ম নেয় না, কাজেই রাতারাতি তারা উধাও হবে না। দীর্ঘস্থায়ী এ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে সরকারের আয়তন হ্রাস। জনগণেরও ভাল করে বুঝতে হবে যে, বর্তমান কাঠামোতে সরকার জনগণের ভাল করতে গেলে তাদের উপকার হবে না, হবে অনিষ্ট। সরকার সম্পর্কে উইল রজার্স ঠিকই বলেছেন[১৫]:

> We should never blame the government for not doing something. It is when they do something is when they become dangerous.
>
> (কিছু না করার জন্য সরকারকে দোষারোপ করা আমাদের উচিত হবে না। যখন সরকার কিছু করতে চায় তখনই সরকার বিপজ্জনক হয়ে ওঠে)।

উন্নয়নশীল দেশের জনগণকে তাদের সরকারকে বলতে হবে : "হুজুর আমরা আপনার কাছে উপকার চাই না, শুধু মেহেরবানি করে আপনার শুয়রের বাচ্চাদের সামলান।"

## তথ্যসূত্র


১. Carritt, Michael, *A Mole in the Crown* (London : Central Books Ltd., 1985), p. 62

২. Doniger, Wendy and Smith, Brian. K., tr., *The Laws of Manu* (New Delhi : Penguin Books India, 1991), p. 141

৩. Kautilya, *The Arthasastra,* Rangarajan, L., tr., (New Delhi : Penguin Books India, 1992), p. 296

৪. Kangle, R. P., *The Kautilya Arthasastra* (Bombay : University of Bombay, 1972), p. 91

৫. উদ্ধৃত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ৩৯২

৬. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *ময়মনসিংহ গীতিকা,* (কলিকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ৬৮

৭. Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies* (New Haven : Yale University Press. 1968), p. 386

৮. Bardhan, Pranab, "Corruption and Development : A Review of Issues", *Journal of Economic Literature*, vol. XXXV. No. 3, pp. 1320-1346

৯. Myrdal, Gunnar, *Asian Drama* (New York : Pantheon, 1968), vol. II

১০. World Bank, *World Development Report* 1997 (New York : Oxford University Press, 1997). p. 102

১১. Tullock, Gordon, "The Costs of Special Privilege" *in Perspectives on Positive Political Economy,* Alt, James E. and Shepsle, Kenneth A., ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 195-211

১২. Durant, Will, *The Life of Greece* (New York : Simon and Schuster, 1963), p. 117

১৩. উদ্ধৃত Peter, Laurence J., *Peter's Quotations* (New York : Quill, 1977), p. 84

১৪. উদ্ধৃত Howard, Philip K. *The Death of Common Sense* (New York : Random House, 1994), p. 99

১৫. Rogers, Will, *The Wit and Wisdom of Will Rogers,* Ayres, Alex, ed., (New York : Penguin, 1993), p. 93

# সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

সংস্কারকে ব্যভিচারের সাথে তুলনা করে জনৈক রসিক ব্যক্তি বলেছেন : "যারা ব্যভিচার করে তারা কখনও এ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না, যারা পারে না তারাই এ নিয়ে ফরফর করে। যারা সংস্কার করে তারাও এ সম্পর্কে বড়াই করে না, যারা সংস্কার করতে পারে না তারাই এ সম্পর্কে হইচই করে।" নৈতিক দিক থেকে অবশ্যই সংস্কার ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। ব্যভিচার গর্হিত আর সংস্কার হল বাঞ্ছিত। তবু ব্যভিচার ও সংস্কার দুটোই হল সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত অপ্রিয়। এ ধরনের অপ্রিয় কাজ অতি দ্রুত সারতে হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে করতে গেলেই বিপত্তি দেখা দেয়।

সংস্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, "পতিত অবস্থা হতে মুক্তি।" বিবর্তনের সাথে সাথে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় না সেখানেই অধঃপতন দেখা দেয়। প্রখ্যাত দার্শনিক এডমুন্ড বার্ক যথার্থই বলেছেন, "A state without the means of some change is without its means of conservation" (যে রাষ্ট্রে কোন পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেই তার সংরক্ষণের কোন উপায় নেই।)[১] যে কোন রাষ্ট্রকাঠামোতেই সময়ে সময়ে পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ সব পরিবর্তনের অনিবার্যতা অগ্রাহ্য করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতাকে মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ মনসুর অলসন (Mancur Olson) একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ রোগের তিনি নাম দিয়েছেন "institutional sclerosis" বা প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন।[২] কঠিনীভবন বা স্ক্লেরৌসীস রোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন হওয়ার ফলে বিকল হয়ে যায়। তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। অলসনের ভাষায়, প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবনের চিহ্ন হল: "that slows its adoption to changing circumstances and technologies." (যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও প্রযুক্তির সাথে রাষ্ট্র কাঠামোর সমন্বয় বিলম্বিত করে।)

ব্যক্তির জীবনে স্ক্লুরৌসীস বিধাতার অভিশাপ, সমাজের ক্ষেত্রে "প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন" মানুষের সৃষ্টি। তবে সংস্কার প্রবর্তনে নিছক অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতা হতে "প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবনের" জন্ম হয় না। অনেক সময় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে দীর্ঘ সময় লাগে। আবার অনেক সময় সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। বিশেষ করে রাজনীতিবিদ্‌রা নতুন কোন ধারণা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। একজন মার্কিন রাজনীতিবিদ্‌ এ সন্দেহ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

> There are two areas where new ideas are terribly dangerous – economics and sex. By and large it's all been tried, and if it's new, it's probably illegal or dangerous or unhealthy.
>
> (দুটি ক্ষেত্রে নতুন ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক – অর্থনীতি ও যৌন জীবন। মোটামুটি সবই করে দেখা হয়েছে। যদি ধারণাটি নতুন হয় তবে তা বেআইনি অথবা বিপজ্জনক অথবা অস্বাস্থ্যকর)।

তবে সংস্কারের সকল প্রস্তাবই অভিনব নয়। তাই অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতা দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। যারা জ্ঞানী তারা নিজেরা ভুল করার আগেই অন্যের ত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এমনকি যারা নির্বোধ তারাও নিজেদের ভুল হতেই জ্ঞান লাভ করে। বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রব্যবস্থাতে বিপর্যয় দেখা দেয় তখন সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতার কোন সুযোগ থাকে না।

প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা। আধুনিক রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতা শাসকরাও নয়, জনগণও নয়। এ রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ স্বার্থের গোষ্ঠীসমূহ। অর্থনীতিবিদ্‌ অলসন এ সব গোষ্ঠীকে আখ্যায়িত করেছেন "বণ্টনমূলক জোট" (distributional coalition)।[৩] এদের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ নয়, আত্ম-কল্যাণ; এরা উৎপাদন বাড়াতে চায় না, বণ্টন ব্যবস্থায় নিজেদের বখরা বড় করতে চায়। এ ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জোট, পেশাদারদের সমিতি এবং কর্মচারি ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। যে কোন সংস্কার প্রবর্তিত হলেই কোন না কোন বণ্টনমূলক জোটের স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয়। কোন গোষ্ঠীই তাদের স্বার্থের ব্যাপারে আদৌ কোন আপোষ করতে রাজি নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাডের রণক্ষেত্রে রুশ সৈন্যরা দেশমাতৃকার জন্য যে আবেগ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি হিংস্রতা নিয়ে সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে কায়েমী স্বার্থবাদীরা।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে একদিকে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্য দিকে বণ্টনমূলক জোটের সংখ্যা বেড়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদের সমিতি থেকে বণিক সমিতি, পেশাদারী সংগঠন হতে শ্রমিক ইউনিয়ন – সর্বত্রই বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর কালো হাত থাবা বাড়িয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রের সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষমতা হয়েছে অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে সংস্কারের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। প্রথমত, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে

ঘটছে আমূল পরিবর্তন। স্নায়ুযুদ্ধে কোন বিজয়ী বা বিজিত নেই। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে শুধু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই তিরোহিত হয়নি, সাথে সাথে ধ্রুপদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও বাতিল হয়ে গেছে। পুঁজি নয়, জ্ঞানই হচ্ছে নতুন বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় ক্ষমতার মাপকাঠি। এই নতুন ব্যবস্থায় পুরানো দিনের নীতিসমূহ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কাজেই প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থাতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রের আর্থিক ঘাটতি অবশ্যই নতুন কোন ঘটনা নয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ স্যার জন হিকস যথার্থই লিখেছেন[৪]:

> If there is one thing about kings ... if there is one general thing about them which we seem to learn from history books it is that more often than not they were hard up.
>
> (রাজাদের একটি প্রবণতা ... ইতিহাস থেকে আমরা যদি একটিও শিক্ষা গ্রহণ করি তা হল রাজাদের সব সময়ে অর্থের টানাটানি ছিল)।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে আর্থিক সংকটের একটি বড় কারণ হল এই যে, সবাই কর হ্রাস করতে চায় কিন্তু কেউই খরচ কমাতে চায় না। এর ফলে ক্ষুদ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা সার্বিক আর্থিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সরকারের বাজেট ঘাটতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, গত দুই শতক ধরে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদ্ এ্যান্ ক্রুগার এ ধরনের ব্যর্থতাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন[৫] : করার ত্রুটি (errors of commission) আর না করার ত্রুটি (errors of omission)। সরকারের অপচয় প্রথম ধরনের ত্রুটির প্রকৃষ্ট নজির। দ্বিতীয়ত, না করার ত্রুটির মধ্যে রয়েছে অদক্ষ পরিচালনার ফলে সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোর অকার্যকরতা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপযোগী নীতি (যথা, অবাস্তব বিনিময় হার, সুদের হার ইত্যাদি) অনুসরণ। সরকার শুধু যা করছে তা ভালভাবে করলেই চলবে না, যা করছে না তাও করতে হবে।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাই যথেষ্ট নয়। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। কিন্তু ভাল অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল রাজনীতি নয়। যে ধরনের সংস্কার ভোটারদের আকৃষ্ট করে না, সে ধরনের সংস্কার রাজনীতিবিদ্দেরও আশীর্বাদ লাভ করে না। রাজনীতিবিদ্দের পক্ষে সংস্কার সম্ভব নয়, সংস্কারের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কের। রাজনীতিবিদ্দের চিন্তা আগামী নির্বাচনে সীমাবদ্ধ, একমাত্র বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়করাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মত অনিশ্চিত। সংস্কারের নিশ্চিত সাফল্যের কোন অব্যর্থ দাওয়াই নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অনাচার ও অব্যবস্থা রাতারাতি দূর করার কোন উপায় নেই। তাই সংস্কারের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে। যেখানে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও সংঘাত বেশি সেখানেই প্রয়োজন সৃজনশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

অর্থনীতিবিদ্ আর্নল্ড সি হারবারগার (Arnold C. Harberger) এ ধরনের নেতৃত্বকে "অর্থনৈতিক নীতিবীর" (economic policy heroes) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬] এই ধরনের বীরগণ তাঁদের বিশ্বাস, সংকল্প ও সাহসিকতায় উজ্জীবিত হন। এঁরা রাজনৈতিক আত্মহত্যাকে ভয় করেন না। এঁরা জানেন যে, সংস্কারের ক্ষেত্রে যারা বীজ বপন করে তারা সব সময়ে ফলভোগ করতে পারে না। কাজেই ফল ভোগ করা বড় কথা নয়, গাছ লাগানোই হল সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব। যুক্তিশীল লোকের পক্ষে এ ধরনের সংস্কারক হওয়া সম্ভব নয়, একমাত্র দুঃসাহসী লোকদের পক্ষেই সংস্কার করা সম্ভব। জর্জ বার্নাড শ ঠিকই বলেছেন[৭]:

> The reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.
>
> (যুক্তিবাদী লোক নিজেকে বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় কিন্তু অযৌক্তিক লোক বিশ্বকে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। সুতরাং সকল প্রগতি অযৌক্তিক লোকের উপর নির্ভরশীল)।

স্বাভাবিক পরিবেশে এ ধরনের নেতৃত্ব পাওয়া যায় না। সাধারণত বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের পরই এ ধরনের নেতৃত্বের উদ্ভব হয়।

অবশ্যই সনাতন আমলাতন্ত্রের পক্ষে সংস্কারের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। আমলাতন্ত্রের কোথাও কোথাও অর্থনৈতিক নীতিবীর লুকিয়ে থাকলেও, সামগ্রিকভাবে আমলাতন্ত্র নিজেই প্রচলিত ব্যবস্থার সুবিধাভোগী। অনেক ক্ষেত্রে এরাই ইচ্ছা করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। এরা নিজেদের উদ্যোগে এ সব অব্যবস্থা দূর করতে চাইবে না। তবে শুধু আমলাতন্ত্রই সংস্কারের প্রধান প্রতিবন্ধক নয়। প্রতিটি সংস্কারেই কেউ না কেউ লাভবান হয় আবার কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সংস্কার সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কার মুনাফা হবে আর কার লোকসান হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই সংস্কার সম্পর্কে সকলেরই মনে থাকে সন্দেহ। যেখানেই লাভ ও ক্ষতির প্রশ্ন রয়েছে সেখানেই সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এ ধরনের সংগ্রামে কোন কোন সময় এক পক্ষ অপর পক্ষকে পর্যুদস্ত করে, আবার কোথাও কোথাও দু'পক্ষের মধ্যে আপোষ হয়। কিন্তু পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষের ফয়সালা হওয়ার আগে সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

সংস্কার যত বিলম্বিত হয় সংস্কারের পরিধি হয় তত ব্যাপক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সংস্কারের মূল ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

ক. সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ভর্তুকিসহ ব্যয় হ্রাস ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি;

খ. সরকারের আয়তন হ্রাস এবং প্রশাসনিক সংস্কার;

গ. আর্থিক খাত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাংক ও অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এই সব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান;
ঘ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ এবং পণ্য ও সেবার মূল্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া;
ঙ. বাণিজ্য উদারকরণ, অশুল্ক বাধা তুলে দেওয়া এবং শুল্কের হার হ্রাস করা;
চ. বেসরকারী খাত বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কার।

সংস্কারের কৌশল সম্পর্কে দু'ধরনের মতবাদ দেখা যায়। এক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন যে, সংস্কারের প্রকৃত সুফল পেতে হলে সকল ক্ষেত্রে সংস্কার একই সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ধরনের মতবাদ প্রচণ্ড আঘাত পন্থা (big bang approach) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌রা পর্যায়ক্রমে সংস্কারের পক্ষে। এ ধরনের মতবাদকে ধীর পন্থা (gradualism) রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

"প্রচণ্ড-আঘাত পন্থার" সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন ডেভিড লিপটন (David Lipton), জেফরি স্যাকস[৮] (Jeffrey Sachs), এন্ডারস এ্যাসল্যান্ড[৯] (Anders Aslund), এন্ড্রু বার্গ[১০] (Andrew Berg) প্রমুখ। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, বিচ্ছিন্ন সংস্কার কখনও ফলপ্রসূ হয় না। সকল ক্ষেত্রে সংস্কার একই সাথে শুরু করতে হবে এবং স্বল্পতম সময়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। এঁরা মনে করেন যে, উপর থেকে অতর্কিতে ক্ষিপ্রতার সাথে সংস্কার চাপিয়ে দিতে হবে। অর্থনীতিবিদ্‌ জোয়ন রবিনসনের মত এঁরাও বিশ্বাস করেন যে, অর্থনীতির প্রথম সবক হল, অর্থনীতিতে সব কিছুই অন্য সবকিছুর উপর নির্ভর করে। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, এক খাতের সংস্কার অন্য খাতের সংস্কারের পরিপূরক। তাই অর্থনীতির এক খাতের সাফল্য অন্য খাতকে উজ্জীবিত করে এবং এক খাতের ব্যর্থতা অন্য খাতে সংক্রমিত হয়। এই ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বিতীয় যুক্তি হল, সংস্কারের সাফল্যের একটি আবশ্যিক শর্ত এই যে, জনগণকে সরকারের সংস্কার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার সম্পর্কে আস্থাশীল হতে হবে। যদি এ ধরনের ধারণা জন্মে যে, গৃহীত সংস্কারসমূহ পরিত্যক্ত হতে পারে তবে কেউই সংস্কারকে সমর্থন করতে চাইবে না। শুধুমাত্র ব্যাপক ও দ্রুত সংস্কারই জনমনে আস্থা সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, এ মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, সংস্কার প্রক্রিয়া যত বিলম্বিত হবে সংস্কারের শত্রুরা ততই মরিয়া হয়ে সংস্কার প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। একমাত্র প্রচণ্ড আঘাতের মাধ্যমেই সংস্কারের বিপক্ষে রাজনৈতিক বিরোধিতা নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব।

প্রচণ্ড-আঘাতপন্থীদের বক্তব্য পড়লে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের একটি গল্প মনে পড়ে যায়। মোল্লা নস্‌রুদ্দীন এক বাড়িতে কিছুদিন চাকরের কাজ করেছিলেন। মনিব তাঁকে একদিন ডেকে বললেন, "দেখ বাপু তুমি একবারের কাজ একবারে কর না। তোমাকে তিনটি

ডিম আনতে বললে তিন বার বাজারে যাও। এতে অযথা সময় নষ্ট হয়। এবার থেকে একবারে সব কাজ সেরে আসবে।"

একদিন মনিবের অসুখ করলো। তিনি নস্‌রুদ্দীনকে ডেকে বললেন, "হেকিম ডাক।"

নস্‌রুদ্দীন গেলেন, কিন্তু ফিরলেন অনেক রাতে। আর সঙ্গে নিয়ে আসলেন এক দঙ্গল লোক।

মনিব ক্ষেপে বললেন, "হেকিম কই? এত সময় লাগল কেন?"

নস্‌রুদ্দীন বললেন, "আপনি 'যেভাবে হুকুম করেছেন সেভাবেই' কাজ করেছি। হেকিম নিয়ে এসেছি। কিন্তু হেকিম যদি আপনার অসুখ দেখে বলেন পুলটিস লাগবে, তার জন্য লোক নিয়ে এসেছি। হেকিম যদি বলেন গরম জল চাই, তবে কয়লা লাগবে। তাই কয়লাওয়ালা নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে যদি আপনার শ্বাস ওঠে তবে কোরান শরীফ পড়ার জন্য মৌলভী লাগবে। তাই মৌলভী সাহেবকে নিয়ে এসেছি। আর আপনি যদি মরে যান তবে লাশ বইবার লোক চাই। সে জন্যও লোক নিয়ে এসেছি।"

মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের কপাল ভাল এতসব লোক জোগাড় করে ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর মনিব জীবিত ছিলেন। কিন্তু এত সব সম্পন্ন করার বহু আগেই বেশির ভাগ রোগী মরে যাবে। একসাথে এত সংস্কার করতে গেলে আঁতুড়ঘরেই সংস্কার অক্কা পাবে।

ধীর পন্থার সমর্থকগণ মনে করেন যে, সংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এ মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন রিচার্ড পোর্টেস[১১] (Richard Portes), রোনাল্ড ম্যাকিনন[১২] (Ronald Mckinnon), ম্যাথিয়াস ডিউয়াট্রিপন্ট (Mathias Dewatripont) এবং রোনাল্ড জেরার্ড[১৩] (Ronald Gerard) । তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। প্রচণ্ড আঘাত জনগণের কষ্ট বাড়ায় এবং জনগণকে সংস্কার প্রক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ধীরপন্থীরা মনে করে যে, আস্তে আস্তে সংস্কার বাস্তবায়নে জনগণের যন্ত্রণা লাঘব হবে এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার পক্ষে ধীরে ধীরে জনসমর্থন সৃষ্টি হবে। ধীর পন্থায় সংস্কারের সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ফল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শূন্য নয়, ঋণাত্মক। ব্যর্থ সংস্কার উপকারী নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপকারী। এ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে[১৪]:

> Failed reform attempts could be very costly. For example, money spent to restructure state enterprises and pay off their debts is wasted if the enterprises fail to improve. More difficult to quantify, but not less important are the costs in wasted human and political capital.
>
> (ব্যর্থ সংস্কার প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্ষতিসাধক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন উন্নতি না দেখা দেয় তবে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ও মন্দ দেনা পরিশোধের জন্য ব্যয়িত অর্থের অপচয় হয়। মানবিক ও রাজনৈতিক পুঁজির ক্ষতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়)।

ধীর পন্থার সমালোচকগণ মনে করেন যে, কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার ফলে সংস্কারের পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনসমর্থন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ধীর পন্থার সংস্কার প্রক্রিয়াকে তাই মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের ভালুক শিকারের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, সুলতান একবার মোল্লা নস্‌রুদ্দীনকে তাঁর সাথে ভালুক শিকারে যাওয়ার জন্য তলব করলেন। নস্‌রুদ্দীন ছিলেন খুবই ভীরু। তবু সুলতানের আদেশ পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ভালুক শিকারে গেলেন। পরদিন নস্‌রুদ্দীন খুবই খোশ মেজাজে বাড়ি ফিরে এলেন। মোল্লার স্ত্রী জানতে চাইলেন, ভালুক শিকার কেমন হয়েছিল। মোল্লা জবাব দিলেন, "চমৎকার"।

মোল্লার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, "কয়টি ভালুক মেরেছেন?"

মোল্লা বললেন, "একটিও না।"

আবার প্রশ্ন হল, "কয়টি ভালুক দেখেছেন?"

মোল্লা উত্তর দিলেন ঃ "একটিও না।"

মোল্লার স্ত্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "শিকার তা হলে চমৎকার হল কিভাবে?"

মোল্লা বললেন, "আহা, বেগম। তুমি বুঝতে পারছো না। ভালুক শিকারে 'একটিও না' যথেষ্টের চেয়ে বেশি।" ভীরুরা ভালুক শিকার করতে পারে না; তাদের পক্ষে সংস্কার করাও সম্ভব নয়।

আসলে প্রচণ্ড আঘাতপন্থী ও ধীরপন্থীদের বিতর্ক বিভ্রান্তিমূলক। কোথাও সকল সংস্কার এক সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের সংস্কার সম্পন্ন না হলে পরবর্তী পর্যায়ের সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। সংস্কার সব ক্ষেত্রে রাতারাতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সংস্কার করতে সময় লাগবেই। পক্ষান্তরে ধীর পন্থার লক্ষ্য সংস্কারের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে রাখা নয়। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে যথাসময়ে সংস্কার না করলে সংস্কারের সুফল কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কারের মূল সমস্যা হল কোন্ সংস্কার আগে বাস্তবায়ন করা হবে এবং কোন্ সংস্কার পরে বাস্তবায়ন করা হবে তার পরম্পরা (sequence) নির্ণয় করা।[১৫] পরম্পরা নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে দুটো মতবাদ দেখা যায়। একটি মতবাদের বক্তব্য হল সহজ সংস্কার হতে শুরু করে দুরূহ সংস্কার করতে হবে। এ মতবাদ কৌশলগত ছিট-মহল (strategic enclave) পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। দ্বিতীয় মতবাদের বক্তব্য হল এই যে, যে খাতে সংস্কার করলে বেশি লাভ হবে সে খাতেই সংস্কার শুরু করতে হবে। বাস্তবায়নের সুবিধা বড় কথা নয় অর্থনৈতিক গুরুত্বই হবে সংস্কারের খাত নির্বাচনের মাপকাঠি। এ মতবাদ সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরাভিত্তিক (optimum sequencing) পদ্ধতি নামে পরিচিত।

কৌশলগত ছিট-মহল পদ্ধতিতে সংস্কারের মূল বক্তব্য হল এই যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এ ধরনের প্রশাসনের পক্ষে সব এলাকায় এক সাথে সংস্কার সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই যেখানে বাস্তবায়ন সহজ সেখানেই সংস্কার শুরু করতে হবে। এ কৌশলের দুটো সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, নির্বাচিত এলাকাতে সংস্কার

শুরু করলে সংস্কারের সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সংস্কারে সাফল্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে সংস্কারের পথ সুগম করে। দ্বিতীয়ত, কৌশলগত ছিট-মহলে সংস্কার শুরু করলে সংস্কার বাস্তবায়নে যে সব ত্রুটি দেখা যায় তা দূর করা সহজ হয়। এক সাথে বেশি ভুল করলে শুধরানো সহজ হয় না। এই পন্থার দুর্বলতা দুটো। প্রথমত, এ পন্থা অনুসারে সংস্কার বাস্তবায়ন যে সব এলাকাতে সহজ সে সব এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে প্রথম প্রজন্মের সংস্কারের পর দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের জন্য আদৌ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় না। সংস্কার শুধু কৌশলগত ছিট-মহলে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সংস্কারকে সমগ্র ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সব সংস্কার প্রয়োজন সে সব সংস্কার আগে বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধু মাত্র রাজনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করে সংস্কারের কৌশল নির্ধারণ করা সঠিক হবে না।

সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরা-ভিত্তিক সংস্কারের সমর্থক হল অর্থনীতিবিদ্‌রা। এই কৌশলের মূল বক্তব্য হল, বিভিন্ন খাতের সংস্কার পরিপূরক। অর্থনৈতিক দিক থেকে আগে যে সব খাতে সংস্কার প্রয়োজন সে সব খাতে সংস্কার শুরু করতে হবে। এ মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের আগে অর্থনীতির উদারকরণ সঠিক হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাজেট ঘাটতি হ্রাস করার আগে বাণিজ্য উদারকরণ করা হলে শুল্ক খাতে রাজস্ব কমে যেতে পারে। এর ফলে বাজেট ঘাটতি আরো বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের আগে সুদের হারের উপর সকল বিধিনিষেধ তুলে দিলে সরকারের ঋণ বাবদ সুদের ব্যয় বেড়ে যাবে। এর ফলে বাজেট ঘাটতির সমস্যা প্রকট হবে। সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরা-ভিত্তিক সংস্কারের সমর্থকগণ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ অনুক্রম সমর্থন করেন : সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, অভ্যন্তরীণ আর্থিক খাত সংস্কার, শ্রম বাজারসহ বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের বাজার সংস্কার, পণ্যের বাজার সংস্কার, বৈদেশিক বাণিজ্যের সংস্কার এবং পুঁজি বাজার সংস্কার। অবশ্য সকল দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অভিন্ন নয়। কাজেই প্রতিটি দেশকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সংস্কারের সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরা নির্ধারণ করতে হবে।

প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি যথার্থই বলেছেন[১৬]:

> The innovator makes enemies of all those who prospered under the old order and only lukewarm support is forthcoming from them who would prosper under the new.
>
> (যারা পুরানো ব্যবস্থাতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তারা নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তকদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি যারা নতুন ব্যবস্থায় লাভবান হবে তারাও সংস্কারকে অত্যন্ত হালকা সমর্থন প্রদান করে)।

সংস্কারের শত্রুর অভাব নেই, কিন্তু সংস্কারের বন্ধু খুবই কম। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমত, সংস্কারের ফলাফল নিশ্চিত নয়। তাই সংস্কারের ফলে যাদের লাভবান

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারাও সরাসরি লাভবান না হওয়া পর্যন্ত সংস্কার সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রথম পর্যায়ে কারো লাভ হয় না বরং সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলে থাকেন যে ,সংস্কারের ফল ইংরাজি J অক্ষরের মত। প্রথম দিকে J অক্ষর নীচের দিকে নামে। সংস্কারের ফল প্রথম দিকে তাই ঋণাত্মক থাকে। J অক্ষর অল্প ব্যবধানে উপরের দিকে উঠতে থাকে। অতি অল্প সময়ের জন্য ঋণাত্মক প্রভাবের পর সংস্কারে সুফল দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের ফলাফল ঋণাত্মক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের জন্য সমর্থন লাভ সম্ভব হয় না।

সংস্কার বাস্তবায়নে যে সব বাধা আসে তাদের সম্বন্ধে দু'ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অতি সহজে প্রদান করা সম্ভব। স্বল্প মেয়াদে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ ব্যয়বহুল হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর সুফল অনেক বেশি লাভজনক হতে পারে। কিন্তু ক্ষতির খেসারত তাদেরই দেওয়া সম্ভব যাদের ক্ষতি প্রত্যক্ষ ও আইনসঙ্গত। কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি প্রতিরোধ আসে তাদের কাছ থেকে যারা প্রচলিত ব্যবস্থা হতে অনুপার্জিত মুনাফা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে শ্রমিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু শ্রমিকদের নামে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বেআইনীভাবে অর্থ আত্মসাৎ করছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া শক্ত। তাই অনুপার্জিত মুনাফাখোরদের না তাড়িয়ে সংস্কার বাস্তবায়ন করা যাবে না। সংস্কারকে জয়যুক্ত করতে হলে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। সংস্কারের পক্ষে সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে হবে।

কোন্ ধরনের সরকার সংস্কারের পক্ষে অধিকতর উপযোগী সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, একনায়কদের পক্ষে সংস্কার ত্বরান্বিত করা সহজ; কেননা একনায়কদের ভোটারদের খুশি করার কোন বালাই নেই এবং তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা সংস্কারের বিপক্ষে অতি সহজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবু একনায়করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংস্কারের সপক্ষের শক্তি নন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, স্বৈরাচারী সরকার অনেক ক্ষেত্রেই দস্যু-সরকারে পরিণত হয়। হাইতিতে ডুভালিয়র, উগান্ডাতে ইদি আমিন ও জায়ারে মবুতু সরকার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক সরকারও (যেমন স্পেনে) সাফল্যের সাথে সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৭-এর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংস্কারের সহায়তা করেছে, অন্যদিকে শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে একনায়কত্ব সাফল্যের সাথে সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। বাকি ষাট ভাগ ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সকল

ক্ষেত্রে সংস্কার সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে দস্যু সরকার কখনও টিকে থাকতে পারবে না।[১৭]

সংস্কার হল এক ধরনের যুদ্ধ। সকল যুদ্ধেই রণনায়কদের মনে রাখতে হয় যে, শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়, সব সময়েই পেছনে হটে যাওয়ার জন্য আপৎকালীন পরিকল্পনা থাকতে হবে। সংস্কারকে শুধু সাফল্যের জন্য প্রস্তুত থাকলেই চলবে না, ব্যর্থতার জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সংস্কার হল প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের মত জটিল। প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক যে কোন আহাম্মকও শুরু করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্কের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি টানতে পারে একমাত্র পাকা খেলোয়াড়রাই। সংস্কারও যে কোন আহাম্মক শুরু করতে পারে কিন্তু সবাই সংস্কার শেষ করতে পারে না। যারা সংস্কার করে তারা বাঘের পিঠে চড়ে বসে। যারা সংস্কার শেষ করতে পারে না, তাদের অবস্থা নীচের ছড়ার নায়িকার মত হয়ে দাঁড়াবে:

There was a young lady of Niger
Who smiles as she rode on a tiger
They returned from the ride
With the lady inside
And the smile on the face of the tiger.

(নাইজারের একজন যুবতী মহিলা একটি বাঘের পিঠে চড়ে হাসছিল। যখন ভ্রমণ শেষে তারা ফিরল তখন মহিলাটি ভেতরে আর হাসি বাঘের মুখে)।

সংস্কার করতে গেলে বাঘের পিঠে চড়তেই হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ গহন অরণ্যের চেয়েও অনেক বেশি শ্বাপদ-সঙ্কুল। এখানে কায়েমী স্বার্থবাদী বণ্টনমূলক জোটসমূহ (যারা ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমিতি নামে পরিচিত) বনের বাঘের চেয়েও হিংস্র ও ক্ষিপ্র। বাঘকে এড়ানোর স্বাধীনতা সংস্কারকের নেই। তবে সব বাঘের বিরুদ্ধে এক সাথে লড়াইয়ের প্রয়োজনও তার নেই। তার পক্ষে বাঘ নির্বাচন সম্ভব। প্রথম লড়াইয়ের জন্য সংস্কারককে তাই এমন বাঘ বেছে নিতে হবে যাকে সে সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ পরাভূত করতে পারবে। পারস্যের কাহিনীকার নতুন বিবাহিত স্বামীদের যে পরামর্শ দিয়েছে সংস্কারকদের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য: "গুরবা কুশ্‌তান শব-ই-আউওয়াল" (বিড়াল মারো প্রথম রাতে)।

## তথ্যসূত্র

১. Burke, Edmund, *Reflections on the Revolution in France* (New York: Doubleday & Co. Inc., 1961), p. 33

২. Olson, Mancur, *The Rise and Decline of Nations* (New Haven: Yale University Press, 1982)

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 58

৪. Hicks, Sir John, *A Theory of Economic History* (London: Oxford University Press, 1969), p. 81

৫. Krueger, Anne O. , "Government Failures in Development" , *The Journal of Economic Perspectives*, 1990. vol. 4. No. 3, pp. 25-40

৬. Harberger, Arnold C., "Secrets of Success : A Handful of Heroes", *American Economic Review*, 1993. vol. 83. No. 2. pp. 343-350

৭. উদ্ধৃত Partington, Angela, ed., *The Concise Oxford Dictionary of Quotations* ( Oxford : Oxford University Press, 1997), p. 302

৮. Lipton, David and Sachs, Jeffrey, "Creating a Market Economy in Eastern Europe : The Case of Poland", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1990 (1), pp. 75-137

৯. Anders, Aslund, "Principles of Privatization" in Laszio Casba, ed., *Systematic Change and Stabilization in Eastern Europe* (Dartmouth : Aldershot, 1991), pp 17-31

১০. Berg, Andrew and Jeffrey, Sachs, "Structural Adjustment and International Trade in Eastern Europe: The Case of Poland", *Economic Policy*, April 1992, pp. 117-73

১১. Portes, Richard, "The Path of Reform in Central and Eastern Europe : An Introduction, *European Economy*, 1991, special issue, pp. 3-15

১২. Mckinnon, Ronald, *The Order of Economic Liberalization* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999)

১৩. Dewatripont, Mathias and Ronald, G., "The Design of Reform Packages Under Uncertainty", *American Economic Review*, 1995, vol. 85. pp. 1207-1223

১৪. World Bank, *Bureaucrats in Business* (New York : Oxford University Press, 1955), p. 16

১৫. World Bank, *World Development Report*, 1997 (New York : Oxford University Press, 1997), pp. 151-154

১৬. Machiavelli, Niccolo, *The Prince,* Ball, George, tr., (London : Penguin Books, 1991)

১৭. World Bank (1997), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 144-150

# মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের অর্থনীতি

"খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর"; আমি খুঁজে বেড়াই অর্থনীতিবিদ্। মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন, তার চেয়েও অনেক বেশি শক্ত হল মনের মতন অর্থনীতিবিদের হদিস। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতের ও পথের শেষ নেই। কথায় বলে, যেখানে দু'জন অর্থনীতিবিদ্ রয়েছেন, সেখানে দুটো নয় তিনটে মত দেখা যাবে। এমনকি যেখানে একজন অর্থনীতিবিদ্ রয়েছেন সেখানেও একাধিক মত দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান বলতেন, তিনি এমন অর্থনীতিবিদ্ চান না যার দুটো হাত রয়েছে; তাঁর দরকার এক হাতওয়ালা অর্থনীতিবিদ্। ট্রুম্যান সাহেবের এ অদ্ভুত বায়নার অবশ্য কারণ আছে। যখনই কোন সমস্যা সম্পর্কে তিনি অর্থনীতিবিদে্র মতামত জানতে চেয়েছেন তখনই তিনি জবাব পেয়েছেন, "On the one hand" (এক দিকে) এটা ঘটতে পারে, "On the other hand" (আর এক দিকে) অন্য রকমের সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রুম্যান সাহেব তাই মনে করতেন, অর্থনীতিবিদের দুটো হাত থাকলেই বিপদ, কেননা তার কাছ থেকে সুস্পষ্ট কোন সুপারিশ পাওয়া যাবে না।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ শুধু দ্ব্যর্থক ও অস্পষ্ট উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না। তাঁদের অনেকেই ক্ষণে ক্ষণে মত বদলান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বিংশ শতাব্দীর সেরা অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইনস। এত ঘন ঘন মত বদলানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল। লর্ড সাহেব উত্তর দেন, তিনি নষ্ট ঘড়ির কাঁটা নন যা দিনে দু বার মাত্র সঠিক সময় দেয়। তিনি দাবি করেন, তিনি হচ্ছেন একটি চলন্ত ঘড়ি, তাঁর কাঁটাও তাই সেকেন্ডে সেকেন্ডে পরিবর্তিত হয়। লর্ড কেইনসের মত দ্রুত পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে চলা আমার মত গোবেচারার পক্ষে কষ্টকর। লর্ড কেইনসের তুলনায় মোল্লা নস্‌রুদ্দীনকে তাই আমার অনেক বেশি পছন্দ। কথিত আছে, এক ব্যক্তি মোল্লার কাছে তাঁর বয়স জানতে চেয়েছিল। মোল্লা বললেন যে, তাঁর বয়স চল্লিশ। উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, দশ বছর আগেও মোল্লা বলেছেন তাঁর বয়স চল্লিশ; কাজেই দশ বছর পরে তাঁর বয়স চল্লিশ হওয়া সম্ভব নয়। মোল্লা জবাব দেন,

তিনি এক কথার মানুষ; কয়দিন পর পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন না। কাজেই দশ বছর আগে তিনি যা বলেছেন আজও একই কথা বলছেন। এ ধরনের অর্থনীতিবিদ্‌রাই হলেন ট্রুম্যান সাহেবের এক হাতওয়ালা অর্থনীতিবিদ্। আমার মনের মতন অর্থনীতিবিদ্।

সভ্যতার ইতিহাসের সুদীর্ঘ পটভূমিতে অর্থনীতি একটি অর্বাচীন শাস্ত্র। গণিত, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র কমপক্ষে অর্থনীতির দু'হাজার বছর আগে জন্ম নিয়েছে। এডাম স্মিথের "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" বইটির প্রকাশনার তারিখ ১৭৭৬ খৃস্টাব্দকে সাধারণত অর্থনীতির জন্মলগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এর প্রায় পাঁচশ বছর আগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুরস্কের খোর্তো গ্রামে নস্‌রুদ্দীন খোজার জন্ম।[১] তিনি শুধু সুপণ্ডিত ও সুকবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ইমাম। পাশ্চাত্য জগতে তিনি তাই মোল্লা হিসাবে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতকের মোল্লার পক্ষে আজকের অর্থনীতিবিদ্‌দের মত পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রণয়ন সম্ভব ছিল না। মোল্লার সময়ে শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির জন্ম হয়নি বটে, কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে মোল্লার জন্মের অনেক আগেই দার্শনিকগণ চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। মোল্লার জন্মের আঠারো শ বছর আগে গ্রীক দার্শনিকগণ অর্থনীতির মৌল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। গ্রীক দার্শনিকগণ অর্থনীতি সংক্রান্ত যে সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি, মোল্লা নস্‌রুদ্দীন তাঁদের অনেকগুলি সমাধান করেছেন। এরিস্টটলের কাছে বাজারের মূল্য নির্ধারণ-পদ্ধতি ছিল একটি প্রহেলিকা। তিনি বলতেন যে, জল-যার অপর নাম জীবন তা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, অথচ হীরক—যার কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা নেই, বাজারে অতি চড়া দামে বিক্রি হয়। গ্রীক দার্শনিকদের মতে তাই বাজারের মূল্য-নির্ধারণ পদ্ধতি হল অন্যায্য। মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের কাছে মূল্য-নির্ধারণ ব্যবস্থা দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে মনে হয়নি। এ সম্পর্কে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের একটি গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। এক ব্যক্তি মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চায়। মোল্লা তাকে বললেন যে, সত্য সম্পর্কে জানতে হলে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে। হবু শিষ্য বললেন যে, সত্য জানার জন্য কেন এত বেশি দাম দিতে হবে তা বুঝতে সে অক্ষম। মোল্লা তাকে বললেন, "সত্য হল দুষ্প্রাপ্য এবং সকল দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যই চড়া দামে কিনতে হয়।"

অর্থনীতি সম্পর্কে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রাচীন ও আধুনিক – উভয় ধরনের অর্থনীতিবিদ্‌দের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। আধুনিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ হল গণিত-ভিত্তিক। প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের বিশ্লেষণ ছিল দর্শনভিত্তিক। মোল্লা নস্‌রুদ্দীন গণিতবিদ্‌ও ছিলেন না, আনুষ্ঠানিকভাবে দার্শনিকও ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য বেঁচে আছে কতগুলি মস্কারা ও মজার গল্পে। অবশ্য হাসতে হাসতে মোল্লা যা বলে গেছেন আজকের অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা অনেক পরিশ্রম করেও তার চেয়ে খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেননি।

অর্থনীতি সম্পর্কে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের জ্ঞান ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পদ্ধতিগত দিক থেকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মোল্লার আস্থা ছিল না, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জ্ঞান অর্জন করতেন। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে। মোল্লা একবার একটি গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক ছাদ থেকে মোল্লার ঘাড়ের উপর পড়ে। যে লোকটি পড়ে তার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। মোল্লাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে মোল্লার অবস্থার উন্নতি হলে শিষ্যরা জানতে চান, এ ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। মোল্লা জবাব দেন, "কার্যকারণের অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস করো না। ছাদ থেকে পড়লো লোকটা; ঘাড়টা ভাঙল আমার। ভবিষ্যতে এই ধরনের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে কখনও পৌছবে না, যে কোন লোক ছাদ থেকে পড়লেই তার নিজের ঘাড় ভাঙবে।"

আধুনিক অর্থনীতিতে আমরা অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব শিখছি। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব সবই মৌলিক তা মনে করা ঠিক হবে না। একজন দার্শনিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, মৌলিকতা হচ্ছে ধরা না পড়ে অন্যের ভাব চুরি করা। প্রকৃতপক্ষে সকল নতুন তত্ত্বেরই বীজ সংগৃহীত হয় পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে। স্যার আইজাক নিউটন তাই বলতেন[২]: "If I have been able to see farther than others, it was because I stood on the shoulders of giants." (আমি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি দূরে দেখে থাকি, তার কারণ হল আমি অস্বাভাবিক বড় মাপের মানুষের কাঁধের উপর দাঁড়িয়েছিলাম।) আজকের অর্থনীতিবিদ্‌রাও তেমনি অনেক ধারণাই গ্রহণ করেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষদের কাছ থেকে। মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের চুটকিগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা শুধু নির্মল আমোদই লাভ করি না, আমরা তাঁর ভূয়োদর্শন থেকেও জ্ঞান লাভ করি। ভালভাবে তলিয়ে দেখলে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনকে দু'ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের পথিকৃত বলে মনে হয়। প্রথমত, মোল্লা অর্থনৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন। দ্বিতীয়ত, মহাজনদের আচরণ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। মহাজনদের আচরণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আজকের বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মোল্লার হাসির গল্পগুলি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের আচরণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে অতি সহায়ক।

প্রথমে ঝুঁকি নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। ঝুঁকির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল risk । ইংরেজী ভাষায় risk-এর শাব্দিক অর্থ হল সাহস করা। এ সাহস দেখানো হয় যা অজানা বা অনিশ্চিত তার ক্ষেত্রে। সবচেয়ে অনিশ্চিত হল ভবিষ্যত। প্রাচীনকালে সবাই মনে করত যে, ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের কিছুই করার নেই। ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রিত হয় দেবদেবতাদের খেয়ালখুশিতে। যে সব দার্শনিক অজানা ভবিষ্যতের ঝুঁকির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে এগিয়ে আসেন তাঁরা সত্যিই ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী তাত্ত্বিক। পিটার এল বার্নস্টাইন (Peter L. Bernstein) নামে একজন বিশেষজ্ঞ ঝুঁকি সম্পর্কিত তত্ত্বের একটি ইতিহাস লিখেছেন। বইটির তিনি নাম দিয়েছেন "Against the Gods : the

Remarkable Story of Risk" (বিধাতার বিপক্ষে : ঝুঁকির অসামান্য কাহিনী)।[৩] বার্নস্টাইনের মতে গ্রীক লোককাহিনীর নায়ক প্রমিথিউস যেমন দেবতাদের অমান্য করে অন্ধকার থেকে আলো ছিনিয়ে এনেছে, ঝুঁকি সম্পর্কিত তাত্ত্বিকরা তেমনি তমসাবৃত ভবিষ্যতের রহস্য ভেদ করে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বার্নস্টাইনের ইতিহাসে ঝুঁকি সম্পর্কিত বিশ্লেষণের পথিকৃতদের তালিকায় মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের নাম নেই। তার তালিকা শুরু হয়েছে সপ্তদশ শতকের ফরাসী ভূস্বামী শেভালিয়ে দ্য মেয়ার (Chevalier de Mere)-এর নাম দিয়ে। এ তালিকায় রয়েছে সপ্তদশ শতকের পাসক্যাল ও ফারম্যাট, অষ্টদশ শতকের লাইবনিজ, আব্রাহাম দ্য মোয়াভ (Abraham de Moivre) , ও বার্নোলি (Bernoulli)। ত্রয়োদশ শতকের মোল্লা নস্‌রুদ্দীন কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ অনেক আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদ্ মার্কভিজ (Markowitz) ১৯৫২ সালে তাঁর পত্রকোষ বা portfolio তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। পত্রকোষ বা portfolio-এর শাব্দিক অর্থ হল একজন ব্যক্তির সকল কাগুজে সম্পদের (যথা শেয়ারের কাগজ) সংগ্রহ (যা সাধারণত একটি "পোর্টফোলিও" ব্যাগের মধ্যে রাখা হয়)। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, এক ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করা হলে যদি এ সম্পদের দাম কমে যায় তবে বিনিয়োগকারী ফতুর হয়ে যাবে। এক ঝুড়িতে সকল ডিম রাখা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয় তেমনি এক ধরনের সম্পদে—যা আপাতদৃষ্টিতে যত লাভজনকই হোক না কেন, বিনিয়োগ করা ঝুঁকিপূর্ণ। মার্কভিজের পরামর্শ হল সম্পদের বৈচিত্র্যায়ন (diversification) হচ্ছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি সহজ পথ। এ তত্ত্ব পত্রকোষ বা portfolio theory নামেও পরিচিত।

মার্কভিজের প্রায় সাতশ বছর আগে মোল্লা নস্‌রুদ্দীন ঝুঁকি বৈচিত্র্যায়নের পরামর্শ দিয়েছেন। মোল্লা নিজের জীবনেও তাঁর চর্চা করেছেন। মোল্লার দুই মেয়ে ছিল। তিনি একজনকে বিয়ে দেন চাষীর সাথে, অন্য মেয়ের বিয়ে দেন ইটের ভাটার মালিকের সাথে। ভালো বৃষ্টি হলে চাষীর ঘরণী আরামে থাকত। আর বৃষ্টি না হলে বা কম হলে ইটের ভাটার মালিকের স্ত্রীর থাকত রমরমা অবস্থা। বৃষ্টি কম হোক আর বেশি হোক মোল্লার এক কন্যা অন্তত ভাল অবস্থাতে থাকত। অবশ্য বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক পরিবারই মোল্লার চেয়েও অনেক বেশি চালাক। এ ধরনের পরিবার এক ছেলেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলে ভর্তি করে আর অন্য ছেলেদের বিরোধী দলের সমর্থক করে রাখে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও কোন না কোন ছেলে ক্ষমতাসীন থেকে যায়।

মোল্লা বৈচিত্র্যায়নে এত গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি এ তত্ত্ব পরকালের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। ইদ্রিস শাহ্ তাঁর "The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasruddin" গ্রন্থে নিম্নরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন[৪]:

> A theologian was ill. He had heard that Nasruddin was a mystic, and in his semidelirium convinced himself that there might be something in all this, after all. So he sent for The Mulla.

"Prescribe a prayer which can ease me into the other world, Mulla", he said, "for you have a reputation of being in communication with another dimension."

"Delighted", said Nasruddin, "Here you are : God help me, Devil help me!"

Forgetting his infirmity the divine sat bolt upright, scandalized.

"Mulla, you must be insane!"

"Not at all, my dear fellow, a man in your position cannot afford to take chances. Where he sees two alternatives, he should try to provide for either of them working out."

[একজন ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অসুস্থ ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে নস্‌রুদ্দীন একজন মরমি সাধক। অর্ধচেতন অবস্থায় তাঁর কাছে মনে হল এ খবর হয়ত সত্যি। তিনি মোল্লাকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি বললেন, "হে মোল্লা, আপনার সুনাম রয়েছে যে অন্য জগতের সাথে আপনার যোগাযোগ রয়েছে। আপনি আমাকে এমন একটি মন্ত্র দিন যাতে আমি বিনা যন্ত্রণায় অন্য জগতে যেতে পারি।"

নস্‌রুদ্দীন বললেন, "এতো খুশির সাথেই করব। এই হল আপনার মন্ত্র : বিধাতা আমাকে সাহায্য কর, অসুর আমাকে মদদ্ দাও।"

স্তম্ভিত হয়ে লোকটি তাঁর অসুখের কথা ভুলে গিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়লেন। তিনি বললেন, "মোল্লা নিশ্চয়ই আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।"

মোল্লা জবাব দিলেন, "প্রিয় বন্ধু, আপনার কথা মোটেও সত্য নয়। আপনার যা অবস্থা, আপনি ঝুঁকি নিতে পারেন না। যখন দুটি বিকল্প রয়েছে, তখন দুটি বিকল্পের জন্যই বন্দোবস্ত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।"

স্পষ্টতই মোল্লা এখানে ঝুঁকি বৈচিত্র্যায়নের পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে মোল্লা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। পার্থিব বৈচিত্র্যায়ন তত্ত্ব পরকালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব নয়। যারা ধার্মিক তাদের কাছে পরকালে কোন বিকল্প নেই। কাজেই একই সাথে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। অবশ্য মোল্লা নিজে পরকাল সম্পর্কেও খুব নিশ্চিত ছিলেন না। মোল্লা মরার আগে নাকি ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে, মরার পর তাঁকে নতুন কবরে সমাহিত না করে পুরাতন কবরে যেন তাঁর লাশ রাখা হয়। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর এই অদ্ভুত অনুরোধের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, পুরানো কবরে ফেরেশতারা আসলে বলে দেওয়া সম্ভব হবে যে, কবরে সমাহিত ব্যক্তির ইতোমধ্যে সাজা হয়ে গেছে। কাজেই ফেরেশতারা শাস্তির ব্যবস্থা না করেই চলে যাবে। তাতে অন্তত কেয়ামত পর্যন্ত তিনি শাস্তির হাত থেকে বাঁচবেন।

তবে মোল্লার ঝুঁকি-বৈচিত্র্যায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ পরকালের জন্য প্রযোজ্য না হলেও ইহকালের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিনিয়োগ, ব্যবসা, বাণিজ্য এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যায়ন ঝুঁকি হ্রাসের একটি কার্যকর উপায়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে,

পরিবেশের জন্যও বৈচিত্র্যায়ন শুধু কল্যাণকরই নয় অত্যন্ত জরুরীও বটে।[৫] সম্প্রতি কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজ চাষ করতে গিয়ে অল্প কয়েকটি জাতের ধান ও গম চাষ হচ্ছে। এ সব বীজের ফলন চিরাচরিত জাতের চেয়ে বেশি সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্প কয়েকটি জাতের বীজের উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রজাতির বীজ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। কাজেই নানাবিধ প্রজাতির বীজের চাষ করলে বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ক্ষতি কম হয়। এক ধরনের উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষ করলে একবার কীট পতঙ্গের উপদ্রব হলে সকল ফসলই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের বীজ চাষ করলে এক ধরনের পোকা সব ধরনের ফসলের ক্ষতি করতে পারে না। বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে সকল পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

সাতশ বছর আগে মোল্লা যখন মারা যান তখন বিশ্ব ব্যাংক অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কথা কেউ কল্পনা করেনি। এমনকি ওয়াশিংটন শহরে–যেখানে প্রতিষ্ঠান দুটির সদর দফতর অবস্থিত–সেখানে কোন শহরই ছিল না, আদৌ কোন বসতি ছিল কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু মোল্লা বিশ্ব ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল না দেখলেও অনেক মহাজন দেখেছেন। মহাজনদের আচরণ জানতে পারলেই এ দুটো প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতি আঁচ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মোল্লার একটি কাহিনী মনে পড়ছে। কথিত আছে মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের একটি হাতি দেখে খুবই পছন্দ হয়। তিনি হাতিটি কেনার অর্থ সংগ্রহের জন্য মহাজনের দোরে গিয়ে হাজির হলেন। মোল্লা মহাজনকে বললেন, "আমাকে কিছু টাকা ধার দিন।" মহাজন বললেন, "কেন?" মোল্লা জবাব দিলেন, "আমি একটি হাতি কিনতে চাই।" মহাজন প্রশ্ন করলেন, "তোমার যদি টাকা না থাকে তুমি হাতি পালবে কি করে?" মোল্লা আক্ষেপ করে বললেন, "আমি আপনার কাছে টাকার জন্য এসেছি, উপদেশের জন্য নয়।"

যে কোন উন্নয়নশীল দেশের অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে মোল্লার আক্ষেপই শোনা যাবে। এইত কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে মস্কো যান। আলোচনার পর সাংবাদিকগণ রাশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিমাকভের কাছে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চান। প্রিমাকভ সাংবাদিকদের জানান যে, তিনি আশা করেছিলেন, মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর ব্রীফ কেস ভর্তি করে ডলার নিয়ে এসেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ব্রীফ কেস ভর্তি করে নিয়ে এসেছেন শর্তের কাগজপত্র। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণের শর্তাবলী স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন। একটু নমনীয় হলেও বিশ্ব ব্যাংকও একই পথের পথিক।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তসমূহকে শর্তনির্ভরশীলতা বা conditionality বলা হয়ে থাকে। শর্তনির্ভরশীলতাই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নসিহত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একজন বিশেষজ্ঞের মতে শর্তনির্ভরশীলতা হল সে সব নীতি যা অনুসরণ

করলে তহবিলের সাহায্য প্রদান করা হয়।[৬] মোল্লার মহাজনের উপদেশ না শোনার অধিকার ছিল, অনুন্নত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরামর্শ না শোনার জো নেই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে অন্য দাতাদের সাহায্যও কমে যায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মনে করে যে, তার নির্ধারিত শর্তাবলী শুধু সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যই প্রযোজ্য নয়, এ সব শর্ত বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য সামগ্রিকভাবে হিতকর। অবশ্য মুদ্রা তহবিলের সমালোচকরা এ মতের সাথে মোটেও একমত নন। তাঁরা বলেন যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সকল দেশের জন্য একই দাওয়াই দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এ দাওয়াই রোগের চেয়ে খারাপ। শর্তাবলীর মধ্যে সাধারণত থাকে সরকারের ব্যয়-হ্রাস, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, কর-সংস্কার, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্য সংস্কার এবং জ্বালানি ও কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি। সামগ্রিকভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সংস্কার অর্থনৈতিক সংকোচনের জন্ম দেয়। অর্থনীতিবিদ্‌রা এ ধরনের ব্যবস্থাকে কল্যাণকর মনে করতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌দের মতে এসব সংস্কার হচ্ছে রাজনৈতিক আত্মহননের শামিল। রাজনীতিবিদ্‌গণ তাই এ ধরনের তেতো ওষুধ গিলতে চান না। এর ফলে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নতুন দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন প্রাক-কর্মসূচী শর্তনির্ভরশীলতা (upfront conditionality)। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে সম্মত কর্মসূচী গ্রহণের আগেই এ ধরনের শর্ত পালন করতে হয়। অবশ্য এ ধরনের শর্তনির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আবিষ্কার করেনি। এ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই মোল্লা সাহেব চিন্তা করে গেছেন। মোল্লা একবার একটি ছোট ছেলেকে একটি পাত্রে কুয়ো থেকে পানি তুলে আনতে বলেন। ছেলেটির হাতে পাত্রটি তুলে তিনি চিৎকার করে বললেন, "খেয়াল রেখো পাত্রটি যাতে কোন মতেই না ভাঙে" এবং তার পরেই ছেলেটিকে থাপ্পড় মারলেন। ঘটনার সময় অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোল্লার কাছে জানতে চাইলেন যে, মোল্লা কেন বিনা কারণে ছেলেটিকে আঘাত করলেন। মোল্লা বললেন, "আহাম্মক, তুমি বুঝতে পারছ না, পাত্রটি ভাঙ্গার পর ছেলেটিকে শাস্তি দিয়ে কোন লাভ হবে না। কাজেই আগে শাস্তি দিলাম।" মোল্লার মত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পাত্র ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নয়, তারা আগেই স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে থাপ্পড় মারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালার সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলো কখনও একাত্ম হতে পারে না। এরা ভালো উপদেশ দিলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্দেহ করে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কখনও এ কথা স্বীকার করে না যে তারা মহাজন। কিন্তু মোল্লা মহাজনদের যে সব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার সবই রয়েছে এ সব প্রতিষ্ঠানের। তাই এ সব প্রতিষ্ঠান দেখলে তিনি হয়ত মোটেও অবাক হতেন না। মাংস চুরি হওয়ার পর মোল্লা তাঁর স্ত্রীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন হয়ত আজ বেঁচে থাকলে একই

ধরনের প্রশ্ন তিনি করতেন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে। মোল্লার মাংস চুরির গল্পটি হচ্ছে নিম্নরূপ :

> বাজারে গিয়ে মোল্লা খুব ভালো মাংস পেয়ে খুশি হয়ে এক সের মাংস নিয়ে বাড়িতে আসেন। এসেই স্ত্রীকে মাংসটা ভালো করে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। মোল্লার স্ত্রী মাংস রান্না করলেন। কিন্তু রান্না করা মাংস চেখে তাঁর এত ভাল লাগল যে তিনি নিজেই পুরো মাংসটা খেয়ে ফেললেন। মোল্লা খেতে এসে যখন মাংস চাইলেন তখন তার স্ত্রী বললেন যে, মাংস বিড়ালে খেয়ে ফেলেছে। মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, "বিড়াল কি পুরো মাংসই খেয়েছে?" মোল্লার স্ত্রী বললেন যে, পুরো মাংসই বিড়ালে খেয়ে ফেলেছে। বিড়ালটা কাছেই ছিল। নস্‌রুদ্দীন সেটাকে দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে দেখলেন যে বিড়ালটির ওজন ঠিক এক সের। "এটাই যদি সেই বিড়াল হয়", মোল্লা বললেন, "তাহলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তাহলে বিড়াল কোথায়?"

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়নের নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে তা যদি মোল্লা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি হয়ত তৃতীয় বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বলতেন, "এই যদি উন্নয়ন হয়, তবে বিনিয়োগকৃত অর্থ কোথায়, আর এই যদি বিনিয়োগ হয়, তবে উন্নয়ন গেল কোথায় ?"

আজকের অর্থনীতিবিদ্‌দের অনেকেই মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের গাল-গল্পকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে মানতে চাইবেন না। পক্ষান্তরে মোল্লা যদি আজকে জীবিত থাকতেন তিনিও হয়ত পেশাদারদের গাণিতিক অর্থনীতিকে বাস্তব হিসাবে স্বীকার করতেন না। তিনিও হয়ত গণিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডি (G. H. Hardy)-এর সাথে সুর মিলিয়ে বলতেন, "A mathematician is someone who does not know what he is talking about and does not care." (একজন গণিতজ্ঞ হচ্ছেন সে ধরনের ব্যক্তি যিনি কি সম্পর্কে বলছেন তা জানেন না ও তার পরোয়াও করেন না)।[৭] গণিতজ্ঞের কাজ হচ্ছে সঠিকভাবে অঙ্ক করা, ফলাফল নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। গণিতজ্ঞের কোন লক্ষ্য নেই, কোন দায়দায়িত্ব নেই, পদ্ধতি সঠিক হলেই তিনি সন্তুষ্ট। যে সব অর্থনীতিবিদ্ গণিতের ভিত্তিতে তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তুলছেন তাঁদের অনেকেই গণিতজ্ঞদের ত্রুটিতে সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁদের গণিত নির্ভুল হতে পারে; কিন্তু তাঁদের তত্ত্ব সঠিক নয়।

আজকের আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক অর্থনীতিবিদ্ই মনে করেন যে, একমাত্র তাঁদের পেশাদারী জ্ঞান প্রয়োগ করলেই উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। অবশ্য তাঁরা ভুলে যান যে, টাইটানিক জাহাজ সে সময়ের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা নির্মাণ করেছে এবং প্রথম সমুদ্র যাত্রাতেই জাহাজটি ডুবে যায়। আর হজরত নূহ (আঃ)-এর কিস্তি তৈরি করেছিল আনাড়িরা; নূহের কিস্তি কিন্তু শত ঝড় ঝঞ্ঝাতেও ডোবেনি। সেনাপতিদের সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ যে শুধু সেনানায়কদের কাছে যুদ্ধ সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। অর্থনৈতিক সমস্যাও এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা শুধু পেশাদার অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে ছেড়ে রাখা সম্ভব

নয়। মোল্লা নসরুদ্দীনের মত চিন্তাবিদ্‌দের আজকের দিনেও তাই আমাদের প্রয়োজন রয়েছে।

## তথ্যসূত্র


১. সৈয়দ মুজতবা আলী, *চতুরঙ্গ* (ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৮৯), পৃষ্ঠা ২৮

২. Peter, Lawrence J., *Peter's Quotations* (New York : Quill, 1977), p. 437

৩. Bernstein, Peter L., *Against the Gods* : The Remarkable Story of Risk (New York : John Wiley and Sons, 1996)

৪. Shah, Idries, *The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasruddin* (New York : E. P. Datton & Co, 1968), p. 91

৫. Bright, Chris, *Life Out of Bounds* (New York : W. W. Norton & Company, 1998)

৬. Guitian, Manuel, *Fund Conditionaity* (Washington : IMF, 1986)

৭. উদ্ধৃত Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science* (New York : Routledge, 1993), p. 39

# বাঁচা-মরার অর্থনীতি

এমন এক দিন ছিল যখন লোকে বিশ্বাস করত যে অসুখ সারান বিধাতা আর তার জন্য ফি গোনেন ডাক্তার। আঠারো শতকে ভল্টেয়ার লিখেছেন, "The art of medicine consists of amusing the patient, while nature cures the disease." (চিকিৎসা শাস্ত্রের কাজ হলো রোগীর মনোরঞ্জন, পক্ষান্তরে রোগ নিরাময় করে প্রকৃতি।)। গত দু'শ বছরে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। আজকের ডাক্তার শুধু রোগীর মনোরঞ্জনই করেন না, তিনি বিগত দিনের প্রতিকারহীন রোগও ভাল করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবনীয় অগ্রগতির সাথে সাথে ডাক্তারদের ফি-এর সৃষ্টিছাড়া বৃদ্ধি ঘটেছে। ডাক্তারদের ফি যত স্ফীত হচ্ছে, ডাক্তারদের নিয়ে জনগণের ক্রোধও ততই বাড়ছে। আমেরিকানরা বলেন যে, আজকের ডাক্তাররা সবাই বিশেষজ্ঞ হতে চান, তবে তাঁদের অনেকেরই আগ্রহ চিকিৎসা সম্পর্কে ততটা নয় যতটা ব্যাংক আর শেয়ার বাজার নিয়ে। রোগীরা ঠাট্টা করে বলেন, "অপারেশনের সময় বুঝতে পারিনি কেন সার্জেন অস্ত্র ধরার আগে মুখোশ পরেন, তবে বিলটি পাওয়ার পর বুঝলাম যে মুখোশ পরাটাই ছিল তাঁর জন্য স্বাভাবিক।" আবার কেউ কেউ বলেন, "অপারেশন থিয়েটারের পাশে রোগীর আরোগ্যের জন্য কক্ষ রাখাই যথেষ্ট নয়, হাসপাতালের ক্যাশিয়ারের অফিসের পাশেও অনুরূপ কক্ষ থাকা উচিত।" অভিযোগ করা হয় যে, মেডিক্যাল বিল শোধ করতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ রোগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে শুধু স্বাস্থ্য খাতে খরচ হয় প্রায় ৯৮২ বিলিয়ন ডলার। এই অংক ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদের প্রায় ৩১.৭ গুণ বেশি। তবে স্বাস্থ্য খাতে দুটি দেশের মাথাপিছু ব্যয়ের বৈষম্য আরো নাটকীয়। ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৩৫৮৮ ডলার, একই সময়ে বাংলাদেশে এই ব্যয় ছিল ৭ ডলার। স্বাস্থ্য খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ব্যয় বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৫০০ গুণ বেশি। গত ত্রিশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ব্যয় হুহু করে বাড়ছে। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থূল জাতীয় উৎপাদের ৫.৩ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে স্বাস্থ্য

খাতে। একত্রিশ বছর পরে ১৯৯১ সালে এই অনুপাত ১৩.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জাতীয় উৎপাদের ২ শতাংশ কৃষি খাত থেকে আসে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষকরা যা উৎপাদন করে তার প্রায় ৬.৫ গুণ বেশি মূল্য সংযাজন হয় স্বাস্থ্য খাতে। এ প্রবণতা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রাক্‌কলন অনুসারে শিল্পায়িত দেশসমূহে ১৯৬০ সালে স্বাস্থ্য খাতে স্থূল জাতীয় উৎপাদের ৪.৫ শতাংশ ব্যয়িত হয়; ১৯৯১ সালে এই হিস্‌সা ৯.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সালে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এই হিস্‌সা ছিল ০.৬ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে এই অনুপাত ১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান (Paul Krugman) লিখেছেন, "স্বাস্থ্য পরিচর্যা মার্কিন অর্থনীতিকে জ্যান্ত গিলে ফেলছে।"[১] বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির এ প্রবণতা অদূর ভবিষ্যতে মোটেও পরিবর্তিত হবে না বরং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়েই চলবে। এর একটি কারণ হল গড় আয়ুর প্রত্যাশা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ১৯৫০ সালে বিশ্বে গড় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিল ৪০। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ৫৯-এ উন্নীত হয়েছে। গত চল্লিশ বৎসরে গড় আয়ুর প্রত্যাশা বেড়েছে ১৯ বছর। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, দু'হাজার বছর আগে কৃষিপ্রধান সমাজে গড় আয়ুর প্রত্যাশা ছিল ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। গত দু'হাজার বছরে গড় আয়ুর প্রত্যাশা খুব বেশি হলে ২০ বছর এবং কমপক্ষে পাঁচ বৎসর বেড়েছে। অর্থাৎ গত ৪০ বছরে গড় আয়ুর প্রত্যাশা যতটুকু বেড়েছে ততটুকু বাড়তে এর আগে প্রায় দু'হাজার বছর লেগেছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বাড়ছে শিশু ও তরুণদের সংখ্যা, আর উন্নত দেশসমূহে বুড়োদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশের বয়স ছিল পঁয়ষট্টির বেশি। অথচ আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের বুড়োদের সংখ্যা ১৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। তাদের অসুখ-বিসুখ বেশি হয়। তাই তাদের স্বাস্থ্য সেবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বুড়োদের চিকিৎসা খরচের যোগান দিতে হচ্ছে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে। অথচ জনসংখ্যা না বাড়াতে কর্মক্ষম করদাতাদের সংখ্যা কমে আসছে। কাজেই স্বাস্থ্য খাতের অর্থায়ন আগামী দিনের রাজনীতির সবচেয়ে জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি অবশ্যই সবার জন্য স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেনি। বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত গড় আয়ুর কোন সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। ১৯৯০ সালের একটি সমীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে যে, সৌদি আরবে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় হল ৩২২ মার্কিন ডলার, অথচ জন্মের সময় প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৬৪ বছর। চীনে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৩.৫ মার্কিন ডলার (সৌদি আরবে মাথাপিছু অনুরূপ ব্যয়ের

মাত্র ৯২ ভাগের এক ভাগ), অথচ প্রত্যাশিত গড় আয়ু সৌদি আরবের চেয়ে পাঁচ বছর (৬৯ বছর) বেশি। শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ কোরিয়ার গড় প্রত্যাশিত আয়ু সমান (৭২ বছর), স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় শ্রীলঙ্কায় ১৮ ডলার আর দক্ষিণ কোরিয়াতে ৩৭৭ ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর যুক্তরাজ্যে প্রত্যাশিত গড় আয়ু হলো ৭৬ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় যুক্তরাজ্যের অনুরূপ ব্যয়ের আড়াই গুণেরও বেশি। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২৬.৭ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৩.৭ কোটি লোকের স্বাস্থ্য বীমা নেই।

একবিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্য খাতে চ্যালেঞ্জ হলো দুটো। প্রথমত, চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের জনসংখ্যার সিংহভাগ ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। আজকের বিশ্বের হতদরিদ্রদের অবস্থা কবি কোলরিজের অভিশপ্ত নাবিকের মত। কোলরিজের কবিতার নাবিক চারধারে সমুদ্রের জল থাকা সত্ত্বেও এক ফোঁটা পানীয় জল পায়নি। চিকিৎসার প্রাচুর্য সত্ত্বেও আজকের হতদরিদ্ররা চিকিৎসার সুযোগই পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, যেখানে জনগোষ্ঠী চিকিৎসার যথাযথ সুযোগ পাচ্ছে সেখানে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। এ ধরনের অপচয়ের জন্য অর্থ সংস্থান সব চেয়ে সচ্ছল রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে রোগের চিকিৎসার চেয়েও অপচয়ের দাওয়াই অনেক বেশি কঠিন। চিকিৎসা খাতে সংস্কার তাই রাতারাতি সম্ভব হবে না। এ খাতে কোন বড় পরিবর্তন করতে হলে তিনটি পক্ষকে একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এ তিনটি পক্ষ হলো : রোগী, রাষ্ট্র ও ডাক্তার। কিন্তু এদের স্বার্থ ও বাধ্যবাধকতা ভিন্ন। এদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলা তাই সহজ নয়।

রোগ নিয়ে আসে যন্ত্রণা, অসুবিধা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কালো ছায়া। সবাই রোগের উপশম চায়। কিন্তু সাধ থাকলেও সবার সাধ্য নেই। আর্থিক দিক থেকে দু' ধরনের রোগী রয়েছে। এক ধরনের রোগীরা চিকিৎসা ব্যয় নিজেরা বহন করে, আরেক ধরনের রোগীদের সকল চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য বীমা। যাঁরা নিজেদের ব্যয়ে চিকিৎসা করেন তাঁরা চিকিৎসার আগে ব্যয় ও লাভের অনুপাত নির্ণয় করেন। জীবননাশক ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি না হলে এ ধরনের রোগীরা চিকিৎসার ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে যাঁদের পূর্ণ স্বাস্থ্য-বীমা রয়েছে তাঁরা চিকিৎসার জন্য খরচের তোয়াক্কা করেন না। তার ফলে অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য অর্থের অপচয় হয়। অর্থনীতির বুলিতে স্বাস্থ্য-বীমা নৈতিক ঝুঁকির (moral hazard) সৃষ্টি করে।[২] বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়াতে বীমাকৃত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যের যথেষ্ট যত্ন নেন না। উপরন্তু প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে বীমার অর্থ ব্যয় করেন। এর ফলে বীমার ব্যয় বেড়ে যায়। তাই ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ শুধু মাত্র বিত্তবানদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে এবং বীমার সুযোগ অসচ্ছল ব্যক্তিদের নাগালের বাইরে চলে যায়। ধনীদের অপচয়ের ফলে গরীবদের চিকিৎসার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাসের জন্য দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বীমা বহন করলে সুবিধাভোগীদের মধ্যে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হবে না। যদি চিকিৎসার আংশিক

ব্যয় রোগীদের বহন করতে হয় তবে বীমার সুযোগ ব্যবহারের আগে রোগীরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংস্কারের ফলে বীমার ব্যয় কমে যায়। দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে ও উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার বীমার ব্যয় হ্রাস করতে পারে।

নির্দেশ অর্থনীতির (command economy) দ্রবীভবনের প্রেক্ষিতে প্রায় সকল দেশেই অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সরকারের আয়তন ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ভূমিকার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। শিল্পোন্নত দেশসমূহে স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশ আসে সরকারী খাত থেকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয়ের হিস্‌সা হলো প্রায় ৫০ শতাংশ। তিনটি কারণে সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য খাতকে পুরোপুরি বাজারের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, বেসরকারী খাতের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কতিপয় স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ সম্ভব হবে না। ছোঁয়াচে রোগ বন্ধ করতে হলে যারা পয়সা দিয়ে টীকা দিতে পারবে টীকার সুযোগ শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই তাদের জন্যও টীকার ব্যবস্থা করতে হবে। তেমনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিও সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ সকল সেবা জনস্বাস্থ্য সেবা নামে পরিচিত। এসব সেবা ব্যক্তিগত পণ্য নয়, গণপণ্য (public goods)। এসব সেবার প্রভাব শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এদের প্রভাব পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তাই জনস্বাস্থ্য খাত সরকারের কাছ থেকে বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র জনগণের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু নৈতিক কারণেই নয় অর্থনৈতিক দিক থেকেও এ ধরনের ব্যবস্থার যুক্তি রয়েছে। অসুস্থ গরীবরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না, অথচ অসুখ না সারলে তাদের পক্ষে কাজ করাও সম্ভব নয়। এ ধরনের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করলে এদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে; ফলে এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং সরকারের উপর এদের নির্ভরশীলতা কমে যাবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য সেবার কোন কোন খাতে বাজার কাজ করে না। বাজারকে সঠিকভাবে কাজ করতে হলে বাজারের কুশীলবদের রোগীদের সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে হবে। নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে রোগীরা যত জানে, বাজার তত জানে না। তাই বাজারের পক্ষে স্বাস্থ্য সেবার প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উপরন্তু প্রতিটি শহরে বা গ্রামে অনেকগুলি হাসপাতাল ও অনেক বিশেষজ্ঞ রাখা সম্ভব নয়। কাজেই এদের ব্যবসা হয় একচেটিয়া ধরনের। এরা যাতে ভোক্তাদের প্রতারণা না করতে পারে তার জন্য স্বাস্থ্যসেবার খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সীমিত সম্পদ নিয়ে সরকারের পক্ষে সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। ব্যয়ের কার্যকারিতার ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। যেখানে ব্যয়ের কার্যকারিতা কম সেখানে ব্যয় হ্রাস করতে

হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জটিল। স্বাস্থ্য খাতে শুধু অর্থ নয়, মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। এখানে শুধু যুক্তি নয় আবেগও কাজ করে। মানুষের জীবনের মূল্য অর্থনীতিবিদের লাভ-লোকসানের পাটীগণিত দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে অর্থ সাশ্রয় করতে গিয়ে কোন রোগীর মৃত্যু ঘটলে তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হ্রাস সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন চিকিৎসকদের সহযোগিতা। এ ধরনের সহযোগিতা পাওয়া অত্যন্ত শক্ত। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন যে, চিকিৎসা খাতের সবচেয়ে বড় রোগ হলো ডাক্তারদের একচেটিয়া ব্যবসা।[৩] সকল দেশেই ডাক্তারদের নিজস্ব সমিতি ডাক্তারি করার অনুমতি দিয়ে থাকে। এ ধরনের সমিতিরা চায় না যে, ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ুক এবং ডাক্তাররা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোক। তাই তারা ডাক্তারদের নিবন্ধন সীমিত করে রাখে। ডাক্তারগণ অবশ্য বলেন যে, ডাক্তারদের সেবার মান নিশ্চিত করা তাঁদের দায়িত্ব। প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতে হলে পেশাগত মান নেমে যাবে। এর ফলে সমাজের অনিষ্ট হবে। মিল্টন ফ্রিডম্যান অবশ্য এ যুক্তি মানেন না। তিনি মনে করেন যে, ডাক্তাররা সামাজিক ক্ষতির অহেতুক ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ক্রুগম্যানের বক্তব্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তিনি যথার্থই লিখেছেন, "The essential health care problem seems to be one not so much of market structure as of morality" (স্বাস্থ্যসেবার মূল সমস্যা বাজারের কাঠামো বলে মনে হয় না, মূল সমস্যা হল নৈতিক)[৪]।

ডাক্তারদের নৈতিক সমস্যার উৎস দুটি। প্রথমত, ডাক্তারদের সিদ্ধান্তের সাথে রোগীদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত আর কেউ অন্যদের সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তাঁদের অনেক ভুল কোন দিনই সংশোধন করা সম্ভব নয়। কাজেই অর্থাভাবে রোগীদের কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে ডাক্তারগণ নৈতিক দিক থেকে সাহস পান না। দ্বিতীয়ত, ডাক্তারি পেশার একটি অন্তর্নিহিত সমস্যা রয়েছে। সকল স্বাধীন পেশাতেই স্বার্থের সংঘাতকে (conflict of interest) গর্হিত গণ্য করা হয়। যে বিষয়ে পেশাদারদের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে সে বিষয়ে তাঁরা কোন পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ডাক্তারদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না। ডাক্তাররা রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ ধরনের পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করে সেই ডাক্তার নিজেই অর্থ কামাই করেন। রোগীর ব্যয় বাড়লে ডাক্তারের আয় বাড়ে। কাজেই রোগীর স্বার্থে, না নিজের স্বার্থে ডাক্তাররা ব্যয়বহুল চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে থাকেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। ডাক্তারদের নৈতিক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। এ বিতর্ক চলছে কয়েক হাজার বছর ধরে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ডাক্তারদের নৈতিক ভূমিকা নিয়ে তিনটি মতবাদ দেখা যায়।

একটি মতবাদ বিশ্বাস করে যে ডাক্তারের দায়িত্ব হলো চুক্তিভিত্তিক। প্রতিটি ডাক্তার তাঁর রোগীকে সম্ভবশ্রেষ্ঠ সেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। যদি তিনি সম্ভবশ্রেষ্ঠ সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তবে রোগীর কাছে তিনি দায়ী থাকবেন। এই মতবাদের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে প্রায় চার হাজার বছর আগে রচিত হামুরাবির (২১২৩-২০৮১ খৃষ্টপূর্ব) সংহিতায়।[৫] হামুরাবি ছিলেন ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের অধিনায়ক। হামুরাবির বিধান হল, কোন ডাক্তার যদি রোগীর চিকিৎসা ঠিকমত না করেন তবে ঐ ডাক্তারকে রোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাক্তার যদি রোগীর ক্ষতিপূরণ না করেন তবে তাঁর আঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে। আজকের দুনিয়াতে অমনোযোগী ডাক্তারদের আঙ্গুল কাটা হয় না। তবে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।

আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকাংশে হামুরাবির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। ডাক্তারদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ব্যবহারজীবীর পেশা ও নেশা। যুক্তরাষ্ট্রে ঠাট্টা করে বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিটি মহৎ ব্যক্তির পেছনেই থাকে তার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা আর প্রত্যেক ভাল ডাক্তারের পেছনেই রয়েছে উকিলদের তাড়া। উকিলদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডাক্তাররা কর্তব্যে অবহেলা বীমার (malpractice insurance) দ্বারস্থ হন। কিন্তু যে ডাক্তারের বিরুদ্ধে যত বেশি বীমার দাবি আসে তাঁকে তত বেশি বীমার কিস্তি দিতে হয়। এর ফলে ডাক্তারদের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় আইনের ঝামেলা সামলাতে। ডাক্তাররা তাই উকিলদের ঘৃণা করেন। উকিলরা বলেন কর্তব্যে অবহেলাকারী ডাক্তাররা নিষ্ঠুর আর ডাক্তাররা বলেন উকিলরা হল হৃদয়হীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উকিলদের সম্পর্কে ডাক্তারদের একটি প্রিয় ঠাট্টার নমুনা দিচ্ছি। একজন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীর হৃৎপিণ্ড সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। রোগীকে জানানো হয় যে, হৃৎপিণ্ড সংযোজনের দু'জন সম্ভাব্য দাতা রয়েছে। একজন সম্ভাব্য দাতা হলেন পঁচিশ বছরের খেলোয়াড়। আরেক জন হলেন প্রবীণ উকিল। রোগীকে বলা হল, এ দুজনের মধ্যে যে কোন একজনের হৃৎপিণ্ড তিনি গ্রহণ করতে পারেন। ডাক্তাররা আশা করছিলেন যে, রোগী পঁচিশ বছরের খেলোয়াড়ের হৃৎপিণ্ড পছন্দ করবে। কিন্তু রোগী ষাট বছরের উকিলের হৃৎপিণ্ড সংযোজন করতে চায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে, উকিলদের হৃদয় কখনও ব্যবহৃত হয় না, আর তাই ষাট বছরের উকিলের হৃদয় সম্পূর্ণ অব্যবহৃত ও আনকোরা হবে। বুড়ো উকিলের হৃদয়ই তার পছন্দ।

ডাক্তাররা উকিলদের সম্পর্কে যাই বলুন না কেন, উকিলরা ডাক্তারদের সামান্য ত্রুটি খুঁজে পেলেও তাঁদের ছাড়েন না। উকিলরা যত মামলা জিতছে তত কর্তব্যে অবহেলা বীমার (malpractice insurance) খরচ বাড়ছে। ডাক্তারগণ অবশ্য নিজেরা এ খরচ বহন করেন না। তাঁরা এ খরচ রোগীদের কাছ থেকে আদায় করেন। এর ফলে স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় বেড়েই চলছে। ডাক্তাররাও মানুষ, তাদের কর্তব্যে অবহেলা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে সরল বিশ্বাসে কর্তব্যে অবহেলা হয় সেখানে ডাক্তারদের

আইনগতভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এ অধিকার অস্বীকার করলে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে না, শুধু স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় বাড়বে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই বিশ্বাস করা হয় যে, ডাক্তারদের সেবার মান মামলা মোকদ্দমা করে বাড়ানো যাবে না। আদালতের পক্ষে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। ডাক্তারদের কার্যকর তত্ত্বাবধান করতে হবে সমগোত্রীয়দের (peer group)। এই মতবাদের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে হিপোক্রেটিসের (Hippocrates) শপথে।

হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৫৯/৩২৭ খৃষ্টপূর্ব) ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক। তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক গণ্য করা হয়ে থাকে। এশিয়ার উপকূলের অদূরে অবস্থিত কোস দ্বীপে তাঁর জন্ম। বিভিন্ন দেশ সফর করে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে তিনি জন্মস্থানে ফিরে এসে দক্ষিণার বিনিময়ে শিষ্যদের চিকিৎসা শাস্ত্র শেখান। গ্রীক জগতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র, রোগী ও চিকিৎসকরা তাঁর কাছে ভিড় জমায়। কারো কারো মতে তিনি ১৩৩ বছর বাঁচেন, আবার কেউ কেউ বলেন তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল নিরানব্বই। তাঁর দীর্ঘ জীবন কালে তিনি অসংখ্য শিষ্যকে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, ডাক্তারের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেছে এবং তাঁদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই অবস্থাতে হিপোক্রেটিসের শিষ্যরা একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁরা এই আচরণবিধির নামকরণ করেন হিপোক্রেটিসের শপথ। যাঁরা ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন তাঁদের এ ধরনের শপথ নিতে হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর ছাত্ররা আজও এ ধরনের শপথ নিয়ে থাকে। শপথটি নিম্নরূপ[৬]:

> চিকিৎসার দেবতা এ্যাপোলোর নামে, দেবতা এসক্লপিয়াস (Asclepius), দেবতা হেজিই (Hygiaea), দেবতা পেনাসিয়া (Panacea) এবং সকল দেব ও দেবীর নামে এবং তাঁদের সাক্ষী করে আমি শপথ নিচ্ছি যে আমি এই শপথ ও এই অঙ্গীকার আমার সকল সামর্থ্য ও আমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে বাস্তবায়ন করব। আমি আমার গুরুকে মাতা পিতার মত সম্মান করব, তাঁকে আমার জীবিকার অংশীদার হিসাবে গণ্য করব, যখন তাঁর প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তাঁকে আমার আয়ের অংশ প্রদান করব, তাঁর পরিবারের সদস্যদের আমার নিজের ভাই গণ্য করব, যদি তাঁর পরিবারের সদস্যরা চান তবে তাঁদের দক্ষিণা অথবা কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আমি চিকিৎসা শাস্ত্র শিখাব। আমার ছেলেদের, আমার শিক্ষকের ছেলেদের এবং চিকিৎসকের শপথ ও দায়িত্ব যে সব চিকিৎসক গ্রহণ করেছেন তাঁদের চিকিৎসার নীতিমালা সম্পর্কে মৌখিক শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রদান করব এবং অন্য কাউকে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াব না। আমার সাধ্য ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করে আমি রোগীদের সাহায্য করব, কিন্তু কখনও কাউকে জখম করব না অথবা কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করব না। কেউ চাইলেই তাঁকে বিষ খাওয়াব না অথবা এই ধরনের চিকিৎসার পরামর্শ দেব না। অনুরূপভাবে গর্ভপাত করার জন্য কোন নারীকে যন্ত্র (pessary) দিয়ে সহায়তা করব

না। আমি আমার জীবন এবং আমার পেশাকে নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র রাখব। আমি নিজে ছুরি ব্যবহার করব না, এমনকি পাথুরে রোগীদের ক্ষেত্রেও নয়; এ ধরনের চিকিৎসা আমি এ বিষয়ে যোগ্য কারিগরদের কাছে ছেড়ে দেব। যে গৃহেই আমি প্রবেশ করি না কেন আমি শুধু অসুস্থদের সহায়তা করতে প্রবেশ করব এবং আমি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা অপকার করা থেকে বিশেষ করে স্বাধীন ও দাস শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের দেহের অমর্যাদা থেকে বিরত থাকব। আমার পেশাগত কাজে যা দেখি না বা শুনি না কেন এবং পেশার বাইরেও লোকজনের সাথে আলোচনা থেকে জানি না কেন তা বাইরে প্রকাশিত হতে দেব না, এ ধরনের তথ্য আমি কখনও ফাঁস করব না এবং সব সময় এদের পবিত্র গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করব। আমি যদি এই শপথ পালন করি ও ভঙ্গ না করি তবে যেন আমি আমার জীবন ও আমার পেশার জন্য সুনাম বয়ে আনি। যদি এ শপথ ভঙ্গ করি অথবা অস্বীকার করি তবে এর উল্টোটা যেন আমার জীবনে ঘটে।

অর্থনীতিবিদ্ মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতে এ দীর্ঘ শপথে যেমন ধনাত্মক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে ঋণাত্মক উপাদান।[৭] হিপোক্রেটিসের শপথে ডাক্তারদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই শপথেই রয়েছে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে চিকিৎসকের পেশা সীমিত রাখার অঙ্গীকার। চিকিৎসকদের ট্রেড ইউনিয়নের বীজ এই শপথেই নিহিত রয়েছে। চিকিৎসকদের ফি নির্ধারণ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত হিপোক্রেটিসের শপথে নেই। তবে হিপোক্রোটিস এ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, যে সব রোগীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে তাদের কাছ থেকে বেশি ফি আদায় করতে হবে। তবে কারো যদি সামর্থ্য না থাকে তবে তাকে মাগনা চিকিৎসা করা সঙ্গত হবে। হিপোক্রেটিস বলতেন, "For where there is love of man, there is also love of the art."[৮] (যেখানে মানুষের জন্য ভালবাসা রয়েছে সেখানে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি ভালবাসাও প্রতিফলিত হয়।)

হিপোক্রেটিসের শপথের ভিত্তিতে সমগোত্রীয় চিকিৎসকদের একে অপরের খবরদারি করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগোত্রীয় ডাক্তারগণ তাঁদের সহকর্মীদের ভুল ত্রুটি ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। কাজেই আইনগত ব্যবস্থা ছাড়া কার্যকরভাবে হিপোক্রেটিসের শপথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অন্যদিকে আইনগত ব্যবস্থা ব্যাপক হারে গৃহীত হলে চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যায়।

আইনগত ব্যবস্থা বা সমগোত্রীয়দের তদারকি ডাক্তারদের নৈতিক দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রতিটি ডাক্তারকে নৈতিক দায়িত্ব নিজের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, বাইরে থেকে তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি ডাক্তারেরই মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজের জন্য যা করবেন না রোগীদের দিয়ে তা করানো ঠিক হবে না। এই মতবাদ হলো ডাক্তারের নৈতিকতা সম্পর্কে তৃতীয় পন্থা। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন সহজ নয়। নিজের জীবন থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ

সংবরণ করতে পারছি না। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে সলিমুল্লাহ হল থেকে কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ত্রিশ সদস্যের একটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমিও সে দলের সদস্য ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইনজেকশন সম্পর্কে আমাদের জরুরী ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মেডিক্যাল অফিসার ও পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদ ডাক্তার মর্তুজা। তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ দু'ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম দিন তাত্ত্বিক শিক্ষা আর দ্বিতীয় দিনে ব্যবহারিক শিক্ষা। প্রথম দিনের তাত্ত্বিক ক্লাসে ডক্টর মর্তুজা জানালেন যে, হাতে ইনজেকশন দিতে হলে মানুষের হাতের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তিনি হাতের মাংশপেশি, শিরা উপশিরা ও স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন। তার পর ঠিকভাবে ইনজেকশন না দিতে পারলে কি কি সমস্যা হয় তা আলোচনা করেন। তিনি জানালেন অসাবধানতাবশত স্নায়ুতন্ত্র ও শিরা উপশিরাকে জখম করলে হাত অকেজো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কি কি ভুল করলে ইনজেকশন থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে তাও তিনি বর্ণনা করেন এবং সঠিকভাবে ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন। প্রথম দিনের ক্লাসের শেষে তিনি জানান যে, পরদিন ক্লাসে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী আরেকজন প্রশিক্ষণার্থীকে ইনজেকশন দেবে। আমরা সবাই গ্রামের নিরক্ষর লোকদের ইনজেকশন দেওয়ার জন্য উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আনাড়িদের হাতে ইনজেকশনের কি বিপদ তা জানতাম না। যখন জানলাম তখন আনাড়ি সতীর্থদের কাছে ইনজেকশন নেওয়ার ঝুঁকির ভয়ে শিউরে উঠি। দ্বিতীয় দিনের ক্লাসে ভয়ে আমি যাইনি। আমি মনে করেছিলাম যে, আমার সতীর্থরা আমার চেয়ে সাহসী এবং তাদের অনেকেই হয়ত একে অন্যের হাতে ইনজেকশন দিয়েছে। দু'দিন পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণার্থীর একজনও দ্বিতীয় দিনের ক্লাসে হাজির হয়নি। অন্যের চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা অনেকেই সাহসী। কিন্তু একই মানদণ্ড কি আমরা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারব? আমি পারিনি। আমার মনে হয় অনেক ডাক্তারই আমার মত পালিয়ে যাবেন।

ডাক্তারদের নৈতিক উভয়-সংকটের কোন সহজ সমাধান নেই। দ্রুত কারিগরী পরিবর্তনের ফলে এ সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানের প্রত্যন্ত সীমায় দ্রুত গতিতে ব্যয়বহুল চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। যারা বিত্তবান তারা নতুন নতুন চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে, অথচ যারা বিত্তহীন তাদের অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুঃখ করে বলা হয়ে থাকে যে, নিউইয়র্ক শহরের কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা বাংলাদেশের চেয়ে নিকৃষ্ট। চিকিৎসা খাতে ক্রমেই বৈষম্য বাড়ছে—বৈষম্য বাড়ছে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে, বাড়ছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে। এ বৈষম্য দূর করে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাই হবে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ; শুধু ডাক্তারদের জন্য নয়—অর্থনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্দের জন্যও বটে।

## তথ্যসূত্র

১. Krugman, Paul, *The Age of Diminished Expectations* (Cambridge : MIT Press, 1994), p. 74

২. World Bank, *World Development Report*, 1993 (New Work : Oxford University, 1993), p. 56

৩. Friedman, Milton and Rose, Friedman, *Free to Chose* (New York : HBJ, 1990), p. 56

৪. Krugman, Paul, *প্রাগুক্ত*, p. 83

৫. Durant, Will, *Our Oriental Heritage* (New York : Simon and Schuster, 1963), p. 231

৬. Durant, Will, *The Life of Greece* (New York : Simon and Schuster, 1963), p. 347

৭. Friedman, Milton and Rose, Friedman, *প্রাগুক্ত*, p. 230

৮. Durant, Will, *The Life of Greece*, (New York : Simon and Schuster, 1963), p. 348

# আজি হতে শতবর্ষ পরে : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

প্রেরিত-পুরুষদের যেখানে সারা, সমাজবিজ্ঞানীদের সেখানে শুরু। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মশাসিত সমাজে ভবিষ্যদ্বাণীর একচেটিয়া অধিকার ছিল পয়গম্বরদের। আধুনিক বিশ্বে নবুয়তের নতুন দাবিদাররা কল্কে পাচ্ছেন না। আজকের দিনে তাই ভবিষ্যদ্বাণীর দায়িত্ব বর্তেছে সমাজবিজ্ঞানীদের উপর।

পয়গম্বরদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর কাজটি সহজ ছিল। তাঁদের যুক্তি-তর্কের বালাই ছিল না। তাঁদের কাছে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।" সমাজবিজ্ঞানীদের অবশ্য এ সুবিধে নেই। এদের সকল বক্তব্যই যুক্তি প্রমাণের উপর দাঁড় করাতে হয়। পয়গম্বরদের আরও একটি সুবিধে ছিল; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মমতসমূহের মধ্যে মুক্তির পথ নিয়ে পার্থক্য থাকলেও, মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। এঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের ইতিহাসে ক্রমাবনতি ঘটছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে তিনটি মহান বিশ্বধর্মের জন্ম এদের প্রত্যেকটি বিশ্বাস করে যে, হজরত আদমের স্বর্গ থেকে নির্বাসন হতে শুরু হয়ে মানুষের ইতিহাসে ক্রমেই অবনতি ঘটছে। কখনও কখনও ইতিহাসে স্বর্ণযুগ দেখা দিলেও তা হবে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। অবক্ষয় ও অবনতির মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাস শেষ হবে কেয়ামতে। হিন্দু ধর্মও বিশ্বাস করে কলিযুগের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত ধর্মসমূহের সাথে হিন্দু ধর্মের একটি তফাৎ রয়েছে। হিন্দুরা মনে করে না যে, পৃথিবী ধ্বংসের পরেই ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্ম মতে ধ্বংসের পর পৃথিবী আবার সৃষ্টি হবে এবং অধঃপতনের পথ ধরে আবার ধ্বংস হবে। বার বার একই প্রক্রিয়া চলবে। হিন্দুদের মত গ্রীক দার্শনিকগণও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের উন্নতিও হচ্ছে না; অবনতিও হচ্ছে না, মানুষের ইতিহাস চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

প্রেরিত-পুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী কখন ফলবে তা কেউ জানে না। তাই এ সব ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই বা পরীক্ষা সম্ভব নয়। এদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই সুবিধা হল, ভবিষ্যদ্বাণীর সময়সীমা

পার না হওয়া পর্যন্ত তার সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ জন্য অর্থনীতিবিদ্‌দের সম্পর্কেও বলা হয়ে থাকে, "An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday did not happen today." (অর্থনীতিবিদ্ হচ্ছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি আগামীকাল জানবেন তিনি গতকাল যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আজ তা কেন ঘটেনি।)[১] তবে অর্থনীতিবিদ্‌দের সময়ের দিগন্ত পয়গম্বরদের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। তাই প্রেরিত-পুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও, গত দু'শ বছরে অনেক অর্থনীতিবিদের ভবিষ্যদ্বাণীই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই শতবর্ষ পরে বিশ্ব অর্থনীতিতে কি ঘটবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার আগে ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা গত কয়েক শ'বছর ধরে যে সব চিন্তা ভাবনা করেছেন তার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মহাপ্রলয়ের অশনি সংকেতের অথবা জন্মান্তরের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধকারে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন আশার আলো দেখা যায়নি। তাই প্রগতির ধারণার জন্ম মানুষের চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করে। প্রগতির ধারণা থেকেই আগামী দিন নিয়ে স্বপ্নের শুরু। এ ধারণার সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন একজন অর্থনীতিবিদ[২]:

> The idea of progress is, basically the conception of the present as superior to the past and the belief that the future will be, or can be better still.
>
> (মূলত প্রগতির ধারণা মনে করে যে বর্তমান অতীতের চেয়ে শ্রেয় এবং বিশ্বাস করে যে ভবিষ্যত আরও ভালো হতে পারে এবং হবে।)

এ ধারণার ব্যাপক প্রসার ঘটে সতের শতকে। ঐ সময়ে ফ্রান্সে শুরু হয় প্রাচীন ও আধুনিকের লড়াই। চার্ল পেরো (Charles Perrault) বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন যুগ আধুনিক যুগের চেয়ে শ্রেয়, অর্থাৎ যত সময় যাচ্ছে মানুষের অবস্থার তত অবনতি ঘটছে। প্রগতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক বার্নাড দ্য ফঁতনেল (Bernard de Fontenelle)। তাঁর মতে আধুনিক যুগে মানুষের পার্থিব ও মানসিক অগ্রগতি ঘটছে। বিলাতে এ বিতর্ক "কেতাবের লড়াই" (Battle of the Books) নামে পরিচিত ছিল।

প্রগতির ধারণা কারা জন্ম দিয়েছে এ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। রবার্ট নিসবেট মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির ধারণার জনক। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক কার্ল বেকার বিশ্বাস করেন যে, প্রগতির ধারণার উদ্ভাবক হল ইউরোপে বুদ্ধিবিভাসা (Enlightenment) আন্দোলনের প্রচারকুশলী লেখকগণ।[৩] তাঁরা সবাই পেশাগত দার্শনিক ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক কালে মানুষের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতা উত্তরোত্তর প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। প্রথমদিকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন, তবে পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রগতির সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান।

সমাজবিজ্ঞান ও প্রগতির ধারণার সম্পর্ক প্রসঙ্গে স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন, এরা একে অপরকে প্রভাবিত করেছে; প্রগতির ধারণা কখনও সমাজবিজ্ঞানের কারণ, কখনও বা তার প্রভাব।[৪]

সতের শতকে প্রগতির ধারণাকে উজ্জীবিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিজ্ঞানের সাথে শিল্প সাহিত্যে বা দর্শনের একটি বড় তফাৎ রয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে; শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের সর্বোচ্চ বিকাশ যে কোন সময়ে হতে পারে। তাই প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক অথবা এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার অথবা রেনেসাঁর যুগের চিত্রকর আজকের দার্শনিক, সাহিত্যিক বা শিল্পীদের চেয়ে শ্রেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ প্রথমে আবিষ্কার করেন অত্যন্ত শক্তিধর প্রতিভারা। কিন্তু কালক্রমে এ জ্ঞান অতি সাধারণ লোকরাও আত্মস্থ করতে পারে। তাই আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গড় ছাত্রের বুদ্ধি নিউটনের চেয়ে অনেক কম হলেও, সে নিউটনের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান জানে। বিজ্ঞান সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে[৫]:

> The test of the true science is not whether men of genius has revealed some of nature's mysteries but whether men of lesser talent can learn to use their methods and reveal more.
>
> (প্রকৃত বিজ্ঞানের মাপকাঠি এই নয় যে অলোকসাধারণ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্য প্রকাশ করেছেন কিনা, প্রকৃত মাপকাঠি হল অপেক্ষাকৃত কম চৌকস ব্যক্তিরা প্রতিভাশালীদের পদ্ধতি আয়ত্ত করে আরও নতুন আবিষ্কার করতে পারেন কি না।)

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে সাথে শিল্পবিপ্লব-উত্তর ইউরোপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রগতির ধারণাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। অর্থনীতিবিদরা কিন্তু অতি সহজে প্রগতির ধারণা বরণ করে নেননি। অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছেন। এডাম স্মিথ বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রমিক সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু রিকার্ডো ও মালথুসের মত ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করতেন যে, এ ধরনের উন্নয়ন আদৌ টেকসই হবে না। রিকার্ডোর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হল মুনাফা। মুনাফা বাড়লেই শিল্পপতিরা আরও বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগ বাড়লে শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে, ফলে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাবে। শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে জনসংখ্যা বাড়বে। জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে না। খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে পুঁজিপতিদের পক্ষে মজুরি কমানো সম্ভব হবে না। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে মুনাফা কমে যাবে, সাথে সাথে অর্থনৈতিক জীবনে স্থবিরতা নেমে আসবে।

দীর্ঘ মেয়াদে প্রগতির তত্ত্বের অসারতা সবচেয়ে জোরালোভাবে তুলে ধরেন টমাস রবার্ট ম্যালথুস (১৭৬৬-১৮৩৫)। সচ্ছল পরিবারের সন্তান তিনি; পরবর্তী জীবনে খৃষ্টধর্মের যাজক হয়েছিলেন। পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপনা। কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে তাঁর অধ্যাপনা শুরু আর ভারতীয় প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হাইলিবারি কলেজে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক রূপে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের পরিসমাপ্তি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাজে যোগ দেওয়ার আগেই তিনি তাঁর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। ম্যালথুস তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তাঁর পিতার সাথে তর্ক করার জন্য। ম্যালথুসের বাবা ডেনিয়েল ম্যালথুস ছিলেন একজন প্রগতিবাদী। ইংল্যান্ডে তখন উইলিয়াম গডউইন (Godwin) ও ফ্রান্সে মার্কুই দ্য কঁদরসে (Marquis de Condorcet) প্রচার করছিলেন যে, মানুষের অবস্থা ক্রমে ক্রমে উন্নত হচ্ছে। পিতা ম্যালথুস এসব দার্শনিকদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পুত্র ম্যালথুস মনে করতেন যে, এসব ধারণা ভুল। খাওয়ার টেবিলে পিতা পুত্রের মধ্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায়ই তুমুল বিতর্ক হত। পিতাকে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করার জন্য ১৭৯৮ সালে ৩২ বছর বয়সে রবার্ট ম্যালথুস "An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and other" নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। যতটুকু জানা যায়, পুত্র ম্যালথুস তাঁর পিতার মত পরিবর্তন করাতে পারেননি। কিন্তু গত দু শ বছরে তাঁর বই লাখ লাখ লোকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ম্যালথুস ছিলেন গণিতের ছাত্র। দুটি গাণিতিক অনুপাত নিয়ে তিনি তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেন। ম্যালথুসের দুটি সূত্র হল : (১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হলে জ্যামিতিক হারে বাড়ে; (২) খাদ্য উৎপাদন শুধু গাণিতিক হারে বাড়ে। জ্যামিতিক হার গাণিতিক হারের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ে। তাই খাদ্য উৎপাদন হাঁটি হাঁটি পা পা করে বেড়ে চলেছে, জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কাজেই জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

ম্যালথুস গাণিতিক হার ব্যবহার করলেও, শুধু গণিতের ভিত্তিতে ম্যালথুসের ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিষ্ঠা করার কোন জো নেই। জনসংখ্যা খাদ্যশস্যের চেয়ে দ্রুততর হারে বাড়বে এরূপ কোন অমোঘ প্রাকৃতিক বিধি নেই। ম্যালথুসের ব্যবহৃত দুটি গাণিতিক অনুপাতের পক্ষে কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে এদের উল্টোটাই ঘটা স্বাভাবিক। দু'জন নরনারীর পক্ষে একবারে সাধারণত একটি সন্তান উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু উদ্ভিদ জগতে উৎপাদন অনেক বেশি। একটি গমের দানা হতে বছরে পঞ্চাশ গুণ উৎপাদন হয়। আমরা যদি দশটি গমের গাছ আর পাঁচটি দম্পতি নিয়ে শুরু করি, আর যদি সর্বোচ্চ হারে গম ও জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তবে গমের উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালথুসের প্রস্তাবিত অনুপাত প্রমাণ করতে হলে শুধু অঙ্ক দিয়ে চলবে না, সাথে সাথে একটি পূর্বানুমান (assumption) গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই ঠিকমত পূর্বানুমান গ্রহণ করতে পারলে অনেক মুশকিল আসান সম্ভব। মনে করুন সেই শিক্ষকের কথা

যাঁকে ছাত্র প্রশ্ন করলো, "কপোল বাহিয়া পড়ে নয়নের জল" বাক্যাংশের অর্থ কি। শিক্ষক জবাব দিলেন শব্দটি কপোল নয় কপাল, বইয়ে ভুল ছাপা হয়েছে। ছাত্র জানতে চাইল, চোখের পানি কিভাবে কপাল বেয়ে পড়ে। বিপদে পড়ে শিক্ষক জবাব দিলেন যে, এখানে একটি লাইন বাদ পড়ে গেছে; প্রকৃত বাক্যটি হবে, "কপাল বাহিয়া পড়ে নয়নের জল, দুই ঠ্যাং দিল তুলে কদম্বের ডালে।" অর্থনীতিবিদ্ হলে এ শিক্ষক বলতেন কদম্বের ডালে দু ঠ্যাং তুলে দেওয়াটা হচ্ছে তাঁর পূর্বানুমান। ম্যালথুসও সময় মত কদম্বের ডালে দুই ঠ্যাং তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বানুমান হল জমির পরিমাণ সীমিত। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, সীমিত জমি হতে অসীম ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়।

অর্থনীতিতে ম্যালথুসের সবচেয়ে বড় অবদান তাই জ্যামিতিক ও গাণিতিক অনুপাতের ব্যবহার নয়, তাঁর অমর কীর্তি হল Law of Diminishing Returns অথবা ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি-উৎপাদন বিধি। এ বিধির বক্তব্য হল, কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য যদি একাধিক উপাদানের প্রয়োজন হয় এবং একটি উপাদানের পরিমাণও স্থির থাকে তবে অন্যসব উপাদান অনেক বাড়ানো হলেও আনুপাতিক হারে উৎপাদন বাড়বে না, বরং উপকরণ বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন কমতে থাকে। ধরা যাক, খাদ্য উৎপাদনের জন্য শ্রম ও জমির প্রয়োজন। যদি জমির পরিমাণ স্থির থাকে তবে শুধু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ালে উৎপাদন আনুপাতিক হারে বাড়বে না। ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি-উৎপাদন বিধি একটি অনুমান মাত্র, এর পক্ষে কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। তবু আমরা কৃষির অভিজ্ঞতা হতে দেখতে পাই যে, শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে থাকলে এক পর্যায়ে না এক পর্যায়ে বাড়তি উৎপাদন কমতে থাকে। এ অনুমানের কারণ হল, যদি এ বিধি সত্য না হয় তা হলে উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে শুধু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে যদি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় তবে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে একটি ফুলের টব হতেই পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হবে। এ যুক্তি গ্রহণ করলে আজব পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি তর্কশাস্ত্রে *reductio ad absurdum* (যুক্তির উদ্ভট পরিণতি) নামে পরিচিত। তর্কের খাতিরে ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি-উৎপাদন বিধি মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি-উৎপাদন বিধি ম্যালথুসের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সবলতা, আবার এটাই হল তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সবলতা এ জন্য যে, এ বিধি মিথ্যা প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্বলতা এ জন্য যে, এ বিধি শুধু মাত্র স্বল্প মেয়াদে প্রযোজ্য, দীর্ঘ মেয়াদে অথবা অতিদীর্ঘ মেয়াদে প্রযোজ্য নয়। তবে স্বল্প মেয়াদ আর দীর্ঘ মেয়াদের তফাৎ বুঝতে হবে। অনেকে মনে করেন যে, স্বল্প মেয়াদ হল অল্প সময়, দীর্ঘ মেয়াদ অর্থ দীর্ঘ সময়। অথচ অর্থনীতির এই মেয়াদের সাথে পঞ্জিকার দিন-ক্ষণের সম্পর্ক নেই। এ মেয়াদ হল একটি তাত্ত্বিক ধারণা। স্বল্প মেয়াদে ধারণা করা হয় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের সকল উপকরণ বাড়ানো সম্ভব হয় না; অন্তত একটি উপকরণের পরিমাণ স্থির থাকে। যদি এমন কোন পণ্য থাকে যার উৎপাদনের সকল উপকরণ তাৎক্ষণিকভাবে

বাড়ানো যায় তবে সে পণ্যের উৎপাদনে কোন স্বল্প মেয়াদই নেই। আবার যদি এমন কোন পণ্য থাকে যার অন্তত একটি উপকরণ কোন মতেই বাড়ানো সম্ভব নয় তবে সে পণ্যের ক্ষেত্রে কোন দীর্ঘ মেয়াদ নেই। দীর্ঘ মেয়াদে প্রযুক্তি পরিবর্তিত হয় না। অতিদীর্ঘ মেয়াদে প্রযুক্তি পরিবর্তিত হয়। ম্যালথুসের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, তিনি টেলিস্কোপের বদলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মহাকাশের তারা দেখতে চেয়েছেন, তিনি স্বল্প মেয়াদের বিধির ভিত্তিতে অতি দূর ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চেয়েছেন। দুটো কারণে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অচল। দীর্ঘ মেয়াদে তাঁর পূর্ব-অঙ্গীকার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ম্যালথুসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ভূমির পরিমাণ সীমিত থাকেনি। দীর্ঘ মেয়াদে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শূন্য প্রান্তরে ফসলের আবাদ হয়েছে, এমনকি এশিয়া ও ইউরোপে জঙ্গল পরিষ্কার করে ও অনাবাদী জমি কর্ষণ করে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। ম্যালথুসের অনুমান ছিল, অতিদীর্ঘ মেয়াদে কৃষির প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। বাস্তবে পুঁজি-ঘন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বাড়ানো হয়েছে।

ইতিহাস তাই ম্যালথুসের ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করে না, বরং সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পিতার প্রগতিবাদী অনুমান। ঐতিহাসিক কারলো চিপোলার অভিক্ষেপণ অনুসারে ১৭৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬৫ কোটি হতে ৮৫ কোটি; ১৮৫০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১১০ কোটি হতে ১৩০ কোটি।[৬] এ হিসাব অনুসারে ১৭৯৮ সালে যখন ম্যালথুসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয় তখন বিশ্বের জনসংখ্যা খুব বেশি হলে ১০৭ কোটি ছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে ১৮০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৯৮ কোটি। আজকের বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, অর্থাৎ ম্যালথুসের সময়ের তুলনায় বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে। ম্যালথুসের অনুমান সঠিক হলে এ জনসংখ্যা এক শ কোটির কাছাকাছি থাকত, কখনও এত বাড়তে পারত না।

শুধু জনসংখ্যা বেড়েছে তাই নয়। ম্যালথুসের মুখে ছাই দিয়ে খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর হারে বেড়েছে। এর কারণ হল দুটো। প্রথমত, পৃথিবীর সর্বত্র কৃষি জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, কারিগরী পরিবর্তনের ফলে সমপরিমাণ জমিতে আজকে অতীতের চেয়ে উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৬১ সাল হতে ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এর প্রমাণ হল বিশ্বে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। ১৯৬১ সাল হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন শতকরা বিশ ভাগ বেড়েছে। এ বৃদ্ধি শুধু শিল্পোন্নত দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়। তৃতীয় বিশ্বে ১৯৬৩ সনের তুলনায় ১৯৯০ সনে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। যদিও গত দু শ বছরে কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তবু সামগ্রিকভাবে গত দু'শ বছরের ইতিহাস ম্যালথুসের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করেনি।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ম্যালথুসের নৈরাশ্যের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও, সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তার জগত হতে ম্যালথুসের হতাশার কালো ছায়া আজও অপসৃত হয়নি। বিভিন্ন আকারে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বার বার ফিরে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ট্যানলি জেভনস্ আশংকা করেছিলেন যে, বিলাতের কয়লা কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আজও শেষ হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ হ্যানসন ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেবে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীও সঠিক হয়নি। তবু ম্যালথুসের তত্ত্ব সত্তরের দশকে "ক্লাব অব রোম" নামে একটি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম Limits to Growth।[৭] এর পর আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৮] তাদের মূল বক্তব্য হল, পৃথিবীর সসীম সম্পদ নিয়ে অসীম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস না করতে পারলে এবং খাদ্য ও খনিজ সম্পদের চাহিদা না কমালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেমে যাবে। এদের ভবিষ্যদ্বাণী যত চমকপ্রদই হোক না কেন, এদের বক্তব্যে কোন নতুনত্ব নেই। ক্লাব অব রোমের জন্মের আগেও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বিশ্বের খনিজ সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ বিভাগ ঘোষণা করে যে, ১৯২৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ তেল শেষ হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ১৯৩৯ ও ১৯৫১ সালে ঘোষণা করে যে, যুক্তরাষ্ট্রের তৈল সম্পদ যথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৬৪ সালে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কোনটিই সত্য প্রমাণিত হয়নি। ১৯৭২ সালে ক্লাব অব রোম দাবি করে যে, পৃথিবীতে মাত্র ৫৫০ বিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এ হিসাবের ভিত্তিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ৮০-এর দশকের শেষে পৃথিবীতে খনিজ তৈল শেষ হয়ে যাবে। প্রকৃত পরিস্থিতি হল ১৯৭০ হতে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালে ৬০০ বিলিয়ন ব্যারেল তৈল ব্যবহৃত হয়েছে; এর পরেও ১৯৯০ সালে কমপক্ষে ৯০০ বিলিয়ন ব্যারেল তৈলের পরীক্ষিত মজুত রয়েছে। এ মজুতের পরিমাণ বেড়েই চলছে।

ম্যালথুসের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের সরবরাহ চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। তাই এদের অনেকেই এই মর্মে বাজি ধরেন যে, পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের মূল্য বেড়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এরলিক (Dr. Ehrlich) ও অধ্যাপক জুলিয়ান সাইমন (Julian Simon)-এর বাজির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এরলিক বলতেন যে, ভবিষ্যতে সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে খনিজ সম্পদের দাম বেড়ে যাবে। জুলিয়ান সাইমন মনে করতেন যে, কারিগরী পরিবর্তনের ফলে খনিজ সম্পদের চাহিদা কমে যাবে। এঁরা ১৯৮০ সালের পাঁচটি খনিজ সম্পদ – টাংস্টেন, নিকেল, তামা, ক্রোম ও টিনের দামের উপর বাজি ধরেন। এরলিক দাবি করেন যে ১৯৮০র তুলনায় ১৯৯০ সালে এ সব খনিজ দ্রব্যের দাম বাড়বে। সাইমনের মতে ১৯৯০ সালে এসব দ্রব্যের মূল্য ১৯৮০ সালের স্থিরীকৃত মূল্যের ভিত্তিতে কমবে। ১৯৯০ সালে দেখা গেল সাইমনই সঠিক। শুধু ১৯৮০ সালে

স্থিরীকৃত মূল্যে নয়, ১৯৮০ সালের তুলনায় এ সব পণ্যের দাম এমনিতেই কম।[৯] আশির দশকে দেখা গেল যে, ৩৫টি খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ৩৩টির দাম কমে গেছে। শুধু ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের দাম বেড়েছে। খনিজ দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ার বড় কারণ হল কারিগরী পরিবর্তন। একই ধাতু পুনঃপুনঃ ব্যবহার (recycle) করা হচ্ছে। উপরন্তু বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে অনেক বেশি কার্যকর ধাতু তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে ধাতুর ব্যবহার কমানো হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কাঁচামাল বিজ্ঞানে (material science) বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

অর্থনীতিবিদ্ সাইমনের মতনই প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত তত্ত্বের একজন বড় সমালোচক হলেন মার্কিন ভবিষ্যৎ-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স সিংগার।[১০] তাঁর মতে পৃথিবীতে বর্তমানে যে সম্পদ রয়েছে তাঁর অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। উপরন্তু কারিগরী পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সম্পদ নিয়েই বিশ্ব অর্থনীতিতে উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাঁর অভিক্ষেপণসমূহ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর নিম্নলিখিত অভিক্ষেপণসমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

১) পৃথিবীতে ৮৫০ কোটি একর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৩৫০ কোটি একর জমিতে চাষ হচ্ছে। অর্থাৎ এখনও চাষের জমির পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বাড়ানো সম্ভব। এর মধ্যে ৪০০ কোটি একর জমি হবে দো-ফসলা।

২) জমির পরিমাণ না বাড়িয়েও শুধু উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। আবার শুধু সেচ ও সারের ব্যবহার বাড়িয়ে বর্তমান প্রযুক্তি দিয়েই খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ করা সম্ভব। অর্থাৎ বর্তমান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে বা কর্ষিত জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখেই উৎপাদন ৫ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

৩) তেলের দাম বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। তেলের বিকল্প প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। অপ্রচলিত জ্বালানি সম্পদ যথা সৌর শক্তি, বায়ু চালিত শক্তি ও আণবিক শক্তির দ্রুত প্রসার হবে।

৪) তেল ছাড়া অন্যান্য খনিজ সম্পদের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। খাদ্য এবং তেল ছাড়া ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বছরে মাত্র ১৭০ ডলারের খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করে। এদের কোনটাই অত্যাবশ্যক নয়। প্রবৃদ্ধির পথে খনিজ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা কোন অন্তরায় হবে না।

৫) বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। এ বৃদ্ধি সমস্থিতি (equilibrium) হতে একটি সাময়িক বিচ্যুতি মাত্র। জন্মের হার বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়েনি; বেড়েছে মৃত্যুর হার হ্রাস হওয়ার ফলে। কিন্তু সমস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আরও কমে যাবে। আগামী এক শ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই পৃথিবীর জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে যাবে।

সিংগারের মত আশাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রবৃদ্ধির কোন সীমা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে না। খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে যাবে না। ইতিহাস আশাবাদীদের পক্ষে। বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আশাবাদীদের অনুমান সমর্থন করছে। তবু অনেক অর্থনীতিবিদ এখনও একবিংশ শতাব্দী নিয়ে আশাবাদী নন। তার অবশ্য একটি বড় কারণ হল, অর্থনীতি তার জন্মলগ্ন হতেই কার্লাইলের ভাষায় একটি হতাশাবাদী বিজ্ঞান (dismal science)। আজকের অনেক অর্থনীতিবিদের লেখা পড়লে পুরানো দিনের একটি গল্প মনে পড়ে। এক দেশে ছিলেন এক রাজা। দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে তিনি মন্ত্রীকে দেশের অর্থনীতিবিদ্‌দের সাথে পরামর্শ করতে নির্দেশ দেন। পরামর্শ শেষ হলে রাজা মন্ত্রীর কাছে অর্থনীতিবিদ্‌দের সুপারিশ জানতে চান। মন্ত্রী বললেন, "হুজুর অর্থনীতিবিদ্‌রা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের এক দল আশাবাদী, আরেক দল নৈরাশ্যবাদী।" রাজা বললেন, "নৈরাশ্যবাদীদের বাদ দিন। আশাবাদীরা কি বলেছেন বলুন।" মন্ত্রী বললেন, "আশাবাদীরা বলছেন যে আগামী বছর দেশের সবাইকে ঘাস খেয়ে থাকতে হবে।" অবাক হয়ে রাজা বললেন "তবে নৈরাশ্যবাদীরা কি বলছে?" মন্ত্রী বললেন, "নৈরাশ্যবাদীরা বলছে যে, আগামী বছরে সবার জন্য যথেষ্ট ঘাসও পাওয়া যাবে না।" আমার মনে হয়, আজকের অনেক আশাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌ই একবিংশ শতাব্দীর অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

বিংশ শতাব্দী হতে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটেছে।[১১] বিংশ শতাব্দীতে অর্থ-ব্যবস্থায় পুঁজি ছিল ক্ষমতার প্রধান উৎস, একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে অর্থ বা বিত্ত নয়, জ্ঞানই হল অর্থনৈতিক ক্ষমতার মৌলিক উপাদান। তথ্য-প্রযুক্তির রাজপথ ধরে নতুন প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হবে কারিগরী পরিবর্তন। অতীতে কারিগরী পরিবর্তন একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া ছিল না। কারিগরী পরিবর্তন আকস্মিকভাবে মাঝে মাঝে ঘটতো, তারপর মাঝে মাঝে ছেদ পড়তো। পুঞ্জীভূত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরী পরিবর্তনের ফলে আজকের বিশ্বে এ ধরনের পরিবর্তন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিরামহীন কারিগরী পরিবর্তন তাই দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারিগরী পরিবর্তনের এত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার হচ্ছে যে, এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করাও শক্ত হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পল রোমার (Paul Romer) যথার্থই বলেছেন:

> But in fact, the realm of possible things is incomprehensibly larger than the realm of actual things. We will never run out of things to discover – a reassuring fact since the process of discovery is the mainspring of economic growth. If we ever reached a point at which there were no discoveries the resource scarcity would bring economic process to a halt. But if we keep discovering new and

more valuable ways to make use of the fixed set of raw materials, we can keep creating value.

(সম্ভাব্য বস্তুর জগত প্রকৃত বস্তুর জগত হতে অচিন্তনীয়ভাবে বড়। আমাদের আবিষ্কারের বস্তু কখনও শেষ হবে না বরং যেহেতু আবিষ্কারের প্রক্রিয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উৎস, –এ উপলব্ধি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যদি এমন পর্যায়ে আমরা উপনীত হই যখন কারিগরী পরিবর্তন থেমে যাবে তখন সম্পদের অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নও থেমে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সীমিত কাঁচামালের নতুন ও আরও মূল্যবান ব্যবহার করব ততক্ষণ আমরা নতুন নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে থাকব।)

কারিগরী পরিবর্তনের ফলে কম কাঁচামাল ও শ্রম দিয়ে অধিক মূল্যবান দ্রব্য সৃষ্টি সম্ভব হবে। স্বতশ্চলনের (automation) ব্যাপক প্রয়োগের ফলে মানুষের অনেক স্বপ্ন পূর্ণ হবে। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন গ্রীক দার্শনিকদের স্বপ্নরাজ্যের (utopia) কল্পনাও বাস্তবায়িত হবে। একজন গ্রীক দার্শনিক স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন[১২]:

"The fishes
Came perfectly willing
And did their own grilling
and served themselves on the dishes."

স্বপ্নরাজ্য এমন এক স্থান যেখানে মাছেরা নিজে নিজে চলে আসে, নিজেরা নিজেদের সেঁকিয়ে তারা খাদ্য হিসাবে নিজেদের পরিবেশন করে। এ ধরনের আজগুবি কল্পনাকে এক সময়ে বিদ্রূপ করা হত। আজকের প্রজনন প্রকৌশল (genetic engineering) এবং স্বতশ্চলনের যুগে কেউ কি হলফ করে বলতে পারবে যে গ্রীক দার্শনিকদের কল্পিত মাছের উৎপাদন সম্ভব হবে না? অবশ্যই কারিগরী পরিবর্তনের ফলে এমন সব ঘটনা ঘটবে যা এই মুহূর্তে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

অতীতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল সম্পদের অপ্রতুলতা। দ্রুত কারিগরী পরিবর্তনের ফলে একবিংশ শতাব্দীতে সম্পদের অভাব প্রগতির পথে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। তবে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সামনে দুটো চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে : একটি অতি পুরাতন, অন্যটি নতুন।

অতি পুরাতন চ্যালেঞ্জটি হল তীব্রতর আর্থিক অসাম্যের পরিবেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। আর্থিক অসাম্যের সমস্যা মোটেও নতুন নয়। তবু বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহে মানুষে মানুষে আর্থিক অসাম্য বাড়ছে। ১৯৭০ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ১ শতাংশ পরিবারের আয় দ্বিগুণ হয়েছে, অথচ সর্বনিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত ২০ শতাংশ পরিবারের আয় প্রায় দশ শতাংশ কমে গেছে।[১৩] ১৯৬৯ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে সর্বোচ্চ শ্রেণীর গড় মজুরি সর্বনিম্ন মজুরির ৭.৫ গুণ ছিল, ১৯৯২ সালে এ অনুপাত এগারো গুণে দাঁড়িয়েছে।[১৪] সাথে সাথে উন্নয়নশীল আর উন্নত দেশসমূহের

ব্যবধান বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা পিছু আয় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের ৯১.৭ গুণ ছিল, ১৯৯৭ সালে এ বৈষম্য ১০৬.৪৪ গুণে উন্নীত হয়েছে। আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভেতরে ধনী ও গরীবের বৈষম্য অত্যন্ত নগ্ন হয়ে উঠেছে। ১৯৯৮ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ১৫টি দেশে সর্বোচ্চ আয়ের দশ শতাংশ পরিবার মোট জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশের বেশি ভোগ করে। এই পনেরটি দেশের সবকটিই হল উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীতে সবচেয়ে ধন বৈষম্য বিরাজ করছে ব্রাজিলে–কোন উন্নত দেশে নয়। অসাম্যের সূচকের (Gini coefficient) পরিমাণ সর্বাধিক ১ হতে পারে। এই সূচক ব্রাজিলে ০.৬০, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সূচক ০.৪০ এবং বাংলাদেশে ০.২৮।

অর্থনৈতিক অসাম্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এর কোন সহজ সমাধান এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অর্থনৈতিক অসাম্য প্রবাদ বাক্যে বর্ণিত দিল্লীর লাড্ডুর মতো। কথায় বলে, দিল্লীর লাড্ডু যে খেয়েছে সে ঠকেছে এবং যে খায়নি সেও ঠকেছে। আর্থিক অসাম্য থাকলেও বিপদ কেননা তাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ দেখা দেয়। আবার আর্থিক অসাম্য দূর করতে গেলেও বিপদ কেননা সেখানে প্রণোদনা শুকিয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্রোতধারা মরু পথে হারিয়ে যায়। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা সম্ভব না হলে, এই বৈষম্য যাতে দ্রুত বেড়ে না যায় তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের চেয়ে অধিক সফল হয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি মানুষের ইতিহাসে নতুন। দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে পরিবার সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শিল্পোন্নত দেশসমূহে পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে হারিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ শতাংশ শিশু অবিবাহিত মায়ের সন্তান। বাকি ৬৯ শতাংশ শিশু বিবাহিত মায়ের সন্তান হলেও এদের মাঝে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ জন্মের অল্প দিনের মধ্যেই বাপ মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ দেখতে পায়। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ শতাংশ শিশু বাপ মা উভয়ের যত্ন ও পরিচর্যার সুযোগ লাভ করে না। একজন সমাজতাত্ত্বিক তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "পিতৃহীন সমাজ" বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের সমাজে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘ মেয়াদে ভগ্ন পরিবারে সন্তানদের মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা যাবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ সমস্যা ইউরোপে আরও প্রকট। সুইডেনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশু অবিবাহিত মায়েদের গর্ভে জন্ম নেয়।

পরিবার অবলুপ্তির এ সমস্যাকে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফুকুইয়ামা "Great Disruption" বা মহাভাঙ্গন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১৫] তাঁর মতে এ সমস্যার সমাধান করতে হলে সামাজিক পুঁজি (social capital) গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে মানুষে মানুষে সহযোগী ও সৃষ্টিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করছে সামাজিক পুঁজির সরবরাহ।

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে তাই মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক নয়, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল রাজনৈতিক ও সামাজিক। প্রায় সাত দশক আগে লর্ড কেইনস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা একবিংশ শতাব্দী সম্পর্কেও প্রযোজ্য[১৬]:

> The problem of want and poverty and the economic struggle between classes and nations is nothing but a frightful muddle, a transitory and unnecessary muddle. For the Western World already has the resource and the technique, if we could create the organization to use them, capable of reducing the Economic problem which now absorbs our moral and material energy to a position of secondary importance ... Thus the ... day is not far off when the Economic problem will take the back seat where it belongs, and ... the arena of the heart and head will be occupied ... by our real problems – the problems of life and human relations, of creation and behaviour and religion.
>
> (অভাব আর দারিদ্র্যের সমস্যা এবং শ্রেণী ও জাতিসমূহের মধ্যে সংঘাত একটি ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি মাত্র, একটি সাময়িক ও অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি মাত্র। আমরা যদি যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি তবে পাশ্চাত্য জগতে যে সম্পদ ও কারিগরী জ্ঞান রয়েছে তা আজকের অর্থনৈতিক সমস্যাকে, যা আমাদের নৈতিক ও পার্থিব শক্তিকে নিবিষ্ট করে রেখেছে, গৌণ সমস্যাতে পরিণত করতে সক্ষম, তাই ... সে দিন দূরে নয় যে দিন অর্থনৈতিক সমস্যা যথাস্থানে পড়ে থাকবে অর্থাৎ পেছনে পড়ে থাকবে এবং ... মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তি ... আমাদের সমস্যা যে সব প্রকৃত সমস্যা তাদের সমাধানে নিয়োজিত হবে। সেসব সমস্যা হল ... বাঁচার সমস্যা, মানবিক সম্পর্কের সমস্যা, সৃষ্টির সমস্যা এবং আচরণ ও ধর্মের সমস্যা।)

## তথ্যসূত্র

১. Peter, Laurence J., *Peter's Quotations* (New York : Quill, 1977), p. 447

২. Gordon, Scott., *The History and Philosophy of Social Science* (London: Routledge, 1993), p. 30

৩. Becker, Carl. L., *The Heavenly City of the Eighteenth Century Philosophers* (New Haven : Yale University Press, 1932)

৪. Gordon, Scott, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১৫৩

৫. Gordon, Scott, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৩

৬. Cipolla, Carlo M., *The Economic History of World Population* (Hammondsworth : Penguin Books, 1969), pp. 101

৭. Meadows, Donella H., et al., *The Limits to Growth* (New York : University Books, 1972)

৮. Meadows, Donella H., et al., *Beyond the Limits of Growth* (Post Mill : Chelsea Green Publishing Co., 1992)

৯. *Economist*, December 20th 1997, pp. 21-23

১০. Singer, Max, *Passage to a Human World* (Indiana : Hudson Institute, 1987)

১১. Drucker, Peter, *Post-capitalist Society* (New York : Harper Business, 1993)

১২. Gordon, Scott, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২

১৩. Krugman, Paul, *The Age of Diminished Expectations* (Cambridge : MIT Press, 1994), pp. 24

১৪. Thurow, Lester C., *The Future of Capitalism* (London : Nicholas Brealy Publishing Ltd., 1996), p. 35

১৫. Fukuyama, Francis, *The Great Disruption* (New York : Fres Press, 1999)

১৬. Keynes, J. M., Forward to *Essays in Persuasion* (New York : Harcourt and Brace Company, 1932)

# শোষণের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ছোট বেলায় আমাদের পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের পার্থক্য শেখানো হয়েছিল : পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ শোষণ করে মানুষ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল তার সম্পূর্ণ উলটো। দীর্ঘ দিন পরে বুঝতে পারছি যে, সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদ বিপরীতার্থক নয়; এরা হচ্ছে একে অপরের প্রতিবিম্ব। "মানুষ শোষণ করে মানুষ" বাক্যটি উল্টালে দাঁড়ায় "মানুষ করে শোষণ মানুষ"। প্রকৃত পরিস্থিতির এতে কোন হেরফের হয় না। সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের অবয়বে যত তফাতই থাকুক না কেন, এদের নির্যাস কিন্তু অভিন্ন।

যেখানেই লিখিত ইতিহাস পাওয়া গেছে, সেখানেই রয়েছে মানুষের উপর মানুষের শোষণের সুস্পষ্ট নিদর্শন। কার্ল মার্কস অবশ্য এ মত সমর্থন করতেন না। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের ইতিহাস শোষণ নিয়ে শুরু হয়নি, সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ বাস করেছে আদিম সাম্যবাদী সমাজে। কিন্তু প্রদোষ লগ্নের ইতিহাস প্রধানত অনুমান-নির্ভর, এ পর্যায়ের ইতিহাসের যথেষ্ট প্রত্যক্ষ উপাদান নেই। ঐতিহাসিক যুগের লিখিত সূত্র রয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের এ ধরনের কোন উপাদান নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম সাম্যবাদ তাই যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একজন দার্শনিক ইতিহাসকে তুলনা করেছেন একটি অসম্পূর্ণ পুঁথির সাথে যার প্রথম পর্বের পাতাগুলি হারিয়ে গেছে আর শেষ পাতাগুলো এখনও লেখা হয়নি। আদিম সাম্যবাদের সত্যতা নির্ধারণ করতে হলে ইতিহাসের পুঁথির হারানো পাতাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সে সব পাতা খুঁজে পাওয়া না যাবে ততদিন আদিম যুগের সমাজ ব্যবস্থার রূপ সম্পর্কে বিতর্কের নিরসন সম্ভব হবে না।

ইতিহাস নামক পুঁথির পাতা যে পর্যায় থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই শোনা যাচ্ছে শোষণ ও বঞ্চনার নিষ্করুণ আর্তনাদ। উদাহরণস্বরূপ সাড়ে চার হাজার বছর আগে রচিত এক মিশরীয় কবির ফরিয়াদ নীচে তুলে ধরছি[১]।

"To whom do I speak today ?
Brothers are evil,
Friends of today are not of love.
To whom do I speak today ?
Hearts are thievish,
Every man seizes his neighbour's goods.
To whom do I speak today ?
The gentle man perishes
The bold-faced goes everywhere. ...
To whom do I speak today ?
When a man should arouse wrath by his evil conduct
He stirs all men to mirth, although his iniquity is wicked."

("আমি আজ কাকে বলবো?
ভাইয়েরা মন্দ।
আজকের বন্ধুদের হৃদয়ে প্রেম নেই।
আমি আজ কাকে বলবো?
মানুষের হৃদয় তস্করসুলভ।
প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীদের মাল গ্রাস করছে।
আমি আজ কাকে বলবো?
সজ্জনেরা লোপ পাচ্ছে।
নির্লজ্জরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আমি আজ কাকে বলবো?
কেউ তার কুআচরণে অন্যের ক্রোধের উদ্রেক করলে
সবাই হাসছে যদিও এই অন্যায় আচরণ আক্রোশপূর্ণ।")

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীন দেশে বাস করতেন প্রখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস। তাঁর জীবনীকারগণ চীনে রাষ্ট্রের শোষণের বিস্তারিত বর্ণনা রেখে গেছেন। কথিত আছে যে, তাঁর নিজের প্রদেশে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিলে কনফুসিয়াস দুর্গম পর্বতসংকুল পথ অতিক্রম করে অন্য প্রদেশে যাত্রা করেন। পথে তিনি দেখতে পান যে, একজন মহিলা একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছে। কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্য জে-লুকে মহিলার কান্নার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পাঠালেন। মহিলাটি জানায় যে, তার শ্বশুরকে বাঘে খেয়েছে, তার স্বামী বাঘের হাতে নিহত হয়েছে এবং তার ছেলেরও একই ভাবে মৃত্যু হয়েছে। কনফুসিয়াস মহিলাটিকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেন এত বিপজ্জনক পরিবেশে বাস করছেন। মহিলা জবাব দিলেন যে, এখানে বিপদ থাকলেও অত্যাচারী শাসক নেই। উত্তর শুনে কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্যদের বলেন, "বৎসগণ, মনে রেখো, অত্যাচারী সরকার বাঘের চেয়েও হিংস্র।"

কনফুসিয়াস ভয় করতেন অত্যাচারী শাসকদের। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে অত্যাচারী শাসকদের চেয়েও বিপজ্জনক হল নৈরাজ্য। ভারতীয় দার্শনিকরা নৈরাজ্যকে আখ্যায়িত করেন "মাৎস্যন্যায়" যার অর্থ হল মাছের মত। মাছের জগতে বড় মাছ ছোট মাছকে খায়। নৈরাজ্য দেখা দিলে বড়লোকরা ছোটদের সম্পত্তি গ্রাস করে। এর ফলে নৈরাজ্যে শোষণ হয় সবচেয়ে প্রকট। রামায়ণে তাই নৃপতিবিহীন জনপদকে জলবিহীন নদী, তৃণবিহীন বন, এবং রাখালবিহীন গবাদিপশুর পালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[২] মহাভারতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে : প্রথমে বেছে নেবে রাজা, তারপর পছন্দ করবে স্ত্রী, আর সবশেষে আহরণ করবে সম্পদ। কেননা নৈরাজ্য প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত রাজা না থাকলে স্ত্রী এবং সম্পত্তি কোনটাই রক্ষা করা যাবে না।

শাসক থাকুন আর নাই থাকুন, শাসক ভালোই হোন আর মন্দই হোন – মানুষের উপর মানুষের শোষণ সব অবস্থাতেই ছিল অব্যাহত। মানুষের ইতিহাস তাই শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। কৃষিপ্রধান সমাজে এ বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয়। শোষিত মানুষ বার বার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কোন কোন দেশে এ সব বিদ্রোহের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এ ইতিহাস হারিয়ে গেছে। অতি অল্প সংখ্যক দেশের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। জাপানের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ঐতিহাসিক ডেভিড এস ল্যান্ডিসের হিসাব অনুসারে ১৫৯০ হতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭৭ বছরে জাপানে প্রায় তিন হাজার কৃষক বিদ্রোহ হয়।[৩] বছরে গড়ে প্রায় এগারটি কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু এ ধরনের বিদ্রোহ জাপানের সামাজিক কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে পারেনি। এ সব বিদ্রোহ ছিল ইতিহাসের স্ফুলিঙ্গ। উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াই ছিল এদের নিয়তি। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টি করেনি।

শোষণের কানাগলিতে আবদ্ধ মানুষ অন্ধ আক্রোশে ফুঁসেছে, কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পায়নি। ধর্ম প্রচারকগণ এবং স্বপ্নরাজ্যের প্রবক্তা দার্শনিকগণ মানুষকে শোষণ ব্যবস্থা অবসানের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে শোষণ ব্যবস্থা অবলুপ্তির ঐতিহাসিক অনিবার্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। মার্কস কল্পনা-বিলাসী দার্শনিক ছিলেন না। শ্রেণী সংগ্রামে শোষিতের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবিতা তিনিই প্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি হল তাঁর চারটি অনুমান। প্রথমত, মার্কস মনে করতেন যে, শোষিত মানুষ সকল সমাজব্যবস্থাকেই ঘৃণা করেছে কিন্তু পুঁজিবাদের প্রতি সর্বহারাদের যে ধরনের ঘৃণা দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের ঘৃণা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এর কারণ হল, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হতে শোষিত মানুষ বিচ্ছিন্ন; পুঁজিবাদের আগে যে সব উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তাতে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা (alienation) ঘটেনি।[৪] তাঁর মতে প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকরা শুধু উৎপাদনের উপকরণ ছিল না, সমাজ ব্যবস্থায় তাদের একটি নিজস্ব সত্তা ও ভূমিকা ছিল। প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের

সকল যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করত শ্রমিকরা, যদিও সর্বক্ষেত্রে শ্রমিকরা যন্ত্রের মালিক ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করে মালিক। শ্রমিক শুধু মজুরি পায়, উৎপাদিত পণ্যে তার কোন অধিকার নেই। আর্থিক দিক হতে বঞ্চিত ও মানসিক ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন সর্বহারা শ্রেণীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাছে কোন দায় নেই। তাই বঞ্চিত মানুষেরা এ ব্যবস্থা উৎখাত করার জন্য এগিয়ে আসবে।

দ্বিতীয়ত, মার্কস মনে করতেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি সর্বহারাদের ঘৃণা ক্রমেই বাড়বে। এর কারণ হল শ্রমিক শ্রেণীসমূহের ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের (Law of immiserization of the working classes) বিধি। মার্কসের মতে নিরন্তর কারিগরী পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের চাহিদা ক্রমাগত কমবে। বেকার সমস্যা এর ফলে প্রকটতর হবে। শ্রমিকদের মজুরির হার কমতে থাকবে। পক্ষান্তরে বিরামহীন প্রতিযোগিতায় মুনাফার হারও কমে আসবে। এর ফলে শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকবে। কাজেই শ্রমিকদের পক্ষে এ শোষণ ব্যবস্থা রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।

তৃতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে পল্লী অঞ্চল হতে উৎপাটিত ছিন্নমূল মানুষেরা ভিড় জমিয়েছে শহরের কারখানাসমূহে। অতীতে সর্বহারারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণী অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে জমায়েত হয়। তাই তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

চতুর্থত, শুধু শোষণের মাত্রা বাড়লেই শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেবে না। শোষিতদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না করা হলে সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনই ঘটবে না। মার্কসের আশাবাদের একটি কারণ হল কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয়। তাঁর মতে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পথিকৃত হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না।

বিংশ শতাব্দীর এক পর্যায়ে মনে হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্যুতি দেখা দিলেও, ইতিহাসের মূলধারা মার্কসের অভিক্ষেপিত পথ ধরেই এগুচ্ছে। মার্কস মনে করতেন যে, সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ঘটবে শিল্পোন্নত দেশে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয় শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত পূর্ব ইউরোপে ও পূর্ব এশিয়াতে। তবু বিংশ শতাব্দীতে কয়েক দশক ধরে মনে হয়েছে যে পূর্ব দিগন্ত সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনায় লাল হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে এশিয়াতে, ল্যাতিন আমেরিকাতে এবং আফ্রিকাতে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে; দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রহসনে। জনৈক রসিক জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রবীভবন লক্ষ্য করে বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল পুরুষালি বিপ্লব রূপে আর শেষ হয়েছে মেয়েলি বিপ্লবে। পুরুষালি বিপ্লব হল কঠিন, কঠোর ও শোণিতাক্ত। এ ধরনের বিপ্লব সম্পর্কেই মাও সে তুং বলেছেন[৫]:

> Revolution is not a dinner party, nor an essay, nor a painting, nor a piece of embroidery, it cannot be advanced softly, gradually, carefully, considerately, respectfully, politely, plainly and modestly.
> (বিপ্লব কোন ভোজন উৎসব নয়, কোন রচনা নয়, চিত্রকর্ম নয় অথবা নকশি কাঁথার কারুকাজ নয়, তাই বিপ্লবকে কোমলভাবে, ক্রমান্বয়ে, সতর্কতার সাথে, সুবিবেচনার সাথে, সম্মানের সাথে, মার্জিতভাবে, সহজভাবে এবং বিনয়ের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।)

পুরুষালি বিপ্লবের মত মেয়েলি বিপ্লবেও সমাজ ব্যবস্থাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মেয়েলি বিপ্লব মাও সে তুং-এর বিপ্লবের সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু। এ বিপ্লবে রক্তপাত ঘটে না। তবু মেয়েলি বিপ্লবে জার্মানি, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে নির্দেশ অর্থনীতি ভোজবাজির মত হারিয়ে গেল। বার্লিনে এ ধরনের বিপ্লবের সাথে সাথে পূর্ব বার্লিনের মহিলারা মনের সুখে পশ্চিম বার্লিনে বাজার করতে ভিড় জমালেন। যে বিপ্লবে বাজার করার সুযোগ বাড়ে (বাজার করার জন্য মহিলাদের দুর্বলতার কথা কে না জানে!) তাকে মেয়েলি বিপ্লব বলাই বোধ হয় অধিকতর শোভনীয়।

বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ফরাসীদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা কখনও তাদের নিজেদের কোন দুর্বলতা স্বীকার করে নেয় না; সব সময়েই ব্যর্থতা বাইরের কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। মার্কসীয় পণ্ডিতগণ ফরাসীদের মত। মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা শিল্পোন্নত দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যর্থতার জন্য মার্কসীয় তত্ত্বের কোন ত্রুটিই স্বীকার করে নেয়নি। প্রথমে বলা হত যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ সাম্রাজ্য স্থাপন করে তাদের দেশে বিপ্লব ঠেকিয়ে রেখেছে। যখন সাম্রাজ্যবাদ অবলুপ্ত হল তখন সকল দোষ চাপানো হল নব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং পোষক-মক্কেল (patron-client) সম্পর্কের ভিত্তিতে শোষণের উপর।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কোন দেশেই সর্বহারা শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। মার্কসের অনুমান ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল সর্বহারা মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হবে। মার্কস মনে করতেন যে, সকল শোষিত মানুষই হচ্ছে সমজাতীয় (homogeneous) , এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা মোটেই দুরূহ নয়। এ ধারণা সত্য নয়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে শুধু সামাজিক একক-বন্ধন (mono-sociality) দেখা যায়। একটি হাতি শুধুমাত্র একটি পালের সদস্য, একটি পাখি শুধুমাত্র একটি ঝাঁকের অংশ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের সমাজে রয়েছে বহুবিধ-বন্ধন (multisociality)। পল্লী অঞ্চল হতে উৎপাটিত একজন ছিন্নমূল মানুষ শুধু কারখানার শ্রমিক নয়, তার ধর্মীয় সত্তা রয়েছে, তার ভাষাগত সত্তা রয়েছে, তার আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকরা নানা ভাষায় কথা বলে। একই ভাষাভাষীদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধন থাকে। আবার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা থাকে। একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। কাজেই শ্রমিকরা ভিন্ন ভিন্ন

উপাসনালয়ে যায়। তাই শ্রমিকদের সামাজিক বন্ধনে পার্থক্য ঘটে। সকল শ্রমিক সমজাতীয় নয়, এরা বহুজাতীয়। বহুজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংগঠন সহজ নয়। এদের মধ্যে তাই দেখা দেয় নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভাষার ভিন্নতার জন্য বিহারী-বাঙ্গালী শ্রমিকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ধর্মের ভিন্নতার জন্য হিন্দু মুসলমান শ্রমিকরা একে অপরকে হামলা করে। এমনকি জেলার ভিন্নতার জন্য, অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিন্নতার (যথা শিয়া/সুন্নী) জন্য হানাহানি দেখা দেয়। তাই শোষিত শ্রেণী সম্মিলিতভাবে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে নিজেরাই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। মার্কস অনুমান করেছিলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণীর কাছে শোষণই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কাজেই অন্য সকল সামাজিক সত্তা সর্বহারাদের শ্রেণী চেতনায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু মার্কসের এ অনুমান মোটেও সঠিক নয়। দীর্ঘদিনের সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষার পর আজও সার্বিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বসনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উপর আক্রমণ সমর্থন করছে। সোভিয়েত রাশিয়া অথবা চীনে ধর্মীয় বা আঞ্চলিক জাতীয় চেতনা কোনটাই হারিয়ে যায়নি।

মানুষের সামাজিক জীবন অত্যন্ত জটিল ও বর্ণাঢ্য। কোন সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেই সমাজের সকল উপাদান তুলে ধরা সম্ভব হয় না। তাই তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীই তার নিজের মতে যা প্রয়োজনীয় তার ভিত্তিতে তত্ত্ব রচনা করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অপ্রয়োজনীয় উপাদান বলে যা বাদ দেওয়া হয় তা মোটেও অপ্রয়োজনীয় নয়। তার ফলে সামাজিক তত্ত্ব বাস্তবের অতি-সরলীকরণ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন : শোষক ও শোষিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল শ্রেণীকেই দুটি শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মার্কসীয় তত্ত্বে তাই অন্তর্বর্তী (intermediate) শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দক্ষ কারিগর শ্রেণী (artisans), ক্ষুদ্র নিয়োগকারী (employer) পাতি বুর্জোয়া, কারখানাতে তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক এবং পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[৬] মার্কস মনে করতেন যে, শ্রেণী সংগ্রামের মেরুকরণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্বর্তী শ্রেণীসমূহ শোষক বা শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আত্তীভূত হয়ে যাবে, এদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তী শ্রেণী মুছে যায়নি, ইতিহাসের প্রক্রিয়াতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। মার্কস অনুমান করেছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে বেশিরভাগ কর্মসংস্থান হবে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে মজুরিভিত্তিক কাজে। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত শিল্পে মোট শ্রমিকদের সিংহভাগ কখনও নিয়োজিত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষাটের দশকে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের (দেশের মোট শ্রমিকের সংখ্যার ভিত্তিতে) হিস্সা ছিল ৩৬ শতাংশ। এই হিস্সা বর্তমানে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৯৮ সালের জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে (OECD) মাত্র ৩০ শতাংশ শ্রমিক শিল্পে কাজ করে, ৬০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে সেবা খাতে আর মাত্র ১০ শতাংশ কাজ করে

কৃষি খাতে।[৭] সেবা খাতে যারা কাজ করে তাদের বেশির ভাগই স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত অথবা ক্ষুদ্র নিয়োগকারীর সাথে কাজ করছে। এর ফলে অন্তর্বর্তী শ্রেণী শিল্পোন্নত দেশসমূহে সর্বহারা শ্রেণীর চেয়েও আকারে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৫ হতে ১৯৯৫–এই দশকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে মোট শ্রমশক্তিতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যার অনুপাত ৪২ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এ ধরনের প্রবণতা শুধু শিল্পোন্নত দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়। এ প্রবণতা বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশেও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে ১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রমশক্তি সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট কর্মরত ব্যক্তিদের মাত্র ১৫.৫ শতাংশ শিল্প ও যোগাযোগ খাতে নিযুক্ত। বাংলাদেশের কারখানার মোট শ্রমিকের চেয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদের মাত্র ১১.২ শতাংশ শিল্প খাত হতে আসে, আর সেবা খাতে উদ্ভূত হয় প্রায় ৪৭.২ শতাংশ। কাজেই এ সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেও শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হল আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিরা। এ ধরনের সমাজে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুসারে সর্বহারাদের বিপ্লব অনিবার্য হওয়ার পক্ষে কোন অমোঘ যুক্তি নেই।

মার্কসের চিন্তার জগৎ শুধু কারখানা মালিকদের শোষণ নিয়ে আচ্ছন্ন ছিল। তাই তিনি শুধু গরীবদের উপর ধনীদের শোষণ নিয়েই লিখেছেন। কিন্তু দরিদ্ররা সকলে সমশ্রেণীর নয়। তার ফলে দরিদ্ররাও দরিদ্রদের শোষণ করে। বড় ধনী শোষণ করে ছোট ধনীদের, ছোট ধনীরা শোষণ করে মাঝারি দরিদ্রদের আর মাঝারি দরিদ্ররা শোষণ করে হত-দরিদ্রদের। বাস্তব জীবনে শোষণের স্তর দুটি নয়, শোষণের অনেক স্তর। শুধু একটি মাত্র স্তরে শোষক আর শোষিত জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত নয়, স্তরে স্তরে শোষক আর শোষিতের সংঘর্ষ চলছে। এক স্তরে যিনি শোষক, পরবর্তী স্তরে তিনিই শোষিত। কাজেই সর্বহারার শ্রেণীচেতনা ঘনীভূত হতে পারে না। বাংলাদেশে তাই শ্রমিক শ্রেণী ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করে। মার্কসের তত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; প্রকৃতপক্ষে এরা বিশেষ সুবিধাভোগী সামাজিক গোষ্ঠী। কৃষি অথবা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তুলনায় আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় অনেক বেশি। এর ফলে এদের অনেকের পক্ষেই মজুরির টাকা জমিয়ে গ্রামে ভূসম্পত্তি কেনা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর কামাল সিদ্দিকী ও তাঁর সহকর্মীদের ঢাকা শহরের আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষার তথ্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে।[৮] ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগের গ্রামে ভিটা ও জমি রয়েছে। যাদের জমি রয়েছে এদের গড় জমির পরিমাণ হল ১.৩ একর। এদের বেশির ভাগই গ্রামে ভাগচাষী অথবা ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে জমি চাষ করায়, এরা প্রত্যেকে গ্রাম থেকে (১৯৮৮

সালের বাজার মূল্যে) গড়ে বছরে চার হাজার টাকা আয় করে। আনুষ্ঠানিক খাতের অধিকাংশ শ্রমিকই হল গ্রামাঞ্চলে অনুপস্থিত ভূস্বামী। শহরে তারা মালিকদের বিপক্ষে শ্লোগান দিলেও গ্রামে এদের অবস্থান ভাগচাষী ও ভূমিহীন শ্রমিকদের বিপক্ষে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাতে সর্বহারার চেতনা দানা বেঁধে উঠতে পারে না।

শুধু শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে সরলীকৃত ব্যাখ্যাই মার্কসবাদের একমাত্র দুর্বলতা নয়। মার্কস কারিগরী পরিবর্তনের সুফল সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কারিগরী পরিবর্তনের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়ন শুরু হয়নি—শুরু হয়েছে ক্রমবর্ধমান স্বাচ্ছন্দ্য। উপরন্তু কার্ল মার্কস ধরেই নিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদ কোন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অনেক দুর্বলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়েছে। কল্যাণ-রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার জাল সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নেতারা শুরু করেননি, করেছেন বিসমার্কের মত রক্ষণশীল নেতারা।

আগামী দিনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীই সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের স্বর্ণ-যুগ রূপে চিহ্নিত হবে। আর কোন শতাব্দীতেই এত দীর্ঘদিন ধরে এত ব্যাপক পরিসরে সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। তবু শতাব্দীর শেষে সমাজতন্ত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেনি। ইতিহাসে সকল আদর্শবাদ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে কমিউনিজমের কপালেও তাই ঘটল। অর্থনৈতিক তত্ত্বের ঐতিহাসিক স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন যে, যখনই কোন আদর্শ বা ধর্ম সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উপনীত হয় তখনই তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা দেয়।[৯] এ ধরনের আদর্শগত ডিগবাজির প্রবণতার ফলে বিশ্বজনীন ভালবাসার নামে মৌলবাদী খ্রীষ্টানরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চরম সমর্থক রোমান্টিক মতবাদ ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের সমর্থনে; নাস্তিক শাক্য মুনি ভগবান বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রের অবলুপ্তির অভীষ্টে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরাই গড়ে তুলেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী সমগ্রতাবাদী (totalitarian) রাষ্ট্র। সর্বহারা শ্রেণীর পুরোধা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা একটি নতুন শোষক শ্রেণী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীতে শোষণ বন্ধ হয়নি। একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের উপর মানুষের শোষণ হয়ত বন্ধ হবে না। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, বিংশ শতাব্দীতে যে সব বিপ্লবী পুরানো পৃথিবীকে পরিবর্তন করার জন্য মরণপণ সাধনা করেছেন তাঁরা কি সকলেই ভুল করেছেন? আমি কিন্তু মনে করি না যে, তাঁরা আদৌ কোন ভুল করেছেন। শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা জন্ম দেয় মহত্তম মানবিক মূল্যবোধের। যে দিন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেমে যাবে সে দিন বুঝতে হবে যে, মানবিক মূল্যবোধে ধস নেমেছে। একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্ যথার্থই বলতেন, যৌবনে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় নেই; বেশি বয়সে যারা রক্ষণশীল হয় না তাদের মগজ নেই। পৃথিবীতে যতদিন হৃদয়বান লোক থাকবে ততদিন সমাজতন্ত্রের আদর্শও মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, কোন বিপ্লবই চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেনি। অথচ সংস্কারমূলক ব্যবস্থার ফলে শোষিতদের জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, শোষণের অবলুপ্তির জন্য কি বিপ্লবের আদৌ প্রয়োজন রয়েছে, না বিবর্তনের ফলে শোষণ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে? বিবর্তনবাদীরা মনে করে যে, শোষণ ব্যবস্থা অনুৎপাদনশীল। সমাজে অসাম্য দূর হলে ব্যষ্টিক পর্যায়ে যেমন সুফল দেখা দেবে, সামষ্টিক পর্যায়েও তেমনি অগ্রগতি দেখা যাবে। কাজেই পুঁজিবাদের স্বার্থেই শোষণের তীব্রতা কমে আসবে। মজুরির হার বাড়লে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং তার ফলে কর্মক্ষমতা বাড়বে। শ্রমিকরা শিক্ষিত হলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন হলে দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ভোগ্যপণ্যের বিক্রয় বাড়লে দেশে উৎপাদন বাড়বে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু সংস্কারপন্থী এ চিন্তাধারার তিনটি সুস্পষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, শিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে সাথে আর্থিক বৈষম্য মোটেও কমছে না। একজন অর্থনীতিবিদ্ যথার্থই বলেছেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে রূপকথার এলিসের আজব দেশের নিয়মাবলী প্রযোজ্য।[১০] আজব দেশে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দৌড়াতে হয়। আর্থিক অসাম্য একই পর্যায়ে রাখতে হলেও সব সময়েই সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, অন্যথায় অসাম্য বাড়তেই থাকবে। সমাজে সকলকে একই স্তরের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা পর্যায়ের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাই আয়ের বৈষম্য বাড়ছে।

দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে আঘাত না এলে যারা শোষণের সুফল ভোগ করে তারা প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনে রাজি হবে না। ভারতের বর্ণ প্রথা এর একটি উদাহরণ। হাজার হাজার বছরে এর পরিবর্তন হয়নি। গৃহযুদ্ধ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাস প্রথা উচ্ছেদ সম্ভব হত না।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কখনও শোষণ দূর হবে না। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক রয়েছে। এদের সমঝোতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালিত হয়। ধরা যাক একটি দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল রয়েছে। এর মধ্যে একটি রাজনৈতিক দল অর্থনৈতিক শোষণ সম্পূর্ণ দূর করতে চায়। আরেকটি দল ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমাজতান্ত্রিক দল অন্য দলের ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য সমাজতন্ত্রের দাবি নিয়ে আপোষ করবে এবং ধর্মতান্ত্রিক দলের কোন কোন দাবি গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে ধর্মতান্ত্রিক দল ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু আপোষ করবে এবং সমাজতন্ত্রের কিছু শ্লোগান গ্রহণ করবে। এর ফলে কোন দলই তার আদর্শ পুরাপুরি বাস্তবায়ন করবে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে আপোষ ও সমঝোতার ফলে শোষণ কখনও দূর হবে না।

মার্কসবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়লেও শোষণ যতদিন থাকবে ততদিন বিপ্লবী চেতনার দীপ জ্বলতেই থাকবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের স্বপ্ন অবাস্তব হলেও মানুষ অতীতে এ স্বপ্ন দেখেছে, বর্তমানে দেখছে এবং ভবিষ্যতেও দেখবে। অর্থনৈতিক চিন্তার ঐতিহাসিক স্কট গর্ডন যথার্থই লিখেছেন[১১]:

> Empires rise and fall; races and nations flourish and then disappear, preachers of new doctrines are crucified or burnt at the stake, heretical books are destroyed, but basic ideas never die. The culture absorbs them, like an organism digesting the nutriment essential to its existence, and the elements reappear, time and again, in new forms.
>
> (সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়, নরগোষ্ঠী ও জাতিসমূহ সমৃদ্ধি লাভ করে ও অবলুপ্ত হয়, নতুন মতবাদের প্রচারকদের ক্রুশবিদ্ধ করে অথবা খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়, প্রচলিত মতবিরোধী গ্রন্থ পোড়ানো হয়, কিন্তু মৌল ধারণা কখনও মরে না। সংস্কৃতি এ ধরনের মৌল ধারণা শুষে নেয় যেমন করে উদ্ভিদ তার বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক পুষ্টি গ্রহণ করে, মৌল উপাদানসমূহ বার বার নতুন আকারে ফিরে আসে।)

অসাম্যের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ একটি মৌল ধারণা। কমিউনিজমের আতঙ্ক অপসৃত হলেও সাম্যের দাবি থামবে না। নতুন নতুন রূপে অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেবে। কমিউনিজম মরে গেলেও নতুন করে সমাজতন্ত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। জ্ঞানের সাধনা সম্পর্কে ইরানের একজন কবি যা বলেছেন মানুষে মানুষে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য :

রাহ রাঙা বা খাস্তাগি য়ে বাহ নিস্ত
ইশক হম রাহ আস্ত ও হাম খোদমনজিল আস্ত।

(যারা এ পথে চলে তারা কখনও ক্লান্তি জানে না–কারণ এ পথ একই সঙ্গে পথ ও গন্তব্য)।

## তথ্যসূত্র

১. Durant, Will, *Our Oriental Heritage* (New York: Simon and Schuster, 1963), p. 195

২. Basham, A. L., *The Wonder That Was India* (New York: Grove Press, Inc., 1954), p. 86

৩. Landes, David S., *The Wealth and Poverty of Nations* (New York: W. W. Norton and Company, 1998), p. 361

৪. Blaug, Mark, *Economic Theory in Retrospect* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 259-260

৫. Webster's *Compact Dictionary of Quotations* (Springfield: Merriam Webster, 1992), p. 287

৬. Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science* (London: Routledge, 1993), p. 272

৭. UNDP, *Human Development Report* (New York: Oxford University Press), p. 191

৮. Siddiqui, Kamal, et. al, *Social Formation in Dhaka City* (Dhaka: University Press Ltd., 1990), p. 213

৯. Gordon, Scott, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৫৭

১০. Thurow, Lester, *The Future of Capitalism* (London, Nicholas Brealey, 1996), p. 245

১১. Gordon, Scott, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২১৭

# লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি

ধান ভানতে শিবের গীত। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি আলোচনায় প্রথমেই আসছে বনলতা সেনের কথা। এদের সম্পর্ক নেহাত কাকতালীয় নয়। 'বঞ্চিতা নারী' বললেই সবার আগে আমার মনে পড়ে বনলতা সেনের কথা। বনলতার সাথে বঞ্চনার সম্পর্ক নিয়েই তাই আলোচনা শুরু করছি।

চণ্ডীদাসের রজকিনীর মত বনলতার প্রেম "নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়"। দেবদূতের মত তিনি পবিত্র, অনাঘ্রাত কুসুমের মত কোমল ও অপাপবিদ্ধ। পাখির নীড়ের মত চোখ আর বিদিশার নিশার মত কালো চুল নিয়ে এই শুদ্ধতম নায়িকা রোমান্টিক বাঙ্গালীদের মনের জগতে দেদীপ্যমান। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা তার অলোকসাধারণ রূপের বর্ণনা পাই; কিন্তু তাঁর সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাই প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কে এই বনলতা সেন?

অবশ্য শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ ধরনের সমস্যা মোটেও নতুন নয়। একই প্রশ্ন উঠেছে সেক্সপীয়ারের সনেটের কৃষ্ণ-রমণীকে নিয়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. এল. রোজ মনে করেন যে, এই কৃষ্ণ মহিলার নাম হলো এমিলিয়া লামিয়ের–যিনি ছিলেন ইতালীয় বংশ-উদ্ভূত একজন সঙ্গীতজ্ঞ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কৃষ্ণ-রমণী আসলে কালো নয়। কৃষ্ণ-রমণী ছিলেন একজন গ্রাম্য বালিকা; নীচ বংশ অর্থে "কৃষ্ণ" বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, আসলে তিনি মোটেও মহিলা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বালক। তেমনি তর্ক রয়েছে লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসাকে নিয়ে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মোনালিসা হলেন অপেরা গায়িকা লা গায়ো কোমডো। কিন্তু বিদেশের পণ্ডিতরা কৃষ্ণ-রমণী বা মোনালিসার সমস্যাকে যত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন বাঙ্গালী পণ্ডিতরা বনলতা সেনের পরিচয়ের সমস্যাকে আদৌ আমলেই আনেননি। জীবনানন্দ-গবেষক অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, "বরিশালে প্রথম যৌবনে হয়ত কোন নারীর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন জীবনানন্দ, যার নাম ছিল 'বনলতা' অথবা (এটাই গোপনস্বভাবী কবির পক্ষে বেশি সম্ভব) কবি তার নামকরণ করেছিলেন

বনলতা। 'সেন' উপাধি দিয়ে 'নাটোর' নামক তদানীন্তন রাজশাহী জেলার একটি অঞ্চলের অধিবাসী করে তাকে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট করেছিলেন।"[১] জীবনানন্দ-গবেষকদের বিশ্লেষণ পড়লে মনে হয়, নাটোরের বনলতা সেন নাটোরের না হয়ে বাংলার অন্য কোন শহরের হলে, অথবা তার নাম বনলতা সেন না হয়ে অন্য কিছু হলেও কবিতাটির বক্তব্যে কোন হেরফের হত না। যদিও আমি সাহিত্যের ছাত্র নই তবু এ সরলীকৃত ব্যাখ্যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। সরকারী চাকুরি সূত্রে রাজশাহীতে অবস্থানকালে নাটোরের প্রশাসকদের বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রশাসকদের দলিল দস্তাবেজ হতে দেখা যায় যে, এ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাটোর শুধু কাঁচাগোল্লা বা জমিদারদের জন্য বিখ্যাত ছিল না, নাটোর ছিল উত্তর বঙ্গের রূপাজীবাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। আমার কাছে মনে হয়, নাটোর বনলতা সেনের শুধু ঠিকানা নয়। "নাটোর" শব্দটির দ্বারা তার পেশা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেখলে বনলতা সেন নামটির তাৎপর্যও সহজে বোঝা যায়। সেন পদবী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সে ভদ্রবংশ উদ্ভূত। বনলতা বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোন সাধারণ নাম নয়। তার স্খলনের পর নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য সে হয়ত ছদ্মনাম নিয়েছে।

বনলতার এ পরিচয় কবিতাটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন দ্যোতনা দেয়। এখন আমরা বুঝতে পারি, বনলতা সেন কেন কবিকে "দু দণ্ডের শান্তি" দিয়েছিল, বুঝতে পারি কেন কবির অভিসার "নিশীথের অন্ধকারে" এবং "দূর অন্ধকারে"। এ পটভূমিতে দেখতে গেলে, "এতদিন কোথায় ছিলেন" একটি সাধারণ প্রশ্ন নয়। বনলতা সেন যেন বলতে চাচ্ছে যে, সে ইচ্ছে করে রূপাজীবার বৃত্তি গ্রহণ করেনি, তার জীবনে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে, সে দুঃসময়ে তার পাশে কেউ ছিল না। "এতদিন কোথায় ছিলেন" একটি সৌজন্যমূলক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে বিপর্যস্ত নারীত্বের আর্তনাদ। বনলতার পরিচয় পেলেই আমরা বুঝতে পারি কবি কেন কবিতার শেষে বলছেন "সব পাখি ঘরে ফেরে"। বনলতাদের সাথে দুদণ্ড সময় কাটালেও শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দদের (বিবাহিত পুরুষদের) লাবণ্যপ্রভাদের (স্ত্রীদের) কাছে ফিরে আসতে হয়। বনলতাকে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে প্রকাশ্যে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বনলতার কথা কাউকে বলারও উপায় নেই। বনলতাকে নীরবে নিভৃতে স্মরণ করতে হয় অপরাধবোধ নিয়ে। তাই কবি বলেছেন, "থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"। এ অন্ধকার প্রাকৃতিক নয়, এ অন্ধকার মানসিক। আমার জানা মতে নিষিদ্ধ প্রেমের আনন্দ ও বেদনা এত সুন্দরভাবে আর কোন কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

বয়স যখন কম ছিল তখন মনে হত পুরুষ-প্রধান সমাজে বনলতারাই হচ্ছে বঞ্চিত নারীত্বের সবচেয়ে করুণ উদাহরণ। পরে অমর্ত্য সেনের গবেষণার সাথে পরিচিত হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি যে বনলতাদের চেয়েও দুর্ভাগা এক শ্রেণীর নারী রয়েছে—যাদের তিনি নাম দিয়েছেন "নিরুদ্দিষ্ট নারী" (missing woman)।[২] বনলতারা তবু জীবনানন্দের

ভাষায় "ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক পেয়েছিলো", "হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি"। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট নারীরা জীবনে কিছুই পায়নি। বৈষম্যের শিকার হয়ে যে সব মহিলার জীবন অকালে ঝরে পড়েছে তাদেরই নিরুদ্দিষ্ট নারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রকট সে সব সমাজেই নিরুদ্দিষ্ট নারীর সংখ্যা বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মত উন্নত দেশে প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে ১০৫ জনের বেশি মহিলা রয়েছে। অথচ প্রতি ১০০ জন পুরুষ পিছু পাকিস্তানে ৯০ জন মহিলা রয়েছে; ভারতে আছে ৯৩ জন মহিলা; চীন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম এশিয়াতে ৯৪ জন মহিলা রয়েছে, এবং মিশরে রয়েছে ৯৫ জন। অবশ্য মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না, সামাজিক মূল্যবোধের উপরও নির্ভর করে। সাহারা অঞ্চলের আফ্রিকান দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক খারাপ। অথচ ঐ সব আফ্রিকান দেশে প্রতি ১০০ জন পুরুষ পিছু ১০২ জন মহিলা রয়েছে। যদি আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের অনুপাতে দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়াতে নারী থাকত তবে এসব অঞ্চলে বর্তমান জনসংখ্যার অতিরিক্ত কমপক্ষে দশ কোটি নারী জীবিত থাকত। এই ১০ কোটি নারীর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়াতে মহিলাদের মৃত্যুর হার উন্নত দেশসমূহের মহিলাদের মৃত্যু হারের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে অবহেলার জন্য এ সব দেশে মহিলা-শিশুর মৃত্যুর হার অত্যধিক।

বিবাহিত মহিলারা অবশ্য অমর্ত্য সেন অথবা আমার সাথে একমত হবেন না। তাঁদের মতে যে সব নারী নিখোঁজ হয়ে গেছেন বা সমাজের মূল স্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন শুধু তাঁরাই দুর্ভাগা নন, যাঁরা বিবাহিতা নারী তাঁদের দুর্ভাগ্যও কোন অংশে কম নয়। যুক্তরাজ্যের একজন বিবাহিত মহিলা ১৯৮৬ সালে পত্রিকায় চিঠি লেখে বিবাহিত জীবনের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পত্রটি নিম্নরূপ :[৩] "প্রিয় সম্পাদক মহোদয়, গত ৩৫ বছরে আমি চব্বিশ ধরনের কাজ করেছি। গৃহরক্ষক, পাচক, ঝাড়ুদার, গাড়ি চালক, মায়ের সহায়তাকারিণী, কুকুরের পরিচর্যাকারী, ধোপা, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচারক, বুটপলিশকারী, জানালার ঝাড়ুদার, দর্জি, আসবাবপত্র-মেরামতকারী, মালী, রাজমিস্ত্রী, রঙের মিস্ত্রী, শোভাকার, পলেস্তারার মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, পানির মিস্ত্রীর মেট, সাঁটলিপিকার, মুদ্রাক্ষরিক, টেলিফোন গ্রহণকারী, অভ্যর্থনাকারী, হিসাব রক্ষক, গাড়ি পার্কের পরিচালক। এ সব কাজই করেছি একজন বসের জন্য– যিনি আমার স্বামী।" এ চিঠি পড়ে একজন বাঙ্গালী মহিলা মন্তব্য করেছেন যে, এ ইংরেজ মহিলার তবু কপাল ভালো যে তিনি যা কিছু করেছেন শুধু স্বামীর জন্য করেছেন; কিন্তু তিনি বাঙ্গালী শ্বাশুড়ি দেখেননি। যদি বাঙ্গালী শ্বাশুড়ির পাল্লায় একবার পড়তেন এত সব কথা লেখার ফুরসত বা স্বাধীনতাও হয়ত পেতেন না। প্রায় দু'শ বছর আগে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও

সমভাবে প্রযোজ্য: "বিয়ের আগে দু'চোখ খোলা রেখো। বিয়ের পর চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত করে রেখো।" চোখ খোলা রাখলে অনেক বিয়েই ভেঙ্গে যাবে।

বিবাহিত মহিলা থেকে রূপাজীবা, নিরুদ্দিষ্ট মহিলা থেকে কর্মরত মহিলা–সকল মহিলার জীবনেই যে বঞ্চনা দেখা যাচ্ছে তা মোটেও নতুন নয়। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন চীনে মহিলাদের জীবন ছিল আরও দুর্বিষহ। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে নারীদের প্রকৃতিই হল পৃথিবীতে পুরুষদের কলুষিত করা। তাই নারীদের সব সময়ে পুরুষদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। মনু বলেছেন "কোন বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাদের নিজের বাড়িতেও স্বাধীনভাবে কিছু করতে দেওয়া ঠিক হবে না। বাল্যে নারী থাকবে পিতার নিয়ন্ত্রণে, যৌবনে স্বামীর, এবং স্বামী মারা গেলে পুত্রদের নিয়ন্ত্রণে। তাকে কোন স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হবে না। কোন নারীকেই পিতা, স্বামী বা পুত্রদের থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করতে দেওয়া ঠিক হবে না, কেননা এতে তার নিজের ও স্বামীর পরিবারকে হেয় করা হবে।"[৪] চীন দেশে নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। হাজার বছর আগে চীনা কবি ফু সোয়ান (Fu Hsuan) মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন[৫]:

How sad it is to be a woman
Nothing on earth is held so cheap
Boys stand leaning at the door
Like Gods fallen out of heaven.
Their hearts brave the four oceans,
The wind and dust of a thousand miles.
No one is glad when a girl is born
By her the family sets no store.
when she grows up she hides in her room,
Afraid to look a man in the face.
No one cries when she leaves her home
Sudden as clouds when the rain stops.
She bows her head and composes her face
Her teeth are pressed on her red lips
She bows and kneels countless times.

(নারী হওয়া কত দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে আর কিছুই এত সস্তা নয়। স্বর্গ হতে আগত দেবতার মত ছেলেরা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তাদের হৃদয় সাত সমুদ্র তুচ্ছ করে–উপেক্ষা করে হাজার মাইলের ধূলির ঝড়। মেয়ের জন্ম হলে কেউই খুশি হয় না–পরিবার তার জন্য কিছু জমিয়ে রাখে না। যখন সে বড় হয় সে তার কক্ষে লুকিয়ে থাকে–কোন পুরুষের দিকে তাকাতে ভয় পায়। যখন সে বৃষ্টি শেষের মেঘের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যায়–কেউ

তার জন্য কাঁদে না, সে তার মাথা নীচু রাখে, চেহারা থাকে শান্ত। তার লাল ঠোঁটে দাঁত খিঁচিয়ে রাখে, সে অজস্রবার মাথা নীচু করে ও নতজানু হয়।")

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শুধু বিংশ শতাব্দীর বনলতা সেনরাই নয়—বেশিরভাগ সময়ে অধিকাংশ দেশেই নারীরা শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। শোষিতরা শোষকদের বিরুদ্ধে সব সময়েই বিদ্রোহ করেছে—মার্কসবাদের এই বক্তব্য নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শত নিপীড়ন সত্ত্বেও নারীরা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেনি। বরং আজকে আমাদের কাছে যা দুঃসহ বৈষম্য বলে মনে হয়—তা নীরবে নতশিরে মেনে নিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, নগ্ন অত্যাচার সত্ত্বেও মহিলাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ হল মনস্তাত্ত্বিক। পুরুষরা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যাতে মহিলাদের আদৌ অত্যাচারের কথা মনে হয়নি। স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে তারা ছিল পরিতৃপ্ত। তাদের কাছে তাই নিজেদের বিধাতার শক্তির অপচয় বলে মনে হয়নি। ধর্ম তাদের শিখিয়েছে, এই বঞ্চনার মধ্যেই তাদের মুক্তি। বাইবেলে বলা হয়েছে[৬]:

> To the woman he said, "I will greatly multiply your pain in child bearing, in pain you shall bring forth children, yet your desire shall be for your husband and he shall rule over you.
>
> (নারীদের তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রসব বেদনা অনেক বাড়িয়ে দেব, বেদনার মধ্যে তোমাদের প্রসব হবে তবু তোমরা স্বামীদের চাইবে এবং স্বামী তোমাদের শাসন করবে।)

হিন্দু ধর্ম হতে কনফুসিয়াসবাদ—সর্বত্রই ধর্ম ও আদর্শবাদ পুরুষের শোষণকে মহিমান্বিত করেছে। তবে জীববিজ্ঞানীদের মতে পুরুষদের শোষণের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক বা আদর্শগত নয়। এর পেছনে রয়েছে জৈব তাড়না। অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানব-সন্তানদের পিতামাতার উপর অনেক বেশি সময় ধরে নির্ভরশীল থাকতে হয়। জৈব তাড়নার ফলে পুরুষ বহুবল্লভায় আসক্ত। পুরুষ পরিবারের বন্ধন থেকে বের হয়ে আসতে চায়। তাই শত অবমাননা সত্ত্বেও সন্তানদের মানুষ করার জন্য নারীদের পুরুষদের বন্ধনে আটকে রাখতে হয়। নারীর আত্মত্যাগ ছাড়া মনুষ্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তবু প্রশ্ন ওঠে যে, এত উৎপীড়ন এত দিন যারা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে আজ কেন তারা সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে? সমাজবিজ্ঞানী ফুকুইয়ামার মতে এর দুটো কারণ রয়েছে।[৭] প্রথমত, নারীদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। এক সময় মেয়েদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা ৫৫ হতে ৬০ বছরে সীমাবদ্ধ ছিল। ৩০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সে যে সন্তান জন্ম নিত তার সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী (অর্থাৎ ২৫ বছর যদি সন্তানের আত্মনির্ভরতার বয়স হিসাব করা হয়) হতে হতে তাদের মায়েদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যেত। আজকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে মেয়েদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা প্রায় ৮০ বৎসর। এর ফলে এদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন

অবস্থায় থাকতে হয়। কাজেই নারীদের জন্য পারিবারিক বাধ্যবাধকতা কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, অতীতে মেয়েদের নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ ছিল সীমিত। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সহজ হওয়ার ফলে মেয়েদের পক্ষে তাদের ইচ্ছামত সন্তান নেওয়ার ক্ষমতা জন্মেছে। আজকের মেয়েরা তাই পরিবারের নামে যে কোন অত্যাচার সহ্য করতে রাজি নয়।

নারীদের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী ইতিহাসের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলনই শুধু জোরদার হয়ে ওঠেনি, নারীরা ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠছে, বিংশ শতাব্দীতে নারীদের মর্যাদা কি সত্যি সত্যি বেড়েছে? অনেকে মনে করেন যে, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া সম্ভব। আবার অনেকে মনে করেন যে, প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর। এ প্রসঙ্গে অনেকেই জনৈক নৃতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে থাকেন। এই নৃতত্ত্ববিদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বার্মার গ্রামাঞ্চলে গবেষণা করেন। তখন তিনি দেখতে পান যে মেয়েরা পুরুষদের পেছনে হাঁটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি বার্মাতে গিয়ে দেখেন যে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা পুরুষদের সামনে হাঁটছে। নৃতত্ত্ববিদ ভাবলেন যে, বার্মাতে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, তাই মহিলারা পুরুষদের পেছনে না হেঁটে সামনে হাঁটছে। কিছুদিন পর তিনি একজন পুরুষের কাছে এত বড় বিপ্লবের কারণ জানতে চাইলেন। পুরুষটি তাকে বলল যে, জাপানীরা পিছু হটার সময় অনেক মাইন পুঁতে গেছে; তাই পুরুষরা সামনে না গিয়ে মহিলাদের সামনে হাঁটতে বাধ্য করছে। মহিলারা পুরুষদের সামনে হাঁটলেও গ্রামাঞ্চলে বার্মার মহিলাদের সামাজিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে সাধারণত বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ১৯৬০ হতে ১৯৮০ সময়কালে দশটি শিল্পোন্নত দেশে নারীদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু উপাত্ত সারণী-১-এ দেখা যাবে।

**সারণী-১**

**দশটি শিল্পোন্নত দেশে নারীদের আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তন: ১৯৬০-১৯৮০**

| দেশ | নারীদের শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহণের হার (শতাংশ) | | নারী ও পুরুষদের আয়ের অনুপাত (শতাংশ) | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬০ | ১৯৮০ | ১৯৬০ | ১৯৮০ |
| অস্ট্রেলিয়া | ২৯.৫ | ৫৫.৪ | ৫৯ | ৭৫ |
| ব্রিটেন | ৪৩.৪ | ৬২.৩ | ৬১ | ৭৯ |
| কানাডা | ২৭.৯ | ৫০.৪ | ৫৯ | ৬৪ |
| ফ্রান্স | ৪৪.৫ | ৫৭.০ | ৬৪ | ৭১ |
| জার্মানি | ৪৬.৫ | ৫৬.২ | ৬৫ | ৭২ |
| ইতালী | ৩৫.২ | ৩৯.৯ | ৭৩ | ৮৩ |
| জাপান | ৪৭.৭ | ৫২.৭ | ৪৬ | ৫৪ |
| সুইডেন | ৫১.০ | ৭৬.৯ | ৭২ | ৯০ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩৭.৮ | ৫১.৩ | ৬৬ | ৬৬ |
| রাশিয়া | ৭৭.৪ | ৮৮.২ | ৭০ | ৭০ |

সূত্র : Gunderson, Morley, "Male-Female Wage Differentials and Policy Responses," *Journal of Economic Literature,* March 1989. Vol. XXVII, pp. 46-49.

সারণী-১ হতে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশসমূহে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার অতি দ্রুত বেড়ে চলছে। ১৯৬০ সালে দশটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের সর্বনিম্ন হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ হার ছিল ৭৭.৪ শতাংশ। ১৯৮০ সালে সর্বনিম্ন হার ৩৯.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, সর্বোচ্চ হার দাঁড়িয়েছে ৮৮.২ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের আয় পুরুষদের আয়ের অনুপাত হিসাবে বেড়েছে। তবে এখনও মহিলারা পুরুষদের সমান আয় করতে পারছে না। ১৯৮০ সালে সুইডেনে মহিলারা পুরুষদের আয়ের ৯০ শতাংশ অর্জন করতে সমর্থ হয়। ১৯৬০ সালে সর্বোচ্চ অনুপাত ছিল ৭৩ শতাংশ। তবে জাপানে মহিলাদের আয় পুরুষদের তুলনায় সবচেয়ে কম। ১৯৬০ সালে জাপানে এই অনুপাত ছিল ৪৬ শতাংশ, ১৯৮০ সালে এই হার ৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উপরোক্ত উপাত্ত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের আর্থিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মহিলাদের আর্থিক অবস্থানে উন্নতির অনুমান সমর্থন করেন না। তাঁদের বক্তব্য হল যে সারণী-১-এর উপাত্ত সঠিক হলেও, নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন বিশ্লেষণের জন্য এ সব উপাত্ত

যথেষ্ট নয়। এ প্রতিবাদী বক্তব্যের প্রধান প্রবক্তা হলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ভিক্টর আর ফুক্‌স (Victor R. Fuchs)।[৮] তিনি স্বীকার করেন যে, মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বেড়ে গেছে। তিনি এ কথাও স্বীকার করেন যে, পুরুষ ও মহিলার মজুরির মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা হ্রাস পেয়েছে। তবু তিনি মনে করেন যে, এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও মহিলাদের জীবনকুশলতার (well-being) অবনতি ঘটেছে। তিনি মনে করেন যে, মেয়েদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বা মজুরির হার দেখাই যথেষ্ট নয়, মহিলাদের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থান দেখতে হবে। তিনটি বিষয়ে নারীদের আর্থিক অবস্থানে অবনতি দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অবসর কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিতদের সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই পরিবারের যৌথ আয়ের তুলনায় অবিবাহিত মহিলাদের আয় কমেছে। তৃতীয়ত, পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের লালন পালনের দায়িত্ব অবিবাহিত মায়েদের উপর পড়ছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে মহিলাদের জীবনকুশলতার উন্নতি হয়নি। দারিদ্র্যের মহিলায়ন (feminization) ঘটেছে। এই প্রতিবাদী বক্তব্য স্বীকার করে নিলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহে অন্তত একটি ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে আছে, তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে। দক্ষিণ এশিয়ার মত উন্নয়নশীল অঞ্চলে মহিলাদের অবশ্য এ সান্ত্বনাও নেই। বাংলাদেশে একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নীরব হিংস্রতা বিরাজ করছে। বেটসি হার্টম্যান ও জেমস বয়েসের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পল্লীঅঞ্চলে মহিলারা শোষিত হচ্ছে। তাঁদের বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক – মহিলারা সব শেষে খেতে বসে এবং সবচেয়ে কম খাওয়া পায়।[৯] বাংলাদেশে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ২৯% কম ক্যালরি পেয়ে থাকে।

পৃথিবীর কোথাও নারীরা পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে সুইডেনে মহিলাদের অবস্থান সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। তবু সুইডেনে মহিলারা উন্নয়নের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ পিছিয়ে আছে। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সমস্যা একদিকে যেমন অতি পুরাতন তেমনি ব্যাপক ও জটিল। তার সমাধান নিয়েও তাই অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে ঐকমত্য নেই। এ ক্ষেত্রে চার ধরনের মতবাদ দেখা যায় : বৈপ্লবিক, নব্যরুপদী, আমূল-সংস্কারপন্থী ও অধিকারপন্থী। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী ভোটাধিকার আন্দোলনে। আঠারো শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এডামসের স্ত্রী তাই দাবি করেছিলেন:

> If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation.

(যদি মহিলাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয়, আমরা বিদ্রোহ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ এবং যে সব আইনে আমাদের কোন ভূমিকা বা প্রতিনিধিত্ব নেই সে সব আইন মানতে আমরা বাধ্য নই।)

ভোটাধিকার আন্দোলন এক শ' বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। এ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাতারাতি কোন বিপ্লব সম্ভব নয়।

নব্যধ্রুপদী অর্থনীতির একটি পূর্বানুমান (assumption) হল এই যে, মজুরির হার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদে মহিলাদের বঞ্চনার সম্ভাবনা নেই, তারা তাদের ন্যায্য মজুরিই পাবে। যদি মহিলা ও পুরুষের মজুরি সমান না হয় তা হলে তার দু'ধরনের কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, শারীরিক অথবা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল। এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলাদের পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে শারীরিক বা মানসিক কোন দিক দিয়েই এগিয়ে নেই। নারী-পুরুষের আয়ের বৈষম্যের কারণ হল নিয়োগকর্তারা অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মহিলারা পুরুষের সমকক্ষ হলেও তারা মহিলাদের সমান গণ্য করে না। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ গ্যারি এস বেকার।[১০] বেকারের মতে উৎপাদকরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে না। বৈষম্যের কারণ হল নারীদের প্রতি তাদের মানসিক বিতৃষ্ণা। মানসিক সন্তোষের জন্য আর্থিক ক্ষতি করেও তারা বৈষম্য করে থাকে। এ ধরনের আচরণ শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই বৈষম্য দূর করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন করেও লিঙ্গভিত্তিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমূল সংস্কারপন্থী (radical) অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে মহিলারা কম শিক্ষিত বা কম উপযুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পান না। পুরুষদের সমান যোগ্যতা থাকলেও তারা পুরুষদের সমান সুযোগ পায় না। তার কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক। তাঁদের মতে দেশের সকল শ্রমিক একই শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণ করে না। শ্রমের বাজার হলো খণ্ডিত (segmented)। দেশে অনেক ছোট ছোট শ্রমের বাজার রয়েছে। খণ্ডিত শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পুরানো ছাত্রদের চক্র (Old boy network)। যারা ইতোমধ্যে চাকুরিতে আছে তারা শুধু তাদের মত পুরুষদেরই (যেমন একই বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলের ছাত্রদের) নতুন নিয়োগ দান করে। তারা ভিন্ন ধরনের বা অভিজ্ঞতার লোক নিয়োগ করতে চায় না। কাজেই যে সব শ্রমের বাজার পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে নানা বাহানা তুলে মহিলাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিভিন্ন শ্রমের বাজারে পুরুষদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে হলে পরোক্ষ কোন ব্যবস্থা কাজ করবে না, গ্রহণ করতে

হবে ইতিধর্মী কার্যক্রম (Affirmative Action Programme)। মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না, এ ধরনের আইন করাই যথেষ্ট নয়। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন চাকুরিতে কোটা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ইতিবাচক ব্যবস্থার কর্মসূচী তিনটি কারণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।[১১] প্রথমত, মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার বেড়ে যাওয়াতে সস্তায় নিম্নপর্যায়ের চাকুরিতে মহিলাদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। তাই কোটার ঝামেলা এড়ানোর জন্য নিয়োগকারীরা মেয়েদের সবচেয়ে খারাপ চাকুরি দেয়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের চাকুরির সংখ্যা বেড়ে গেলেও অধিকতর শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়নি। দ্বিতীয়ত, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ইতিবাচক ব্যবস্থার যথাযথ পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। তৃতীয়ত, শ্বেতাঙ্গরা মনে করে যে ইতিধর্মী কার্যক্রম শ্বেতাঙ্গদের ও পুরুষদের জন্য উল্টো ধরনের বৈষম্য (reverse discrimination) সৃষ্টি করেছে কেননা "কোটার" জন্য অধিকতর মেধা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গরা চাকুরি পাচ্ছে না। ইতিধর্মী কার্যক্রম সাদা ও কালোদের এবং মহিলা ও পুরুষদের সম্পর্কে তিক্ত করে তুলছে।

মহিলাদের অধিকারপন্থী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন অমর্ত্য সেন।[১২] তিনি মনে করেন যে, বাইরে থেকে কেউ নারীকুলের জীবনকুশলতা বাড়াতে পারবে না, নারীজাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নারীগণকে নিজেদের নেতৃত্ব দিতে হবে। দর্শনের বুলিতে অধ্যাপক সেন এর নাম দিয়েছেন, "নারীদের এজেন্সি।" সাধারণত "এজেন্সি" শব্দটি প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দর্শনের ভাষায় এজেন্সির অর্থ হলো নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করার কর্তৃত্ব। নারীদের ইচ্ছামত কাজ করার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে দু'ধরনের মতবাদ আছে : আদর্শ ভিত্তিক ক্ষমতায়ন ও বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন। আদর্শ-ভিত্তিক ক্ষমতায়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃত হলেন ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ্ পাওলো ফ্রিয়েরে। চেতনার বিকাশের মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা ও সমর্থন করাই ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের চিন্তার বিকাশ সম্ভব। কিন্তু উপর থেকে সরকারের অর্থ ব্যয় করে চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। ক্ষমতায়ন উপর থেকে চাপানো যায় না। ক্ষমতায়ন তৃণমূল থেকে সঞ্চারিত হতে হবে। কাজেই বাইরের চেতনাউদ্দীপক দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অবহেলিত জনগোষ্ঠীসমূহের "পারস্পরিক ক্ষমতায়ন"। এদের একে অপরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। অধ্যাপক সেন অবশ্য বস্তুবাদী ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন। বস্তুবাদী ক্ষমতায়নের প্রধান উপাদান পাঁচটি : (১) নারীদের শিক্ষা, (২) নারীদের সম্পত্তির মালিকানা, (৩) নারীদের কাজের সুযোগ, (৪) শ্রম বাজারে নারীদের অবস্থান ও (৫) নারীদের চাকুরি সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মনোভাব। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে চারটি উপাদানের (আইন সভায় মহিলা সদস্যের হার, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক পদে মহিলাদের হার, পেশাদার ও কারিগরী কাজে

মহিলাদের হার ও মোট আয়ে নারীদের হিস্‌সা) যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাপের (Gender Empowerment Measure) প্রাক্‌কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্‌কলন অনুসারে বাংলাদেশে নারীরা ভারত ও পাকিস্তানের নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। মুসলমান-প্রধান দেশসমূহের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন সূচক অনুসারে সর্বোচ্চ স্থান মালয়েশিয়ার, দ্বিতীয় স্থান ইন্দোনেশিয়ার এবং তৃতীয় স্থান বাংলাদেশের।[১৩] কিন্তু ক্ষমতায়নের পরিমাপে বাংলাদেশের নারীদের স্থান উঁচু হলেও এখনও বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ দেশের তুলনায় কম।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যই প্রয়োজন নয়। অবহেলিত নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে জন্মশাসন অধিকতর সফল হয়। নারী শিক্ষার হার বেড়ে গেলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমে যায়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি সৃজনশীল ও দায়িত্ববান। বাংলাদেশে অধিকাংশ মহিলা ঋণের টাকা ফেরত দেয় কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ দেয় না। বাংলাদেশে মহিলারা অতি সামান্য ঋণ নিয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ভারতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলে জনসংখ্যাতে মহিলাদের অনুপাত বেশি সে সব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম অপরাধ সংঘটিত হয়।[১৪] উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য নারীদের উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নের সবচেয়ে সহজ পথ। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছেঃ "Human Development, if not engendered, is endangered." (লিঙ্গভিত্তিক না হলে মানব উন্নয়ন বিপন্ন হবে।)

## তথ্যসূত্র

১. দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, *আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত*, (ঢাকাঃ প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ১৮-১৯

২. Sen, Amartya, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), pp. 104-107

৩. Johnson, Eric W., *A Treasury of Humor* (New York: Ivy Book, 1980), p. 43

৪. Doniger, Wendy and Smith, Brian K., tr., *Laws of Manu* (New Delhi: Penguin Books of India), p. 115

৫. Durant, Will, *Our Oriental Heritage* (New York: Simon and Schuster, 1963), pp. 793-794

৬. *The Bible* (Genesis 3:16)

৭. Fukuyama, Francis, *The Great Disruption* (New York: Free Press, 1999), pp. 92-111

৮. Fuchs, Victor R., "Women's Quest for Economic Equality", *The Journal of Economic Perspectives*, Winter 1989, Vol. III. No.1. pp. 25-42

৯. Hartman, Betsy and Boyce, James, *A Quiet Violence* (Delhi: Oxford University Press, 1983), p. 82

১০. Becker, Gary S., *The Economics of Discrimination* (Chicago : University of Chicago Press, 1957)

১১. Leonard, Jonathan S., "Women and Affirmative Action", *The Journal of Economic Perspectives*, Winter 1989. vol. III. No. I, pp. 61-76

১২. Sen, Amartya, প্রাগুক্ত, pp. 189-209

১৩. UNDP, *Human Development Report*, 1995 (New York: Oxford University Press, 1995), pp. 84-85

১৪. Sen, Amartya, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০০

১৫. UNDP, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১

# খোলা ম্যানহোলের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অর্থনীতিবিদ্‌রা সব কিছুরই বাজারদর জানেন, কিন্তু কোন কিছুরই মূল্য বোঝেন না– এ অভিযোগ সকল ক্ষেত্রে সত্য না হলেও শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে যারা জীবনকুশলতা পরিমাপ করতে চান তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। স্থূল জাতীয় আয় নির্ভুল গাণিতিক সংখ্যা নয়–অনুমান-নির্ভর আসন্ন-মান মাত্র। এর ভিত্তিতে এক দেশের জনগণের জীবনকুশলতা অন্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা মোটেও সঙ্গত নয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে এ বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে। যদি মজুরির বিনিময়ে মহিলারা গৃহস্থালির কাজ করে তবে তা জাতীয় উৎপাদে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কন্যা জায়া জননীরা হাসিমুখে বিনা বেতনে উদয়াস্ত যে পরিশ্রম করে তা জাতীয় আয়ের হিসাবে আসে না। একজন অর্থনীতিবিদ্ তাই বলেছেন, যদি বাড়ির কর্তা চাকরানীকে বিয়ে করে তবে তাতে শুধু সামাজিক কেলেঙ্কারিই হবে না, তা হবে বড় ধরনের অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি। বিয়ের আগে চাকরানীর পারিশ্রমিক জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হত। বিয়ের পরে নতুন গিন্নি অর্থাৎ প্রাক্তন চাকরানী যদি নিজের সংসারে একই কাজ (অথবা ভালবেসে আরও বেশি কাজ) করে তবু তা জাতীয় উৎপাদে গণনা করা হবে না। চাকরানীর বিয়ের আগে ও পরে বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অপরিবর্তিত থাকলেও, চাকরানীর বিয়ের পর অর্থনীতির খামখেয়ালি নিয়মের ফলে জাতীয় আয় কমে যাবে। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ শতাংশ নারী শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করে, পক্ষান্তরে বাংলাদেশে মাত্র ২.৫ শতাংশ নারী আনুষ্ঠানিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করে, কিন্তু বাংলাদেশে মহিলাদের অবদান জাতীয় আয়ে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে তাই জাতীয় আয়ের অবপ্রাক্কলন (underestimate) করা হয়। যদি অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ৪০ শতাংশ নারী কাজ করে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশের

পুরুষদের ৫০ শতাংশ মাত্র, তবু বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের হিসাব কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশে দেশে দ্রব্যমূল্যের প্রভেদ রয়েছে। সাধারণত যে সব দেশে মাথাপিছু আয় উঁচু সে সব দেশের জিনিষের দামও বেশি। ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে জাতীয় আয় সংশোধন না করা হলে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় জীবনকুশলতার তুলনা অন্তঃসারশূন্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৯-২০০০ সনের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন (World Development Report) হতে দেখা যায় যে, দ্রব্যমূল্যের সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে তিনগুণ বাড়াতে হবে।[১] শুধু ক্রয় ক্ষমতার সমতা ও নারীদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশোধন করা হলে, বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ১৯৯৮ সালে ৩৫০ ডলার হতে ১৪০০ ডলারে উন্নীত হবে।

সমস্যা শুধু হিসাবের নয়। হিসাব সঠিক হলেও মাথাপিছু আয় দেখে সমাজের ধন বণ্টন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। যে সমাজে ধন সম্পদ বণ্টনে চরম অসাম্য রয়েছে সেখানে মাথাপিছু আয় বেশি হলেও দরিদ্রের অনুপাত বেশি হতে পারে। অর্থনীতিবিদ্গণ এখন একমত যে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের প্রকৃত সূচক নয়। কিন্তু এর বিকল্প সম্পর্কে কোন সর্বস্বীকৃত সমাধান এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মরিস ডি মরিস মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তে গড় আয়ুর প্রত্যাশা, শিশু মৃত্যুর হার ও সাক্ষরতার হারের যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে "জীভৌসূ" (জীবনযাত্রার ভৌতমানের সূচক - Physical Quality of Life Index) পরিমাপের চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী মাথাপিছু আয়, গড় আয়ুর প্রত্যাশা ও সাক্ষরতা হারের সূচকের ভিত্তিতে "মাউসূ" (মানব উন্নয়ন সূচক - Human Development Index) প্রচলন করে।[২] কেউ কেউ "মাদসূকে" (মানব দারিদ্র্য সূচক - Human Poverty Index) অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে উন্নয়নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূচক হল "সঅপ" (সক্ষমতার অভাবের পরিমাপ - Capability Poverty Measure)। কিন্তু কোন সূচকই নিখুঁত নয়, কাজেই সূচক নিয়ে কোন ঐকমত্য সম্ভব হয়নি।

আমি অবশ্য মনে করি যে, উন্নয়নের সূচক পরিমাপ করা এত জটিল কাজ নয়। আমি অতি সহজ সূচক ব্যবহার করে অনেক ভাল ফল পেয়েছি। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ দেখে এলে বন্ধুবান্ধবরা জানতে চায়, দেশটি বাংলাদেশের তুলনায় বেশি না কম উন্নত। এ প্রশ্নের জবাব আমি আমার নিজস্ব সূচকের ভিত্তিতে দিয়ে থাকি। যখনই আমি কোন বিদেশী শহরে যাই তখনই আমি রাস্তায় ম্যানহোলের কত ঢাকনা রয়েছে তা হিসাব করার চেষ্টা করি। যদি কোন শহরে শতকরা দশ ভাগের কম ঢাকনা থাকে তবে সে দেশটিকে বাংলাদেশ থেকে অনুন্নত গণ্য করি। যদি শতকরা দশ ভাগের বেশি ম্যানহোলের ঢাকনা থাকে তবে দেশটিকে বাংলাদেশের চেয়ে উন্নত বলে মনে করি। আমার বন্ধুবান্ধবরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমার মৌলিক অবদান মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। তবে তাঁরা বলে থাকেন যে, আমি নেহাত শহরের বাইরে যাই না, তাই আমার সূচক নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে না। গ্রামে ম্যানহোল নেই। কাজেই গ্রামাঞ্চলে আমার সূচক অচল।

আমি অবশ্য তাঁদের বলে থাকি, গ্রামে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু অন্য অবকাঠামো রয়েছে। যদি অবকাঠামো (যেমন ধরুন বিদ্যুৎ) সঠিকভাবে কাজ করে তবে সে দেশ উন্নত। যদি অবকাঠামো কাজ না করে সে দেশ হল অনুন্নত। উন্নত দেশ হলে স্কুলে ক্লাসের সময় ক্লাস হবে, কিন্তু অনুন্নত দেশের বিদ্যালয়ে ক্লাসের সময় ক্লাস ছাড়া অন্য কিছু হবে। উন্নত দেশ হলে চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা হবে; উন্নয়নশীল দেশে হাসপাতাল থাকলে ডাক্তার নেই, ডাক্তার থাকলে ঔষধ নেই, ঔষধ ও ডাক্তার থাকলেও ইউনিয়নের হাঙ্গামায় চিকিৎসা হয় না। উন্নয়নশীল দেশে টেলিফোনের তার চুরি হয়ে যায়, মেরামতের অভাবে সড়ক চলাচলের অযোগ্য হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল দেশেই সরকারের যোগ্যতার অভাব রয়েছে। মার্কিন রসিক উইল রজার্স তাই লিখেছেন, "I don't make jokes. I just watch the government and report the facts"।[৩] (আমি কৌতুক বানাই না। আমি সরকারের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করি এবং আমার বিবরণে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করি।) ভাগ্যিস উইল রজার্স বাংলাদেশে জন্মাননি। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সরকারের কর্মকাণ্ড দেখে উইল রজার্সের পক্ষেও হালকা রসিকতা সম্ভব হত না। আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি দেখলে উইল রজার্সকেও বিদ্রোহী কবির মত লিখতে হত:

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ক্ষেপে যাওয়ার মত সামান্য কয়েকটি তথ্য নীচে পেশ করছি।

- বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসাব অনুসারে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতির অনুপাত হল ৩০ শতাংশ।[৪] নেদারল্যান্ডে এই হার মাত্র চার শতাংশ। উচ্চ আয়ের দেশসমূহে সামগ্রিক ব্যবস্থার ক্ষতির গড় হার হল ছয় শতাংশ। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ভারিত গড় (weighted average) হার মাত্র ৮ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশসমূহে গড়ে এই ক্ষতির হার মাত্র ১২ শতাংশ। এর মধ্যে কারিগরী ক্ষতি ও মনুষ্য সৃষ্ট ক্ষতি অথবা বিদ্যুৎ চুরি অন্তর্ভুক্ত। যদি উন্নয়নশীল দেশের গড় হারের সবটুকুকেই কারিগরী ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হয় তবে উৎপাদিত বিদ্যুতের কমপক্ষে ১৮ শতাংশ বাংলাদেশে চুরি হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ দেশে সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি (system loss) বাংলাদেশের চেয়ে কম। বাংলাদেশের একমাত্র সান্ত্বনা হল, পৃথিবীতে আরও আটটি দেশ আছে যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে এই ক্ষতির হার বেশি। যথা বেনিনে এই ক্ষতির হার হল ৮৭ শতাংশ।
- বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের সাথে শ্রেণীকক্ষে যত কম সময় কাটান তেমনটি পৃথিবীর খুব কম দেশেই ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চীনে বছরে ১২৩৫ ঘণ্টা ক্লাস হয়; ইন্দোনেশিয়াতে ১১০০ ঘণ্টা ক্লাস হয়;

আর বাংলাদেশে মাত্র ৪৪৪ ঘন্টা ক্লাস হয়।[৫] বাংলাদেশে তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণীতে শতকরা ৪৭ ভাগ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ হতে ২০ শতাংশ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ক্লাস হয় না। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বিদ্যা অর্জন করতে তিন বছর যথেষ্ট হওয়া উচিত তা অর্জন করতে বাংলাদেশে পাঁচ বছর লাগে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাতে কমপক্ষে ৪০ ভাগ সম্পদ অপচয় হচ্ছে। শুধু সরকারের অর্থেরই অপচয় হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে শিশুদের সময় এবং তাদের বাপ মায়ের বিনিয়োগ। মাত্র ৩৭.৮ ভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজে কি ঘটছে তা হিসাব করার জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন নেই, খবরের কাগজ খুললেই সেখানে কি ঘটছে দেখা যাবে। নকলবাজিতে বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকরা অনায়াসে বিশ্বে চ্যাম্পিয়নশীপ দাবি করতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশের শিক্ষা খাত সমীক্ষার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নকলবাজি হল সুসংগঠিত ও নির্লজ্জ।

- ১৯৯৫ সালে পরিচালিত সমীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে যে, কোন থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কখনও শতকরা ১০০ ভাগ ডাক্তার হাজির থাকেন না। অফিসের সময়ে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৪.২৯ শতাংশ হতে ৫৭.১৪ শতাংশ ডাক্তার হাজির থাকে। অফিস সময়ের পর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গড়ে ১১.১ শতাংশ হতে ২২.২ শতাংশ ডাক্তার পাওয়া যায়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ডাক্তাররা পয়সা কামাই করার জন্য রোগীদের ভয় দেখিয়ে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করেন। বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তাররা গড়ে ২.৫৭ মিনিটে একজন রোগী দেখেন।[৬] এ খবর পেলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও মূর্ছা যাবেন।
- বাংলাদেশে পরিবহনের একটি সমীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থার মাত্র ৫ শতাংশ ভাল অবস্থায় রয়েছে। সড়ক ব্যবস্থার ৭৮ শতাংশ মোটেও সন্তোষজনক নয়, কোন মতে ব্যবহার করা যায়।[৭] বাকি ১৭ শতাংশ হল ব্যবহারের অনুপযুক্ত। গ্রামাঞ্চলে অনেক রাস্তা গ্রীক রূপকথার পেনিলোপির জালের মত। পেনিলোপি সারাদিন যে জাল বুনতেন, রাত্রে তা খুলে ফেলতেন। বাংলাদেশে বহু রাস্তা প্রতিবছর শীতকালে নির্মিত হয়, বর্ষাকালে ধুয়ে মুছে যায়, পরবর্তী শীতে আবার নির্মিত হয়।
- শহরাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রচুর অপচয় ঘটছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে খুলনা শহরে সরবরাহকৃত পানির ৭৮ শতাংশ নষ্ট হয়। আরেকটি মফস্বল শহরে হিসাব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, ৫৪ হতে ৬৪ শতাংশ পানি অপচয় হচ্ছে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে সব নলকূপ বসানো হয়েছে তার মাত্র ৪০ শতাংশ ঠিকভাবে কাজ করে, ৩০ শতাংশ একেবারে অকেজো; আর ৩০ শতাংশ কখনও কখনও কাজ করে।[৮] হস্তচালিত নলকূপের ২০ শতাংশ একেবারেই কাজ করে না।

প্রায় ৫০ শতাংশ হস্তচালিত নলকূপের পানি নিরাপদ নয়। আর্সেনিক দূষণের সমীক্ষা শেষ হলে এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

- বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট সেচব্যবস্থা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫৪ শতাংশ অর্জন করেছে।[৯] সৃষ্ট সেচ ক্ষমতার ৪৬ শতাংশ অব্যবহৃত থাকছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পে ৭৬৮,৭৭১ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। গড়ে অগভীর নলকূপে সম্ভাব্য সেচ ক্ষমতার মাত্র ৪৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। একমাত্র শক্তিচালিত পাম্প গড়ে লক্ষ্য মাত্রার ৭০ শতাংশ অর্জন করেছে।
- সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের লোকসান ক্রমেই বেড়ে চলছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াই লোকসানকারী কর্পোরেশনসমূহ প্রায় সাড়ে তের শ' কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে।[১০] দুটো কারণে মনে হয় যে, এ হিসাবে লোকসান অবপ্রাক্কলন করা হয়েছে। এ হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বকেয়া পাওনার সবটুকুই পাবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক বকেয়া কোনদিনই আদায় হবে না। দ্বিতীয়ত, এ হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারিদের অবসর ভাতার সম্ভাব্য দায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। লোকসানকারী এ সব প্রতিষ্ঠানের লোকসান বছরে জাতীয় আয়ের এক শতাংশ বা তার উর্ধ্বে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
- ব্যাংকসমূহ রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যে, এ সব প্রতিষ্ঠানের লাভ থেকে উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা হবে। অথচ ব্যাংকসমূহই করদাতাদের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ প্রায় ২৮.৬ শতাংশ। অথচ একই দেশে বিদেশী ব্যাংকসমূহের শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩.৪ শতাংশ। কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে খেলাপী ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বেশী। এ সব প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ৬৫ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুসারে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পুঁজির ঘাটতির জন্য সরকারকে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিতে হবে।[১১] ইতোমধ্যে সরকার ব্যাংকসমূহকে ৪০৮৩ কোটি টাকার বন্ড দিয়েছে।

সবাই বাঙ্গালীদের দোষ দেয় এরা ভাঙতে পারে, কিন্তু গড়তে জানে না। এমনকি পঞ্চদশ শতকে চণ্ডীদাসও দুঃখ করে লিখেছেন[১২]:

> "গড়ন ভাঙিতে পারে আছে কত খল
> ভাঙিয়া গড়িতে পারে যে জন বিরল।"

আমার কিন্তু মনে হয় গড়াটাই বাঙ্গালীদের জন্য সমস্যা নয়। গড়তে পারলেও বাঙ্গালীরা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না। অর্থনীতিবিদ্ হার্ভে লাইবেনস্টাইন অবশ্য মনে করেন যে এ ধরনের রোগ সকল উন্নয়নশীল দেশেই রয়েছে। এ রোগের তিনি নাম

দিয়েছেন "X-inefficiency"। ইংরাজি ভাষায় "X" অক্ষরটি অজানা সংখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই "X-inefficiency"-এর বাঙলা অর্থ হল "অজানা অকার্যকারিতা"।[১৩] উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করা হয় সে অনুপাতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা অনেক কম ফল পাওয়া যায়। লাইবেনষ্টাইন রোগটি নির্ণয় করেছেন– কিন্তু তার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করেননি।

পরিচালনা ও মেরামতের ব্যর্থতা অজানা অকার্যকরতার একমাত্র উৎস নয়, তবে অবশ্যই এর একটি বড় কারণ। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে পরিচালনা ও মেরামতের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হল এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া যায় না। দুটো কারণে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। প্রথমত, দাতারা রাজস্ব ব্যয় ও বিনিয়োগ বা উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ করতে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে বাধ্য করে। তারা চায় যে উন্নয়ন বাজেটে–যার মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ অর্থায়ন করা হয়–যেন তাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য সরকারের হিস্সার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকে। বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ রাজস্ব বাজেটে খরচ কমাতে বাধ্য হয়। যেহেতু রাজস্ব বাজেটে বেতন বন্ধ করা সম্ভব হয় না–সেহেতু রক্ষণাবেক্ষণ খাতকেই কৃচ্ছ্রতার বোঝা বহন করতে হয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনা ও মেরামত হল নৈমিত্তিক কাজ, এতে কোন রাজনৈতিক চমক নেই। কিন্তু নতুন প্রকল্পের প্রতি রাজনীতিবিদ্দের দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে। নতুন প্রকল্পে একবার ভিত্তি স্থাপন করা হয়, আবার প্রকল্প সমাপ্ত হলে ফিতে কাটা হয়। রাজনীতিবিদ্রা বার বার তাঁদের সাফল্য জাহির করার সুযোগ পান। আবার অনেক সময় ঠিকাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেন। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহে মেরামত ও পরিচালন ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ থাকে না।

এ বক্তব্য অনেকাংশে সঠিক, তবে সর্বাংশে নয়। যাঁরা বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতাকে পরিচালনার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে থাকেন তাঁরা সমস্যার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষা করে থাকেন। প্রথমত, সুদক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থা না থাকলে কোন সরকারই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ দিতে পারবে না। যদি হাসপাতালের বিদ্যুৎ ও পানি চুরি হয়ে পার্শ্ববর্তী বস্তিতে চলে যায় তবে সরকারের পক্ষে এ সব অপচয়ের কাফ্‌ফারা দেওয়া সম্ভব নয়। যদি হাসপাতালের ওষুধ চুরি হয়ে যায় তবে কোন দিনই হাসপাতালের জন্য যথেষ্ট ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। যদি মেরামতের টাকা হাসপাতালের বাইরের দেওয়ালের জন্য খরচ করা হয় তবে হাসপাতালের ছাদের পানি পড়া বন্ধ করা যাবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মেরামত ও পরিচালনার জন্য ব্যয় বাড়িয়েও এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। উপরন্তু অনেক সময় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে ছোটখাটো মেরামতও করা হয় না। তার ফলে ছোট ছোট সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। জার্মানিতে বলা হয়ে থাকে যে, একটি ছোট্ট পেরেকের

অভাবে একটি রাজত্ব হারিয়ে যেতে পারে। জার্মান ছেলেভুলানো ছড়াতে তাই বলা হয়েছে:

For want of a nail, the shoe was lost.
For want of a shoe, the horse was lost.
For want of a horse, the rider was lost.
For want of a rider, the battle was lost.
For want of a battle, the kingdom was lost.
And all for the want of a horseshoe nail.

একটি পেরেকের অভাবে ঘোড়ার খুর কাজ করেনি। খুরের সমস্যার ফলে ঘোড়া কাজ করেনি। ঘোড়া না থাকাতে অশ্বারোহী সৈন্য পাওয়া যায়নি। অশ্বারোহী সৈন্যের অভাবে যুদ্ধে হেরে গেল। যুদ্ধ হেরে যাওয়াতে রাজত্ব হারালো। এ সব কিছু ঘটল ঘোড়ার খুরের একটি পেরেকের অভাবে।

পেরেকের দাম বেশি নয়। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতি না থাকলে যখন দরকার তখন পেরেক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সবার আগে দরকার হল সুশাসন।

দ্বিতীয়ত, কোন সরকারের পক্ষেই অবকাঠামোর মেরামত ও পরিচালনার সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। যারা বিভিন্ন অবকাঠামোর সুবিধা ভোগ করে তাদের এ ব্যয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব নিতে হবে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই গ্রাহকরা সব কিছু মাগনা চায়। বরং মাগনা চড়তে না দিলে বাসে, ট্রামে ও ট্রেনে মারপিট শুরু করে দেয়। খুশওয়ান্ত সিং লিখেছেন, তিনি দিল্লির বাসের গায়ে লেখা দেখেছেন[১৪]:

"আ না ফ্রি
জা না ফ্রি
আওর পাক্‌ড় গিয়া
ত খানা ফ্রি"

(আসবে মাগনা, যাবে মাগনা এবং ধরা পড়লে (জেলে) খাবেও মাগনা।)

এ পরিবেশে বেশির ভাগ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃত পক্ষে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বেশির ভাগ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে একটি দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবহারকারীরা কোন মাশুল দেয় না, কাজেই সেবার মান নেমে যাচ্ছে; সেবার মান অসন্তোষজনক তাই ব্যবহারকারীরা মাশুল দিচ্ছে না। একই সাথে সেবার মান উন্নীত না করলে এবং মাশুল আদায় না বাড়াতে পারলে এ দুষ্ট চক্র ভাঙ্গা সম্ভব নয়।

পরিচালনা ও সংরক্ষণে ব্যর্থতা একটি অনভিপ্রেত সংকট – এ কথা মোটেও সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা এক ধরনের কর্মকর্তাদের জন্য লাভজনক ব্যবসা। টেলিফোন সব সময়ে ভাল থাকলে ঘুষ পাওয়া যায় না। ন্যায্য বিল দিলেই বিদ্যুৎ পাওয়া গেলে বিদ্যুৎ সংস্থার কর্মকর্তাদের কোন সমাদর হবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহ একচেটিয়া ব্যবসা করে। তাদের কোন প্রতিযোগী নেই। সকল একচেটিয়া ব্যবসায়েরই প্রবণতা হল যত সম্ভব উৎপাদন হ্রাস করে সর্বোচ্চ মূল্য আদায় করা। কাজেই একদিকে সেবা কমে যায়, অন্যদিকে অনুপার্জিত মুনাফা বেড়ে যায়। অনেকে মনে করেন যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণ হল অদক্ষ পরিচালনা। আসলে বাংলাদেশে যারা সরকারী প্রতিষ্ঠান চালায় তারা মোটেও বোকা নয়, তারা অতি চালাক। যা কিছু ঘটছে তা ইচ্ছা করেই ঘটানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পুলিশ সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ছে। একবার নিউইয়র্ক, লন্ডন ও ঢাকা শহরের পুলিশের প্রধান কর্মকর্তারা এক বৈঠকে বসেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দাবি করেন যে তাঁদের পুলিশ সবচেয়ে দক্ষ। তাঁদের দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলা হল। নিউইয়র্ক শহরের পুলিশ প্রধান দাবি করলেন যে, তাঁর পুলিশ বাহিনীর কাছে সর্বাধুনিক কম্পিউটারে আসামীদের সম্পর্কে সর্বশেষ উপাত্ত রয়েছে। কাজেই কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা শতকরা ৯৯ ভাগ আসামী ধরে ফেলতে পারে। সুতরাং নিউইয়র্কের পুলিশ বিশ্বের সেরা। লন্ডনের পুলিশ প্রধান স্বীকার করলেন যে, তাঁর পুলিশ বাহিনীর এত যন্ত্রপাতি নেই, তবু তাদের এলাকার জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই ২৪ ঘণ্টাতে না হলেও ৭ দিনের মধ্যে ৯৯.৯৯ শতাংশ অপরাধী তাঁরা ধরে ফেলতে পারেন। ঢাকার পুলিশ প্রধান বললেন যে, তাঁর কম্পিউটার নেই; তাঁর পুলিশ বাহিনীর সাথে জনগণের যোগাযোগ নেই এবং তারা প্রায় ৯০ ভাগ আসামী ধরে না। তবু ঢাকার পুলিশ বিশ্বের সেরা কেননা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কমপক্ষে ৭ দিন আগেই তারা জানে কোথায় কি অপরাধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। সর্বাধুনিক কম্পিউটার নিয়েও পৃথিবীর কোন পুলিশ বাহিনী এ ধরনের রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ধরনের গল্প কখনও সত্য হয় না, তবে এতে বাস্তবতার ছায়া থাকে। পুলিশে যা ঘটছে অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও তা ঘটছে। অনেক দেশেই সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে জনগণ নয় সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ আমলারাই অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে কিভাবে প্রশাসন চলবে। পরিচালনা ও মেরামতের ব্যর্থতা শুধু একটি আর্থিক বা প্রশাসনিক সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা।

ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি একটি তুচ্ছ বিষয় নয়—এটি অত্যন্ত জটিল সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৯৪ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন পাঁচটি সুপারিশ করেছে[১৫]:

- স্থানীয় অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় অবকাঠামোর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা;
- সবাইকে ভর্তুকি না দিয়ে শুধু মাত্র দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা;
- সেবার মূল্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন করা।

স্থানীয় সেবার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই গ্রামে গ্রামে স্কুল কিংবা হাসপাতাল চালানো সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয় সড়ক, সেচ অবকাঠামো, পানি সরবরাহ বা পয়ঃনিষ্কাশনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। স্থানীয় জনগণের জন্য নির্মিত অবকাঠামো জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সব অবকাঠামোর মালিকানা স্থানীয় জনগণের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অর্থের সংস্থান না করে বিকেন্দ্রীকরণ কখনও সফল হবে না। স্থানীয় নেতৃত্বকে ব্যবহারের মাশুল আদায় ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি ব্যবহারের মাশুল থেকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় সম্ভব না হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণ রাতারাতি অংশগ্রহণ করবে না। জনগণের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে প্রকল্পের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উপরন্তু সর্বশ্রেণীর জনগণ যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় বিশেষ কোন গোত্র অবকাঠামোর সকল সুবিধা নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলবে। বিকেন্দ্রীকরণ তাই সময়সাপেক্ষ। দ্রুত বিকেন্দ্রীকরণ করতে গেলে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

পরিচালনা ও মেরামতের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, একই সাথে নতুন প্রকল্পের জন্য ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বাড়ানো সম্ভব নয়। কাজেই যেখানে বেশি লাভ হবে সেখানেই বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এমনকি সকল অবকাঠামোর মেরামত ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সম্ভব না হলে যেখানে রক্ষণাবেক্ষণের সুফল বেশি সেখানে প্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

পানি ও সেচের ক্ষেত্রে অনেক সময় দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভর্তুকি সকলকে দেয়ার মত সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব নয়। কাজেই ভর্তুকি দরিদ্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণত গরীবরা কম পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। কাজেই যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারের পরিমাণ কম সে সব ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস করলে এর সুফল শুধু গরীবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা বেশি।

পরিবেশগত প্রতিকূল প্রভাব এড়ানোর জন্য যারা পরিবেশ নষ্ট করে তাদের মাশুল বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে সম্পদের অপচয় হয় সেখানে মূল্য বাড়াতে হবে। মূল্য বাড়ালে সম্পদের অপচয় কমানো সম্ভব হবে। সবশেষে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে হবে।

বর্তমানে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় কারিগরী নির্ভরযোগ্যতার উপর। কিন্তু অবকাঠামোর সামাজিক ও আর্থিক গ্রহণযোগ্যতাও ভাল করে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কারিগরী মান নামিয়ে আনলে প্রকল্পের আর্থিক গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যেতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশগুলো ভাল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই এ সব সুপারিশ সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেখানে অবকাঠামোর একচেটিয়া ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল গড়ে উঠেছে সেখানে যে কোন সংস্কার প্রতিহত করার প্রচেষ্টা হবে।

সকলকে খুশি করে কোন সংস্কার সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় ব্যবস্থা নিতেই হবে। এ কথা সরকারের জন্য যেমন প্রযোজ্য বেসরকারী খাতের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। প্রতিষ্ঠানটি পুরানো স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়। নতুন স্বাস্থ্য বীমার জন্য নির্ধারিত কোম্পানী কর্মচারীদের একই বীমার হারে অনেক নতুন সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দেয়। তবে তাদের দুটো শর্ত ছিল। প্রথমটি হল প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীকে এ বীমাতে অংশগ্রহণের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবটি ত্রিশ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। এক জন ছাড়া কোম্পানীর শত শত কর্মচারী এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুধু একজন কর্মচারী জিদ ধরে বসে যে এ প্রস্তাবে সে রাজি নয়। প্রথমে বীমা কোম্পানীর বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হল তাকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু সে কোনমতেই রাজি হল না। তারপর তার বিভাগের ছোট, মাঝারি ও বড় সকল কর্মকর্তারা চেষ্টা করল। কিন্তু সে কোন মতেই রাজি হল না। এর পর ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পাঠানো হল। কিন্তু কর্মচারীটি তার অবস্থানে অনড়। ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে এ সমস্যার কথা জানানো হল। প্রেসিডেন্ট ছিলেন লম্বা চওড়া দশাসই ব্যক্তি। তিনি বসতেন সবচেয়ে উঁচু তলায়। তিনি কর্মচারীটিকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। কর্মচারীটি তার কক্ষে এলে তিনি বললেন যে, কোম্পানীর সবাই যা চায়, সে কেন তা চায় না। কর্মচারীটি বলল যে এ ব্যবস্থা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট রেগে বললেন, "হারামজাদা! সবাই যা চায় তুই তা চাস না। তোকে জানালা দিয়ে ফেলে দিলে কেউ তোর জন্য আসবে না। তুই এক্ষণি কাগজে স্বাক্ষর করবি অন্যথায় এই মুহূর্তে তোকে আমি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারবো।" কর্মচারীটি সুড়সুড় করে সব কাগজপত্র দস্তখত করে দিল। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এবার কিভাবে সই করলি?" কর্মচারীটি জবাব দিল, "হুজুর আপনি যত প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন কেউ তা এর আগে করতে পারেনি।" সুশাসনের জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে অনেক সময়ই শুধু "প্রাঞ্জল ভাষাই" নয় "প্রাঞ্জল ব্যবহারের"ও প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় ম্যানহোলের হোল (ছিদ্র) বন্ধ হবে না।

## তথ্যসূত্র

১. World Bank, *World Development Report 1999/2000* (New York : Oxford University Press, 1999), p. 230

২. UNDP, *Human Development Report, 1995.* (New York : Oxford University Press, 1995), pp. 117-124

৩. *Webster's Compact Dictionary of Quotations* (Springfield : Merriam Webster Inc., 1992), p. 143

৪. World Bank, *প্রাগুক্ত*, pp. 264-265

৫. World Bank, *Bangladesh Education Sector Review Report* (mimeo, 1999)

৬. Ahmad, Muzaffer, "Health care : Problems of Quality Assurance" in *Growth of Stagnation : A Review of Bangladesh's Development 1996* (Dhaka : UPL, 1997), pp. 361-390

৭. World Bank, *Bangladesh Public Expenditures Review 1997* (Washington: World Bank, 1997), p. 17

৮. Khan, A. A., " Institutional Aspects of Water Supply and Sanitation in Asia." *Natural Resources Forum*, February 1988, pp. 45-46

৯. তথ্য *Water Resources Planning Organization* হতে সংগৃহীত

১০. অর্থ মন্ত্রণালয়। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ১৯৯৯ (ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ১৩৭

১১. তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগৃহীত

১২. উদ্ধৃত, বসু, সজল, *বাঙালী জীবনে দলাদলি* (কলকাতা : কল্পন, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ১

১৩. Leibenstein, Harvey, *General X-Efficiency Theory and Economic Development* (1978)

১৪. Singh, Khushwant, *The Best of Khuswant Singh* (Delhi : Penguin Books of India, 1993), p. 458

১৫. World Bank, *World Development Report 1994*, (New York : Oxford University, 1994), pp. 73-88

# বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক অর্থনীতি

আশির দশকে গল্পটি আমাকে বলেছিলেন একজন বহুজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশেই দু'জন ইসলাম-পছন্দ সমরনায়ক শাসন করছিলেন। দু'দেশেরই অর্থনীতিতে তখন সংকট। শবে বরাতের রাতে দু'জন সমরনায়ক নামাজ পড়তে বসলেন। দু'জন দোয়া-দরুদ পড়তে পড়তে এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে বেহেশতে নাকি হইচই পড়ে যায়। গুজবে প্রকাশ, স্বয়ং জিবরাইল (আ:) তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে দৌড়ে আসেন। অবশ্যই তিনি প্রথমে পাকিস্তানে গেলেন। তিনি পাকিস্তানের সমরনায়ককে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পাকিস্তানের সমরনায়ক বললেন, "আল্লাহ্ পাকিস্তানের প্রতি ঘোরতর অবিচার করছেন। তিনি সব গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশকেই তেলে ভরে দিয়েছেন, অথচ পাকিস্তানকে তেল দেননি। তাই পাকিস্তানে ইসলামী জমহুরিয়াত কায়েম রাখতে তকলিফ হচ্ছে।" জিবরাইল বললেন, "ওহে কমবখত, আল্লাহর কাছে শোকর কর্, তিনি তোকে তেল দেননি, কিন্তু আফগান সঙ্কট দিয়েছেন। একে ভাঙিয়ে যত পারিস কামিয়ে নে।" জিবরাইল এবার বাংলাদেশে এলেন। বাংলাদেশের সমরনায়কের একই দুঃখ। আল্লাহ্ শুধু আরবদেরই তেল দেননি, তিনি বাঙ্গালীদের পরে মুসলমান হয়েছে এমন সব নালায়েক দেশে (যথা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজিরিয়াকে) তেল দিয়েছেন। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাঠামোগত সংস্কারের জ্বালায় বাংলাদেশে মুমীন মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাংলাদেশের সমরনায়কও আল্লার কাছে তেল চান। জিবরাইল বললেন, "বাংলাদেশের জন্য কিছু গ্যাস বা তেল বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে তোর যা উড়নচণ্ডী স্বভাব এখন এ সব বের করলে তুই সব উড়িয়ে দিবি, এখন তেল দেওয়া যাবে না।" সমরনায়ক কাতরভাবে বললেন, তিনি গোনাগার হলেও বাংলাদেশের মুমীন মুসলমানদের কোন দোষ নেই এবং তাদের শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে না। অগত্যা জিবরাইল বললেন, "তোকে তেল দেওয়া হবে না। তবে বন্যা দেওয়া হবে। যা পারিস রিলিফের মাল হাতিয়ে নে,

আর বন্যার দোহাই দিয়ে মুমীন মুসলমানদের বহুজাতিক দাতাদের জুলুম থেকে রক্ষা কর।"

উপরের গল্পটি কল্পিত হলেও এতে সত্যের ছায়া (যথা বন্যার অজুহাতে কাঠামোগত সংস্কার পিছিয়ে যাওয়া) রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে যা শোনা যায় তা সবই সত্য নয়, আবার বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে অনেক সত্য রয়েছে যা আদৌ শোনা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক হিসাবে বন্যা সকলের জন্য অভিশাপ হলেও, রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রক্রিয়াতে বন্যায় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কেউ কেউ লাভবানও হয়। অস্কার ওয়াইল্ড যথার্থই বলেছেন[১]: "The truth is rarely pure and never simple." (সত্য খুব কম সময়ই অবিমিশ্র হয় এবং কখনও সরল নয়।)

অস্কার ওয়াইল্ডের বর্ণিত সত্যের মত বাংলাদেশে বন্যা সম্পর্কেও শেষ কথা বলার এখনও সময় আসেনি। বন্যা বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের এক চিত্র যেখানে উত্তাল জলরাশি কেড়ে নেয় মানুষের মুখের গ্রাস, ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের আশ্রয় আর পেছনে ফেলে যায় মারি ও মন্বন্তরের তাণ্ডব লীলা। কিন্তু এই ধ্বংসের সবটুকুই অপূরণীয় নয়। বন্যায় এক ফসল নষ্ট হলেও, পরবর্তী ফসল পাওয়া যায়। অনেক সময় পরবর্তী ফসলের ফলন অনেক বেশি হয়। কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে বন্যার সাথে যে পলি আসে তা কর্ষিত জমিতে ফসফরাস ও পটাশের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। বন্যার ফলে জমিতে জলজ শৈবাল ও উদ্ভিদ জন্মে—যা নাইট্রোজেন উৎপাদনে সহায়ক। সবচেয়ে বড় কথা হল বন্যাউপদ্রুত অঞ্চলে জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই সাধারণত বন্যা হলে বাংলাদেশে বোরো ফসলের ফলন বেড়ে যায়। উপরন্তু নীচু অঞ্চলের আমন নষ্ট হলেও অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে আমনের ফলন বৃদ্ধি পায়।[২]

যদি বন্যার ক্ষতি প্রাকৃতিক দিক থেকে অপূরণীয় হত, তা হলে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অতি হালকা হওয়া ছিল স্বাভাবিক। বাস্তব পরিস্থিতি হল তার সম্পূর্ণ উল্টো। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। বন্যা কোন নতুন ঘটনা নয়। বন্যা সত্ত্বেও হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন বদ্বীপ অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য দেখা যাচ্ছে। দু'হাজার বছর আগে চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যথার্থই লিখেছেন, অতিবৃষ্টির চেয়ে খরা অনেক বেশি ক্ষতিকর।[৩] বন্যা হলে সব ফসল নষ্ট হয় না। খরা হলে সব ফসলই শুকিয়ে যায়। তাই দক্ষিণ এশিয়াতে খরাপ্রবণ অঞ্চলে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম।

বন্যার প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়েও অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হল পরোক্ষ ক্ষতি। বন্যা যত ক্ষতি করে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে বন্যার আশঙ্কা।[৪] বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে বন্যা কখন আসবে তার ঠিক নেই। তাই এসব অঞ্চলে সার ও সেচের মত আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে চাষীরা উফশী (উচ্চ ফলনশীল) শস্য চাষ করার ঝুঁকি গ্রহণ করতে সাহস পায় না। বন্যার সম্ভাবনা তাই কৃষিকে চিরাচরিত চাষ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলিত করে রাখে।

বন্যা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক নয়; সামাজিক বৈষম্যকেও বন্যা প্রকট করে তোলে। বন্যার ফলে উঁচু জমিতে ফসল ভাল হয়, অথচ নীচু জমি তলিয়ে যায়। বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে উঁচু ও ভাল জমি দখল করে আছে বড়লোকরা, গরীবরা চাষ করে প্রান্তিক জমি। বন্যা তাই নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়াকে নিবিড়তর করে তোলে। বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে দরিদ্ররা ক্রমাগত দরিদ্রতর হতে থাকে এবং ধনীরা ফুলে ফেঁপে ওঠে।

বন্যা দক্ষিণ এশিয়াতে নতুন কোন সমস্যা নয়। দু'হাজার বছর আগে চাণক্য বন্যাকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বন্যার ক্ষতি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[৫] তাঁর মতে বন্যা হলে নদীতে পুজো দিতে হবে। বন্যার সময় যারা নদীর তীরে থাকে তাদের বন্যার সময় উঁচু জমিতে নিয়ে যেতে হবে। চাণক্য উপদেশ দিয়েছেন যে, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে হাতের কাছে কাঠের পাটাতন, বাঁশ ও নৌকা রাখতে হবে। কেউ যদি ভেসে যায় তবে লাউয়ের খোল, চামড়ার থলে, গাছের কাণ্ড, ডিঙি নৌকা এবং মোটা রশি ব্যবহার করে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি কোন ডিঙির মালিক বন্যার্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার না করে তবে তাকে শাস্তি দিতে হবে। চাণক্য অবশ্য বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য কোন কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেননি। এর কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা নয়। চাণক্যের সময়ে বিভিন্ন ধরনের বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের প্রযুক্তি ভালভাবেই জানা ছিল। মনুস্মৃতি পাঠ করলে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় মুনি ঋষিরা ইচ্ছে করেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেননি। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন নদী বা স্রোতের গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করে তবে সে পুজো করার অধিকার হারাবে।[৬] মনুর ভাষ্যকারদের মতে যারা সেতু অথবা বাঁধ নির্মাণ করবে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।[৭] যদিও চাণক্য ও মনু তাঁদের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেননি, তবু মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় মুনি ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দে হস্তক্ষেপ করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে ক্ষতিকর।

প্রাচীন মুনি ঋষিগণ পরিবেশগত কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভৌত কাঠামো নিরুৎসাহিত করলেও আধুনিক প্রযুক্তি বন্যার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বন্যার প্রকোপ হ্রাস করার জন্য নানা ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ইউরোপে ওলন্দাজরা জলনিয়ন্ত্রণে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। ওলন্দাজরা গর্ব করে বলে থাকে, বিধাতা পৃথিবী তৈরি করেছেন আর ওলন্দাজরা তাদের দেশ হল্যান্ড সৃষ্টি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাঠামোগত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জলাধার নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, নদীর খাত গভীরকরণ, বন্যার পানি বের করার জন্য নির্গমন পথ নির্মাণ অথবা গতিপথ পরিবর্তন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ জলাধার নির্মাণের উপযোগী নয়। এ ধরনের জনবহুল দেশে জলাধার নির্মাণের জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই। উপরন্তু জলাধার নির্মাণ

হবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। যেখানে সমগ্র ভূখণ্ডই বন্যার জলে তলিয়ে যায় সেখানে অতিরিক্ত নির্গমন পথ নির্মাণ অথবা গতিপথ পরিবর্তনও যথেষ্ট কার্যকর হবে না। নদীর খাত গভীরকরণও বাংলাদেশের জন্য সহজ নয়। প্রতি বছর বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে ২.৪ বিলিয়ন টন পলি বাহিত হয়; এই পরিমাণ হল পৃথিবীর সব নদী দিয়ে পরিবাহিত পলিমাটির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।[৮] পৃথিবীর সকল নদী দিয়ে গড়ে যে পরিমাণ পলিমাটি পরিবাহিত হয় তার একশ গুণের বেশি পলিমাটি বাংলাদেশের নদী দিয়ে সমুদ্রে পড়ে। এ ধরনের নদীর খাত যান্ত্রিকভাবে খনন অর্থনৈতিক দিক হতে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। কাজেই বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত ব্যবস্থা হিসাবে মাটির বাঁধ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে পাঁচ হাজার কিলোমিটারের বেশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, সাড়ে চার হাজারের বেশি জলনিয়ন্ত্রক কাঠামো বানানো হয়েছে এবং তিন হাজার মাইলের বেশি জলনিষ্কাশক খাল কাটা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে মোট কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। বিভিন্ন স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।[৯] প্রথমত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদীর দুই পারে বাধা সৃষ্টি করে পানি নদীর খাতে আটকে রাখে। এর ফলে যেখানে বাঁধ শেষ হয় সেখানে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায়। যদি নদীর এক পারে বাঁধ দেওয়া হয় তবে অপর পারে পানির চাপ বেড়ে যায়। এক জায়গা হতে অন্য জায়গাতে সমস্যা স্থানান্তর করে এর সমাধান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বাঁধ না থাকলে নদীর পানি-বাহিত পলিমাটি সকল প্লাবিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁধ থাকলে পলি নদীর খাতে জমতে থাকে। এতে নদীর তলদেশ উঁচু হতে থাকে। নদীর তলদেশ উঁচু হলে বাঁধও উঁচু করতে হয়। বাঁধ উঁচু করলে নদীর তলদেশ আরও উঁচু হয়। এর ফলে একটি অগ্রহণীয় দুষ্ট চক্রের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, নদীতে বাঁধ দিলে নদীর মূল স্রোত এপার থেকে ওপারে চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্রোত আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে নদীর বাঁধ ভাঙতে থাকে। নতুন নতুন বাঁধ নির্মাণ করে বাঁধকে পেছনে নিয়ে যেতে হয়। এর ফলে পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়। চতুর্থত, যেখানে বাঁধ দেওয়া হয় সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বাঁধের ভেতরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরা জল নিষ্কাশনের জন্য বাঁধ কেটে দেয়। এর ফলে বাঁধ নির্মাণের সম্পূর্ণ বিনিয়োগই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চমত, বাঁধের ফলে জমিতে পলি পড়তে পারে না। বাঁধের ভেতরে অনেক ক্ষেত্রে জমি শক্ত হয়ে যায় এবং তাতে আর্দ্রতার অভাব দেখা দেয়। সামগ্রিকভাবে বাঁধ দ্বারা ঘেরাও করা অঞ্চলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। ষষ্ঠত, বাঁধ দেওয়ার ফলে মাছের চলাফেরা বিঘ্নিত হয়। মাছের জীবন-চক্র নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। তাই মাছের উৎপাদন কমে যায়। সপ্তমত, অনেক ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভেতর পানি জমে

মানুষ ও গবাদিপশুর জন্য স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। অষ্টমত, উপকূল অঞ্চলে বাঁধ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করছে। মৃত বদ্বীপে বাঁধের ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিল ডাকাতিয়ার দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপরন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সব শেষে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ শহরাঞ্চলে নিরাপত্তা সম্পর্কে একটা মিথ্যা মোহ গড়ে তোলে। শহরে বাঁধ দেওয়া অঞ্চলে বাড়িঘর দ্রুত গড়ে ওঠে। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে না। যখন বাঁধ ভেঙ্গে যায় তখনি এ সব অঞ্চলে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের শুধু অবাঞ্ছিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই দেখা যাচ্ছে না, প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ তাদের মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।[১০] ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বন্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক মুনাফা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। কৃষি খাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে, বন্যার অনিশ্চয়তা দূর হলে কৃষকরা চিরাচরিত ধানের বদলে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ধান চাষ করবে এবং এর ফলে আমন ধানের ফলন বেড়ে যাবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা এ ধারণা মোটেও সমর্থন করে না। প্রথমত, বন্যা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ও আমন ধানের ফলন বৃদ্ধির মধ্যে কোন সহগমন (correlation) পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, বন্যা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে উফশী বীজের সম্প্রসারণে কোন উল্লেখযোগ্য তফাৎ দেখা যাচ্ছে না।[১১] কৃষির সামষ্টিক উপাত্ত হতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুফল সম্পর্কে যে সন্দেহ জাগছে তা বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত ঘটনা সমীক্ষা (case study) হতেও সমর্থিত হচ্ছে। ১৯৮৯-১৯৯৫ সময়কালে বাংলাদেশে বন্যা সম্পর্কিত কর্মসূচীর (Flood Action Plan) এক সমীক্ষাতে ১৭টি সমাপ্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৯টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সফল এবং ৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অর্থনৈতিক দিক হতে অগ্রহণযোগ্য। এমনকি দুটো বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রকল্প দুটোতে আদৌ কোন লাভ হয়নি বরং লোকসান হয়েছে।[১২] অন্যান্য সমীক্ষা হতেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত দু'ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। প্রথমত, ক্ষুদ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ বৃহৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হতে অধিকতর কার্যকর হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সেচ সুবিধা থাকে সে সব প্রকল্প অর্থনৈতিক দিক হতে অধিকতর লাভজনক। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আদৌ অভিনব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হতেও দেখা যায় যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের সুবিধা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয় এবং প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ব্যয় অনেক কমিয়ে দেখানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে সেনাবাহিনীর প্রকৌশল সংগঠন (The Corps of Engineers)। সিনেটর

প্রক্সমায়ার (Proxmire) প্রকৌশল সংগঠনের প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে দুঃখ করে লিখেছেন[১৩]: "The Corps of Engineers, under pressure from Congress, has become experts in inventing benefits" (কংগ্রেসের চাপে পড়ে কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স বন্যানিয়ন্ত্রণে সুবিধা আবিষ্কারে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে।)

প্রতিকূল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও অনিশ্চিত অর্থনৈতিক মুনাফার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ মোটেও অর্থনৈতিক নয়। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বন্যানিয়ন্ত্রণ বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত লাভজনক। তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নানা ধরনের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এদের চাপে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বাধ্যবাধকতাসমূহ সকল দেশে ও সকল সময় এক থাকে না। দেশকালপাত্র ভেদে বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিবর্তিত হয়। তাই উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহে বন্যানিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক অর্থনীতি ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেসের সদস্যরা। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অতি কম। তাই এ সব অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসের সদস্যরা তিনটি কারণে নিজেদের নির্বাচনী এলাকাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়। প্রথমত, তাদের নির্বাচনী এলাকাতে যত নতুন প্রকল্প নেওয়া যায় ততই সাংসদদের জনপ্রিয়তা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন নতুন পূর্তকাজ তাদের যোগ্যতার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয়ত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের মুনাফা বিনিয়োগের তুলনায় কম হলেও এসব প্রকল্পে অতি অল্পসংখ্যক জমির মালিক প্রচুর লাভ করে। তাই তারা এ ধরনের প্রকল্প সমর্থন করে। তৃতীয়ত, সাংসদদের নির্বাচনী এলাকাতে ঠিকাদারদের কাজের ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সময়ে বন্যার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হত পল্লী অঞ্চল ও কৃষি খাত। বর্তমানে বন্যার বেশির ভাগ ক্ষতি উদ্ভূত হয় অকৃষি খাতে ও শহরাঞ্চলে। কাজেই শহরাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে চলছে। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে জমির চাহিদা দ্রুত বেড়ে গেছে। এর ফলে প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশনের জন্য যে সব খাল ও নীচু জমি ছিল সবই মানুষের বসতভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি শহরাঞ্চলে নদীর খাতে পর্যন্ত অবৈধ দখলকারীরা বসতি স্থাপন করেছে। এর ফলে শহরাঞ্চলে বন্যার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। কারিগরী দিক থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় হল এ সব অবৈধ বসতি তুলে দেওয়া। কিন্তু এ সব অবৈধ বসতির পৃষ্ঠপোষকরা রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী। তাই শহরাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন সহজ উপায় নেই। শহরে বন্যা প্রতিরোধের জন্য চারদিকে বাঁধ দিলে ভেতরে যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা

করার জন্য বর্ষাকালে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু জনগণের সহযোগিতার অভাবে শহরের জলাবদ্ধতার সমস্যা স্থায়ী ভিত্তিতে সমাধান সম্ভব হবে না। উপরন্তু নগর রক্ষার জন্য শহরের চারদিকে যে বাঁধ দেওয়া হয় তা বাঁধের ভিতরে নিরাপত্তার একটি মিথ্যা মোহ গড়ে তোলে। জনগণ মনে করে যে, বাঁধের ভিতরে বন্যার জল কোন দিনই আসবে না। এ ধারণার ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরার মত প্রকল্প এলাকার নীচু জমিতে ঘনবসতি গড়ে উঠছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল কোন মাটির বাঁধই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। যে কোন সময় এ সব বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। যখন বাঁধ ভেঙ্গে যাবে তখন সংরক্ষিত এলাকায় অচিন্তনীয় ক্ষয়ক্ষতি হবে। তাই শহরাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু বাঁধ বা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য কোথায় বসতি হবে আর কোথায় বসতি হবে না তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অঞ্চল বিভাগের বিধি (Zoning law) শহরাঞ্চলে বাস্তবায়ন না করলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে না, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হতে থাকবে।

বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের রাজনৈতিক চালিকাশক্তি শুধু পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্রাজ্য বিকাশের প্রবণতা (empire-building tendency) অথবা ঠিকাদারদের অর্থ-লিপ্সা নয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলই তাদের বাগ্মিতায় বন্দী হয়ে আছে। যখনই প্রলয়ঙ্করী বন্যা দেখা দেয় তখনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাই কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই বন্যা সম্পর্কে ব্যক্তিনিরপেক্ষ যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। পল্লী অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে হাজার হাজার মাইল জুড়ে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে বাঁধ নির্মাণ করাটাই বড় কথা নয়, বাঁধ সংরক্ষণ হল আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চীনা প্রবাদে তাই বলা হয়েছে, বাঁধ দেখাশোনা করার লোক না থাকলে বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ অসার। যে সব দেশে কাঠামোগত ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে সেখানেই রয়েছে সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। স্পেনে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গত এগারো শ' বছর ধরে কাজ করছে। চীনে যেখানেই বন্যার ফলে বাঁধের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় সেখানেই হাজার হাজার লোক ছুটে আসে বাঁধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। কোথাও কোথাও বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষার জন্য বিশ লাখেরও বেশি লোক এগিয়ে আসে। দুভার্গ্যবশত বাংলাদেশে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ গোমতী নদীতে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। গত দেড় শ' বছর ধরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কুমিল্লা শহরকে গোমতীর আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষা করে আসছে। কিন্তু এ বাঁধ সরকারের রক্ষা করতে হয়; এ বাঁধ রক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় না। এ সম্পর্কে প্রথম প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ১৮৭৪ সালে–আজ থেকে প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে। তখন কুমিল্লাতে শিক্ষানবীশ সিবিলিয়ন কর্মকর্তা ছিলেন রিচার্ড কারস্টেয়ার্স (Richard Carstairs)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই "Little World of an Indian District Officer" গ্রন্থে কুমিল্লার গোমতী বাঁধ

সম্পর্কে তিনি নিম্নরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন[১৪]:

> গোমতী নদী কুমিল্লা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর জলরাশি নদীর দু পারের বাঁধের মধ্যে আটকে রাখা হত। যখন নদী কানায় কানায় পুরে যেত তখন নদীর পানি শহরের জমির আট ফুট উপর দিয়ে বয়ে যেত। বাঁধ নিয়ে আমাদের তাই সব সময়েই দুশ্চিন্তা থাকত। ত্রিপুরার রাজার এর রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলার ফলে বাঁধ ইঁদুরের গর্তে ভরে যেত। যখন এ সব গর্তে পানি চুয়ানো শুরু হত তখন পানি চুয়ানো বন্ধ করার জন্য লোক পাওয়া যেত না। স্থানীয় জনগণ দু ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমত, একদল এমন বর্ণের ছিল যাদের জন্য নিজের হাতে কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় দলের লোকদের নিজেদের জমির বাইরে কাজ করলে সম্মান হানি হত। এ ধরনের লোকদের কুলি হিসাবে কাজ করা ছিল অবমাননাকর। আমার মনে আছে যে একটি বাড়ি এ ধরনের একটি ছিদ্রের নীচে ছিল এবং বাঁধ ভাঙলে বাড়িটি ভেসে যেত। তবু ছিদ্রটি বন্ধ করতে লোকটি তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে একেবারে অস্বীকার করল। এটি আমার কাজ নয়, সে বলল, এটি সরকারের কাজ (উল্লেখ্য যে এটি সরকারের নয় রাজার কাজ ছিল)। সরকারকেই এ কাজ করতে হবে, আমি করব না।

পরে জেলের কয়েদীদের দিয়ে এ বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু স্থানীয় লোকজন বাঁধ রক্ষাতে কোন সাহায্য করেনি।

কারস্টেয়ার্সের প্রায় ষাট বছর পরে কুমিল্লাতে শিক্ষানবিস কর্মকর্তা হিসাবে আসেন ডক্টর আখতার হামিদ খান। ১৯৫৬ সালে–কারস্টেয়ার্সের বর্ণনার ৮২ বছর পরে, তিনি গোমতীর বন্যার নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন[১৫]:

> বাঁধের কোন কোন ছিদ্র আশঙ্কাজনকভাবে বড় হচ্ছিল, যদিও কোথাও কোথাও ছিদ্র বন্ধ করা হয়েছে। নদী কোন মতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাঁধ কোথাও ভাঙেনি। কিন্তু আশেপাশের গ্রামে সব কিছু ছিল স্বাভাবিক। বিপজ্জনক পানির দেওয়াল যা তাদের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে ছিল তা গ্রামবাসীদের আদৌ উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। ছোটবড় সবাই ছুটির মেজাজে ছিল, খুশিতে তারা মাছ ধরছিল ও গোসল করছিল। যেখানে নদীর ধারে প্রকৌশলীদের জীপ দাঁড়িয়েছিল সেখানে তারা জটলা পাকাচ্ছিল। যদিও বাঁধের ছিদ্রগুলি নিয়ে আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তারা আদৌ কোন উদ্বেগ ছাড়াই এ সব ছিদ্র দেখছিল। ছিদ্রগুলো কোথা হতে শুরু হয়েছে বের করতে যখন তাদের অনুরোধ করা হয় তখন তারা কোন সহযোগিতা করেনি। তাদের এক দলকে আমি বললুম, "আপনারা কি বুঝছেন না যদি বাঁধ ভেঙে যায় তবে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবু এ ভাঙন রোধ করতে আপনারা কেন এগিয়ে আসছেন না?" আমি তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি। তারা কেন উদ্বিগ্ন নয় আমি জানি না, তবু এ কথাও বলতে পারছি না যে তাদের আচরণ নেহাত নির্বোধ। এরা হচ্ছে প্রথম সারির শৌখিনদের মত। তারা যদি বেশি চিন্তা করে তা হলে এদের সুখ থাকবে না। প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রামে অবিচলিত থাকা একটি গুণ। প্রচণ্ড বাধার মুখে এ মনোভাব এদের বাঁচিয়ে রাখে।

আখতার হামিদ খানের এ লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও স্থানীয় জনগণ গোমতীর বাঁধ রক্ষায় এগিয়ে আসে না। এখনও বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষার একমাত্র দায়িত্ব হল সরকারের।

বাংলাদেশে বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ জনগণের নামে নির্মিত হলেও এসব প্রকল্পে জনগণের আদৌ কোন সম্পৃক্ততা নেই। এর একটি বড় কারণ হল প্রকল্পসমূহ স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে নির্মিত হয় না। এ সব প্রকল্পের নীলনকশা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, স্থানীয় জনগণের পছন্দ অনুসারে তা প্রণীত হয় না। তবে বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর চেষ্টা করা হলেও তা কতটুকু সফল হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তার একটি বড় কারণ হল, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে সামাজিক পুঁজির (social capital) অপ্রতুলতা। সামাজিক পুঁজির সরবরাহ নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষমতার উপর। পূর্বে উল্লেখিত গোমতী নদীর বাঁধসহ বাংলাদেশে বিভিন্ন বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে এ ধরনের সামাজিক পুঁজি যথেষ্ট পরিমাণে নেই।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশে কি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আদৌ কোন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না? আমার মনে হয়, এ ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। আমাদের অতীতের সাফল্য হতে শিক্ষা নিতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে বৃহৎ বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বদলে ক্ষুদ্র বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ অধিকতর কার্যকর হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব প্রকল্প স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে নির্মিত হয় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর। জনগণের চাহিদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনগণ কর্তৃক আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণে সম্মতি। যে সব প্রকল্পে স্থানীয় জনগণ ব্যয়ভার বহনে সম্মত হয় সে সব প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণেও জনগণ অংশগ্রহণ করবে। তৃতীয়ত, আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, সকল সমস্যারই টেকসই সমাধান নেই। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের জনগণ বন্যার মাঝে বাস করে আসছে, ভবিষ্যতেও তা-ই করতে হবে। এ পরিস্থিতিকে কিভাবে আরো সহনীয় করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে। ফসল ছাড়া অন্যান্য খাতে বিশেষ করে অকৃষি খাতে ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা-প্রতিরোধক্ষম (flood proofing) ব্যবস্থা আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী করা সম্ভব। বিশেষ করে বন্যার পানির সর্বোচ্চ উচ্চতার ঊর্ধ্বে বাসগৃহ নির্মাণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কুড়িগ্রাম জেলায় কেয়ার নামক বেসরকারী সংস্থার একটি আশাব্যঞ্জক নিরীক্ষার কথা স্মরণ করা যায়। এ প্রকল্পের অধীনে বাসগৃহসমূহ এবং যৌথ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ উঁচু করা হয়। ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় এসব বাসগৃহ ও আশ্রয়কেন্দ্র বন্যামুক্ত ছিল। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাথাপিছু খরচ হয়েছে ৫৬০ হতে ৬৭০ টাকা মাত্র।[১৬] উপরন্তু উপকৃত ব্যক্তিরা এ প্রকল্পের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় বহন করেছে এবং যৌথ আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য জমি দান করেছে। তবে বন্যার সময় ভাঙন রোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে অনেক বাড়িঘর ও আশ্রয়কেন্দ্র ভেঙ্গে যেতে পারে। বন্যা প্রতিরোধক্ষম

ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন ধরনের ফসলের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতি অল্প ব্যয়ে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। বন্যার ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ব্যয়বহুল কাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর অথবা অপ্রয়োজনীয়।

যতদিন পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নীতি বাস্তবায়ন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা জটিলতর হতে থাকবে। প্রতি বন্যার সময় বাঁধ ভাঙার জুজুর ভয় দেখিয়ে ঠিকাদাররা জরুরীভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দিতে বাধ্য করবে। কিন্তু বন্যার সময় এ ধরনের কাজের কোন সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান সম্ভব হবে না। এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সিংহভাগই বিবেকহীন ঠিকাদারদের অনুপার্জিত আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের নামে চড়া দামে পাথর কিনে নদীতে ফেলা হবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে কি না তা বিশ্লেষণ না করেই সরকারকে বরাদ্দ দিতে হবে। সরকারের ব্যয় বাড়তেই থাকবে কিন্তু জনগণের কোন মঙ্গল হবে না। সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর শহর রক্ষার নামে যে ব্যয় করা হয়েছে তাতে অনেকগুলি নতুন শহর স্থাপন করা সম্ভব ছিল।

এ সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ছে। দুই বন্ধু একসাথে প্রকৌশলী হিসাবে ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁদের একজন সড়ক ও জনপথ বিভাগে ও আরেকজন পানি উন্নয়ন বোর্ডে কাজ নেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী কয়েক বছর পরে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে একই বিভাগে ঠিকাদার হন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী তাঁর বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসে দেখেন বন্ধু অনেক বড়লোক হয়ে গেছেন। প্রকৌশলী তাঁর বন্ধুর কাছে এ রহস্যের কারণ জানতে চান। বন্ধু তাঁকে একটি নদীর কাছে নিয়ে একটি সেতু দেখিয়ে বলেন যে, সেতুটির জন্য বরাদ্দের অর্ধেক অর্থ দিয়ে তাঁর বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। কয়েক বছর পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীও চাকুরি ছেড়ে তাঁর প্রাক্তন প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদার হলেন। কিছুদিন পরে তাঁর বন্ধু তাঁর বাড়িতে এসে দেখেন যে তাঁর বন্ধু তার চেয়েও অনেক আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করা হল কিভাবে এ বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হল। বন্ধু তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে বললেন যে, নদীর বাঁধের অর্থে তিনি বড়লোক। বন্ধু বললেন, তিনি কোন বাঁধ দেখছেন না (আসলেও কোন বাঁধ ছিল না)। বন্ধুটি বললেন বাঁধের এক শ' ভাগ বরাদ্দই তার বাড়িতে লেগেছে। তবে খাতাপত্রে বলা হয়েছে বন্যায় বাঁধটি ভেসে গেছে। জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে অর্থ ব্যয় হবে, কিন্তু কোন সুফল মিলবে না, এমনকি সে অর্থের হদিশও পাওয়া যাবে না।

## তথ্যসূত্র

১. উদ্ধৃত, Cohen J. M. and M. J., *The Penguin Dictionary of Quotations* (Aylesbury : ELBS, 1964), p. 416

২. Rogers, Peter, et al. *Eastern Waters Study* (Washington : USAID: ISPAN, 1989), pp. 35-37

৩. Kautilya, *The Arthasastra,* Rangarajan, L. N., ed., (New Delhi : Penguin Books of India, 1992), p. 129

৪. Khan, Akbar Ali, "Economic Considerations and Alternatives in Water Policy Formulation in Bangladesh" in *Water Resources Policy for Asia* Mohammed Ali, et al., ed., (Rotterdam : A. A. Balkema, 1987), pp. 459-485

৫. Kautilya, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০

৬. Doniger, Wendy and Smith, Brian K., tr., *The Laws of Manu* (New Delhi: Penguin Books of India, 1991), p. 60

৭. Thapar, Ramila, *A History of India* (Hammondsworth : Penguin Books, 1966), p. 253

৮. Khan, Akbar Ali, *প্রাগুক্ত*, p. 460

৯. Khan, Akbar Ali, "Floods", *Natural Resources Forum*, August 1987, vol. XI No. 3 pp. 259-270

১০. Planning Commission, *The Fifth Five Year Plan, 1997-2002* (Dhaka : Ministry of Planning, 1998), p. 274

১১. WARPO, *National Water Management Plan Project* : Legacies and Lessons (mimeo, 1999), p. 18

১২. WARPO, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১৫

১৩. Proxmire, William, *The Fleecing of America* (Boston : Hughton Mifflin Company, 1980), p. 93

১৪. Carstairs, R., *The Little World of an Indian District Officer* (London : Macmillan and Co, 1912), pp. 88-89

১৫. Khan, Akhter Hameed, *The Works of Akhter Hameed Khan,* vol. I (Comilla : BARD, 1983), pp. 341-342

১৬. WARPO, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩১

# শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অসাম্য

গত কয়েক দশকে মার্কিন শিক্ষার্থীদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে একজন মার্কিন অধ্যাপক একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি লিখেছেন যে, বিশ বা ত্রিশ বছর আগে একজন ছাত্র যখন তার বান্ধবীর সাথে সম্পর্কের শুরু করত, তখন সে প্রথমেই তাকে বলত, "আমি তোমাকে ভালবাসি"। আজকের ছাত্রছাত্রীরা যখন একত্রে বসবাস শুরু করে তখনও ভালবাসার নাম করে না। কিন্তু তারা যখন একত্র বাসের শেষে একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, কেবল তখনই বলে, "আমি তোমাকে ভালবাসি"। তবে সেটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। এক সময়ে প্রেমিক প্রেমিকারা "আমি তোমায় ভালবাসি" কথাটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত; আজ একই বাক্য শুনলে তারা আঁৎকে ওঠে। আজকের তরুণ তরুণীদের ব্যক্তিগত জীবনে যে নীরব বিপ্লব এসেছে তার চেয়েও অনেক বেশি অতলস্পর্শী রূপান্তর ঘটেছে শিক্ষা ও অর্থের সম্পর্কে। মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যা চর্চা ছিল একটি পবিত্র সাধনা। এতে লোভ লালসার কোন স্থান ছিল না। আজকে শিক্ষা একটি বিপণনযোগ্য পণ্য যা লাভ লোকসানের বেনিয়া তাড়নায় নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্য শিক্ষা ও অর্থের এই টানাপড়েন নতুন কিছুই নয়। শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে বিতর্ক চলছে কমপক্ষে দু'হাজার বছর ধরে। বিদ্যার ক্ষেত্রে আজকে যে বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটছে তা ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে শিক্ষা সম্পর্কে অতি পুরানো বিতর্ক নিয়ে।

শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিতর্ক প্রথমে শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে। শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে প্রাচীন গ্রীসে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যায়। এক ঘরানার দার্শনিকগণ মনে করতেন, শিক্ষা অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হল জ্ঞান-অর্জন। কাজেই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দান অসমীচীন। আরেক ঘরানার দার্শনিকগণ বিশ্বাস করতেন যে, বিদ্যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আয় বাড়িয়ে দেয়; কাজেই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। তৃতীয় মতবাদের প্রবক্তারা মনে করতেন যে, বিদ্যার জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, তবু বিদ্যাকে অর্থের দাসে পরিণত করা মোটেও বাঞ্ছনীয় হবে না।

প্রথম মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সক্রেটিস। সক্রেটিসের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য আত্মার বিকাশ, অর্থ উপার্জন নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় পাপ। তাই তিনি বলেছেন[২]: "হে এন্টিফন, আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে যে সৌন্দর্য অথবা জ্ঞান সম্মানজনক বা অসম্মানজনকভাবে বিতরণ করা সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য অর্থের বিনিময়ে ক্রয়েচ্ছু কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে তবে আমরা তাকে দেহব্যবসায়ী বলে থাকি। অথচ এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে সম্মানিত মনে করেন এবং তাঁর উপযুক্ত গুণগ্রাহী হন তবে তাঁদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁকে আমরা বিজ্ঞ মনে করে থাকি। একইভাবে যাঁরা তাঁদের জ্ঞান অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে থাকেন তাঁদের লোকেরা সফিস্ট বলে। তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞান জগতের গণিকা। কিন্তু যদি উপযুক্ত কোন ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয় এবং ঐ ব্যক্তি যদি বন্ধুকে তাঁর জ্ঞান প্রদান করেন তবে আমরা তাকে উত্তম ও সম্মানিত নাগরিক গণ্য করে থাকি।" সক্রেটিসের মতে যে সব শিক্ষক অর্থ উপার্জনের জন্য পড়িয়ে থাকে তারা জ্ঞানের জগতে বারবনিতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ কামাই নয়। তাই তাঁর মতে পণ্ডিতদের জীবনে দারিদ্র্য হল অত্যন্ত প্রত্যাশিত।

সক্রেটিসের এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন সফিস্ট দার্শনিক ঘরানার নেতা প্রোটাগোরাস। সফিস্ট শব্দের উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ সফিস্টাই (sophistai) হতে। এর শাব্দিক অর্থ হল জ্ঞানের শিক্ষক। প্রোটাগোরাস বিশ্বাস করতেন, বিদ্যার মূল লক্ষ্য হল বাস্তব জীবনে সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা। তাই তিনি বিদ্যার্থীদের গার্হস্থ্য ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, ভাবের কার্যকর প্রকাশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্যকভাবে উপলব্ধি ও পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াবলীর বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। যেহেতু ব্যবহারিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য মুনাফাজনক ছিল সেহেতু শিক্ষাদানের জন্য তিনি অত্যন্ত চড়া মজুরি দাবি করতেন। প্রতি ছাত্রের শিক্ষার জন্য তিনি প্রায় দশ হাজার দ্রাকমা গ্রহণ করতেন। দ্রাকমা হল রৌপ্যমুদ্রা। প্রাচীন এথেন্সে প্রতি দ্রাকমাতে এক বুশেল গম পাওয়া যেত। বর্তমান বাজার দরে দশ হাজার দ্রাকমা কমপক্ষে পঁচিশ হাজার ডলার হবে। আজকের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেও এত টাকা লাগে না। পড়ানোর জন্য এত চড়া মজুরি আদায় করাকে প্রোটাগোরাস মোটেও অন্যায় মনে করতেন না।

তৃতীয় মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন এরিস্টিপাস। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সক্রেটিসের সাথে একমত ছিলেন না। অন্যদিকে তিনি প্রোটাগোরাসের সাথেও একমত নন। তিনি বলতেন যে, বিদ্যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যও নয়, ঐশ্বর্যও নয়। বিদ্যা আমাদের শিক্ষা দেবে কিভাবে এদের সমন্বয় করতে হবে। বিদ্যা শিক্ষা করে শিক্ষার্থীদের ঐশ্বর্যের দাস হলে চলবে না, বরং ঐশ্বর্যের প্রভু হতে হবে। সক্রেটিস অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাকে দেহব্যবসায়ের সাথে তুলনা করতেন। এরিস্টিপাস অবশ্য দেহব্যবসাকেও খারাপ বলে স্বীকার করতেন না। একজন বারবনিতার সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে এক বন্ধু তাঁকে বিদ্রূপ

করাতে এরিস্টিপাস নাকি বলেছিলেন যে, অন্যের ব্যবহৃত বাড়ি বা অন্যের ব্যবহৃত জাহাজ ব্যবহারে যদি আপত্তি না থাকে তবে অন্যের ব্যবহৃত রমণীর (বারবনিতা) সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্লানি থাকবে কেন?[৩]

প্রাচীন গ্রীসের অনুরূপ বিতর্ক প্রাচীন চীনেও দেখা যায়। কনফুসিয়াস ও তাঁর শিষ্যরা অর্থের বিনিময়ে পড়াতেন। কনফুসিয়াস মনে করতেন যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল, ভবিষ্যতের আমলাদের (ম্যান্ডারিনদের) প্রশিক্ষণ প্রদান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যান্ডারিনদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হলে সমাজে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে দার্শনিক লাও জু বিদ্যার সুফল সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, জ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে বদমাশদের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। বিদ্যা জ্ঞান নয়। লাও জু মনে করতেন যে, বিদ্বানরা দেশ চালাতে গেলে সর্বনাশ হবে। শাসকদের বিদ্যা কম থাকলে দেশ ভালভাবে চলবে। শুধু বিদ্যা লাভ করলেই চলবে না, প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাই তাঁর মতে শিক্ষকদের শিক্ষা নয়, হৃদয়ে নীরবতা হল জ্ঞানের প্রথম সোপান। বিদ্যার উদ্দেশ্য পার্থিব সাফল্য নয় অথবা সাফল্যের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা নয়। বিদ্যার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।[৪]

প্রাচীন ভারতে মনুস্মৃতিতে তিন ধরনের শিক্ষকের উল্লেখ রয়েছে।[৫] সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে উপাধ্যায়। বাংলার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণরা এই উপাধ্যায় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বর্ধমান জেলার চট্ট বা চাটুতি গ্রামের উপাধ্যায়রা হলেন চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলার গাঙ্গুল (বা গঙ্গুর) গ্রামের উপাধ্যায়রা পরবর্তীতে পরিচিত হলেন গাঙ্গুলী বা গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্য গ্রামের উপাধ্যায়রা হলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখটী গ্রামের উপাধ্যায়রা হলেন মুখোপাধ্যায়। মনুস্মৃতি অনুসারে উপাধ্যায়ের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এরা জীবিকা অর্জনের জন্য পড়িয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এরা সম্পূর্ণ বেদ পড়াতে পারেন না; বেদের অংশ অথবা বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থসমূহ পড়িয়ে থাকেন। উপাধ্যায়গণ জীবিকার জন্য পড়ালেও তাঁরা শুধু উচ্চবর্ণের লোকদেরই পড়াতে পারেন। অর্থের বিনিময়ে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের পড়ালে পাপ হবে। মনুস্মৃতি অনুসারে দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষকরা হলেন আচার্য। মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪০ নং শ্লোকে আচার্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আচার্য হলেন সেই দ্বিজ ব্যক্তিত্ব যিনি বেদের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এবং আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাদিসহ বেদ পড়ান। তিনি সাধারণত বেতন অথবা উপহার গ্রহণ করেন। আচার্য কর্তৃক উপহার গ্রহণকে লঘু অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থের বিনিময়ে যাঁরা বেদ পড়েন বা পড়ান তাঁদের কেউই দেবতার প্রসাদ পাওয়ার যোগ্য নন। তবে শিক্ষা সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীরা আচার্যকে উপহার দিতে পারেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক হলেন গুরু। যে পুরোহিত আচার অনুষ্ঠান পালন করেন এবং শিশুর অন্নপ্রাশন করেন তিনি হলেন গুরু। গুরু হচ্ছেন মাতা ও পিতার মতই শ্রদ্ধেয়। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেই চূড়ান্ত সত্য জানা সম্ভব। প্রাচীন কালে শিষ্যরা গুরুগৃহে বাস করতেন। গুরুর পক্ষে শিষ্যদের ভরণপোষণ সম্ভব না হলে শিষ্যরা ভিক্ষা করতেন। তাছাড়া যেখানে

শিষ্যরা গুরুর আশ্রমে বাস করতেন সেখানে তাঁরা কৃষি ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতেন। কাজেই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক, পার্থিব নয়। শিক্ষা সীমিত ছিল শুধু উচ্চবর্ণের লোকদের ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার মধ্যে। গুরুগণ শিষ্যদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারেন না। এই ঐতিহ্য দক্ষিণ এশীয় সঙ্গীত জগতে বর্তমান শতাব্দীতেও চালু ছিল। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানকে মাইহারের রাজা তাঁর সঙ্গীতগুরু হিসাবে বরণ করতে চান। কিন্তু আলাউদ্দিন খানের গুরু তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, সঙ্গীত শিখিয়ে অর্থ উপার্জন করা যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে মাইহারের মন্দিরের ট্রাস্ট থেকে ওস্তাদ আলাউদ্দিনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। তিনি রাজাকে সঙ্গীত শেখান, কিন্তু রাজার কর্মচারী হিসাবে নয়। প্রাচীন যুগের মতই মধ্যযুগেও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকরা বেতন নিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সচ্ছল ছিলেন না। মুসলিম-বিশ্বে উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী আইনে দক্ষতা অর্জন। মধ্যযুগে মুসলিম মাদ্রাসাসমূহ প্রধানত পরিচালিত হত ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে। বিশেষ বিশেষ বিষয় পড়ানোর জন্য অনেক মাদ্রাসাতে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে মুদাররিস-এর পদ সৃষ্টি করা হত। মধ্যযুগের শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করলেও শিক্ষা ধর্মের জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সর্বত্র অধিকাংশ দার্শনিকই শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের একটি নিছক নিমিত্ত হিসাবে মেনে নেননি। বরং তাঁরা অর্থের প্রতি আকর্ষণকে হেয় গণ্য করেছেন। তাই একজন দার্শনিক যথার্থই বলেছেন[৬]: "The advantage of classical education is that it enables you to despise the wealth which it prevents you from achieving." (ধ্রুপদী শিক্ষার একটি সুবিধা হল যে এ শিক্ষা শুধু বিত্ত অর্জনের পথে একটি প্রতিবন্ধকই নয়, এ শিক্ষা বিত্তকে ঘৃণা করতেও শেখায়।) অধিকাংশ দার্শনিকই তাই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকগণ দারিদ্র্যকে শুধু সহ্যই করেননি, অনেকে বিত্তের অভাব নিয়ে গর্ববোধ করতেন। গ্রীসের একনায়ক ডায়নোসিয়াস দার্শনিক এরিস্টিপাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, দার্শনিকগণ কেন বিত্তবানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, অথচ ঐশ্বর্যশালীরা দার্শনিকদের খুঁজে বেড়ায় না। দার্শনিক এরিস্টিপাস জবাব দিয়েছিলেন, "দার্শনিকগণ জানে তারা কি চায়, অথচ ধনীরা তা জানে না।" দার্শনিক এন্টিফেনিস ছেঁড়া কাপড় পরতেন। সক্রেটিস তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন, এন্টিফেনিসের পোষাকের প্রতিটি ছিদ্রে তাঁর দম্ভ দেখা যায়।

অবশ্য সকল দার্শনিকই দারিদ্র্যের নন্দিত পথ বেছে নেননি। এঁদের অনেকেই নিজের বিদ্যাকে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থ্যালিসের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। থ্যালিস তাঁর বিদ্যা প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। একবার আবহাওয়া দেখে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, ঐ বছর জলপাইয়ের ফলন খুব ভাল হবে। গ্রীসে জলপাই প্রধানত ব্যবহৃত

হয় তেল উৎপাদনের জন্য। থ্যালিস তাঁর শহরের সবগুলি তেলের ঘানি বায়না দিয়ে রাখেন। যখন জলপাই ঘরে তোলা হল সবাই ছুটলেন তেলের ঘানি ভাড়া নেওয়ার জন্য। কিন্তু থ্যালিস সব তেলের ঘানিতেই বায়না দিয়ে রেখেছেন। কাজেই থ্যালিসকে অতিরিক্ত মুনাফা দিয়ে তেলের ঘানি ভাড়া নিতে হয় অন্যদের। ফলে থ্যালিস রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিদ্যা ছিল উচ্চবিত্তের অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ ছিল সীমিত। গত কয়েক শ' বছর ধরে অভাবিতপূর্ব কারিগরী পরিবর্তন মানুষের উৎপাদনশীলতা অতি নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কারিগরী পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে বিস্মিত হয়ে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস লিখেছিলেন[৭]:

> It has been the first to show what man's activity can bring about. It has accomplished wonders far surpassing Egyptian Pyramids, Roman aqueducts and Gothic cathedrals, it has conducted expeditions that put in the shade all former Exoduses of nations and Crusades.
>
> (পুঁজিবাদ প্রথম দেখিয়েছে মানুষের কার্যকলাপ কত বড় মাপের পরিবর্তন আনতে পারে। এর বিস্ময়কর কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পানির অবকাঠামো ও গথিক উপাসনালয়কে হার মানিয়ে দিয়েছে, এর অভিযানসমূহ প্রাচীন কালে জাতিসমূহের অভিবাসন ও ক্রুসেডসমূহকে ম্লান করে দিয়েছে।)

গত দেড় শ বছরে যে সব কারিগরী পরিবর্তন ঘটেছে উনিশ শতকে মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে তা ছিল অকল্পনীয়। উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের কথা স্মরণ করা যায়। গত চল্লিশ বছরে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম্পিউটারের দাম যে হারে কমেছে সে হারে উড়োজাহাজের প্রযুক্তি পরিবর্তিত হলে একটি বোয়িং ৭৬৭ উড়োজাহাজ মাত্র ৫০০ ডলারে বিক্রয় সম্ভব হত এবং কম্পিউটারের প্রযুক্তিতে যে হারে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে সে হারে উড়োজাহাজের প্রযুক্তি পরিবর্তন হলে ২০ লিটার তেলে ২০ মিনিটে একটি উড়োজাহাজ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারত।[৮] উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে এত দ্রুত কারিগরী পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে হবে না তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। দ্রুত কারিগরী পরিবর্তনের ফলে আজকের বিশ্বে জ্ঞানই হল উন্নয়নের চাবিকাঠি এবং জ্ঞানই হল উন্নয়ন। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৮/৯৯ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য উৎপাদনে যত শ্রমিক নিয়োজিত তার চেয়ে অনেক বেশি লোক কাজ করছে জ্ঞানের উৎপাদনে ও বিতরণে।[৯] এ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল তিন লাখের কম, আজকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এক কোটি চল্লিশ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত।[১০]

গত দু'শ বছর ধরে অভূতপূর্ব কারিগরী পরিবর্তনের ফলে জ্ঞানের জগতে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে। এর দুটি ফলশ্রুতি দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, বিদ্যার বিষয়বস্তুতে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন বিশ্বে জ্ঞান (knowledge) এবং নৈপুণ্য (techne) এর মধ্যে তফাৎ করা হতো।[১১] জ্ঞানের মত নৈপুণ্যও অর্জন করতে হয়। কিন্তু নৈপুণ্য জ্ঞান নয়। নৈপুণ্য সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। একই নৈপুণ্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়–ভিন্ন ভিন্ন পেশার চাহিদা অনুসারে নৈপুণ্য গড়ে ওঠে। জ্ঞানের সাথে জড়িয়ে আছে মূল্যবোধ আর জীবন-জিজ্ঞাসা। কিন্তু নৈপুণ্য মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ। দার্শনিকদের কাছে নৈপুণ্য হেয় মনে হলেও, আধুনিক বাজারে নৈপুণ্যের চাহিদা আছে, জ্ঞানের নেই। তাই আধুনিক বিশ্বে নৈপুণ্য জ্ঞানের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা তাই জ্ঞানের স্থান দখল করেছে, শিক্ষানবিসের কর্মসূচী পাঠ্যপুস্তকে রূপান্তরিত হয়েছে, পেশা সংক্রান্ত গোপন জ্ঞান ব্যবসায়ের পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ফলিত জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে। জ্ঞানের সাথে অর্থের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ, নৈপুণ্যের সাথে আয়ের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। বিদ্যার আধ্যাত্মিক ভিত্তি যত দুর্বল হচ্ছে ততই তার বস্তুবাদী ভিত্তি হয়ে উঠছে সুদৃঢ়।

দ্বিতীয়ত, আজকের বিশ্বে শিক্ষার চাহিদা মানুষের জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা দ্বারা নির্ণীত হয় না। নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে। শিক্ষা একটি বিনিয়োগ – যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় রয়েছে। মুনাফার হার আকর্ষণীয় হলেই বিনিয়োগকারীরা শিক্ষার বিশেষ শাখায় আকৃষ্ট হয়। যেখানে মুনাফা বেশি সেখানেই বিনিয়োগ বেশি হয়। অবশ্য মানবিক পুঁজির এ সরলীকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু পয়সা খরচ করলেই বিদ্যা অর্জন সম্ভব হয় না, এর জন্য প্রয়োজন সহজাত যোগ্যতা ও পরিশ্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রদানের পদ্ধতিতে সহজাত যোগ্যতার বাছাই সম্ভব হয়। কাজেই অনেক অর্থনীতিবিদ্ বিদ্যাকে বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য না করে যোগ্যতার বাছাই (screening) এবং যোগ্যতার সংকেত প্রক্রিয়া (signalling device) হিসাবে গণ্য করে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃত মুনাফা যাই হোক না কেন, এধরনের শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষা আর অর্থের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক অসাম্যের কোন প্রত্যক্ষ সহগমন ছিল না। যখন বিদ্যা ও অর্থের সম্পর্ক ছিল দুর্বল তখন শিক্ষকদের নিষ্কর্মা মনে করা হত। এক সময়ে তাই শিক্ষকদের ঠাট্টা করে বলা হত: "Those who can, do. Those who cannot, teach. Those who cannot teach, teach the teachers" (যারা পারে, করে। যারা পারে না, তারা শেখায়। যারা শেখাতে পারে না, তারা শিক্ষকদের শেখায়।) আজকের বিশ্বে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। যারা উৎপাদনে নৈপুণ্য প্রয়োগ করছে তাদের চেয়ে বেশি বেতন না দিলে উপযুক্ত শিক্ষকই পাওয়া যাবে না। আজকের উপযুক্ত শিক্ষকদের সমস্যা তাই আয়ের নয়, তাদের সমস্যা হল আয়করের। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আয়ের দিক থেকে

প্রতিভাবান শিক্ষকরা চলচ্চিত্রের তারকা বা ফুটবল খেলোয়াড়দের খুব বেশি পেছনে নেই। এঁদের অনেকেই আবার শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে শুধু নিজেরাই বড়লোক হচ্ছেন না, তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড কেইনস ও এম, আই, টি'র স্যামুয়েলসনের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। এঁরা শুধু পণ্ডিতই নন, এঁরা প্রচুর অর্থ কামাই করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা কল্পনা করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে "নতুন মানুষের" আবির্ভাব ঘটবে এবং রাষ্ট্রের সহায়তায় দরিদ্ররা শিক্ষা লাভ করলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে যাবে। এ দুটো কল্পনার একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষা মানুষের খাসলত মোটেও পরিবর্তন করতে পারেনি। "নতুন মানুষের" স্বপ্ন তাই আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে অর্থনৈতিক অসাম্যও তিরোহিত হয়নি। জর্জ অরওয়েলের ভাষায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় "All animals are equal but some animals are more equal than others." (সকল জন্তুই হল সমান, তবে কোন কোন জন্তু অন্যদের তুলনায় অধিকতর সমান।) পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের দ্রবীভবনের সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষাভিত্তিক অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে চলছে।

একজন অর্থনীতিবিদ্ আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে "বাজিমাৎ সমাজ" (winner-take-all-society) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১২] বাজিতে যেমন বিজেতা সম্পূর্ণ বাজিকৃত অর্থ পেয়ে যান তেমনি আজকে যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন। অথচ যাঁরা প্রতিভাবান নন, তাঁরা কিছুই পান না। আশির দশকের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি বড় কোম্পানীর প্রধান নির্বাহীরা গড়ে শ্রমিকদের চেয়ে ৩৫ গুণ বেশি বেতন পেতেন। আশির দশকের শেষ দিকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা সাধারণ শ্রমিকদের গড় বেতনের ১৫৭ গুণ বেশি পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। ১৯৮৪ হতে ১৯৯২ সময়কালে ফ্রান্স, ইটালি ও যুক্তরাজ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের বেতন তিন গুণ বেড়েছে; জার্মানিতে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।[১৩]

অধ্যাপক রবার্ট বি রিখ (Robert B. Reich) শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে আশির দশকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।[১৪] তাঁর হিসাব অনুসারে যে সব শ্রমিক মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের প্রকৃত আয় ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৭ সময় কালে ১২ শতাংশ কমেছে। যারা মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাদের আয় ১৮ শতাংশ কমেছে। অথচ যারা কলেজে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের আয় সামান্য বেড়েছে। ১৯৮০ সালে একজন স্নাতকের আয় যারা কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি তাদের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৯০ সালে এ প্রভেদ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এ ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র জাপানে এ বৈষম্য এত প্রকট নয়।

ব্যক্তির জীবনে অসাম্যের যে প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল, তা বিভিন্ন দেশের মধ্যেও বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সমাজ থেকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উত্তরণ ঘটছে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কারিগরী পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব কমে গেছে। ১৯৭৫ হতে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দাম প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কিছুদিন আগেও পুঁজির অভাব ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে পুঁজি আজ অত্যন্ত সচল। লাভজনক প্রকল্পের জন্য পুঁজি আজকে বড় সমস্যা নয়। আজকের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জনশক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনশক্তির নৈপুণ্যে ও জ্ঞানে বিনিয়োগ মোট সম্পদের ৬০ শতাংশ, মাত্র ৪০ শতাংশ সম্পদ হল প্রাকৃতিক সম্পদ। জাপানে মানব সম্পদে বিনিয়োগ মোট সম্পদের ৮০ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা – যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে – সেখানে অবশ্য এখন মানব সম্পদে বিনিয়োগ মোট সম্পদের মাত্র ২০ শতাংশ।[১৫]

জ্ঞানভিত্তিক সমাজের (knowledge society) উদ্ভব উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য একদিকে খুশির খবর অন্যদিকে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। খুশির খবর এ জন্য যে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌত পুঁজির অপ্রতুলতা রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌত পুঁজি ছিল সীমিত কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক সমাজে জ্ঞানের অসীম ব্যবহার সম্ভব। টমাস জেফারসন যথার্থই বলেছেন[১৬]:

> He who receives an idea from me receives instruction himself without lessening mine, as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me.
>
> (কেউ যদি আমার কাছ থেকে নতুন ধারণা পায় সে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজে শিক্ষা লাভ করে, যেমনি কেউ যদি তার মোমবাতি আমারটিতে জ্বালায় তবে সে আমাকে আঁধারে নিমজ্জিত না করে নিজে আলো লাভ করে।)

দ্বিতীয়ত, পুঁজি বা প্রাকৃতিক সম্পদের মত জ্ঞান কুক্ষিগত করে রাখা সম্ভব নয়। নতুন ধারণা অনেক সহজে অনুকরণ করা সম্ভব। কাজেই উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে। তবে এ সম্ভাবনা নিজে নিজে বাস্তবায়িত হবে না। তার জন্য প্রয়োজন হবে পরিকল্পিত ভিত্তিতে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

অবশ্য সাফল্যের সম্ভাবনা যেমন বেড়েছে তেমনি বিপদের আশঙ্কাও বেড়েছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের ব্যবধান স্থিতিশীল থাকবে না। বৈপ্লবিক কারিগরী পরিবর্তনের ফলে যে সব দেশ নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না তারা উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়বে। দুটি কারণে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবধান বাড়তেই থাকবে। প্রথমত, জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কমবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ যদি দ্রুত অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ

জনশক্তিতে রূপান্তর না করতে পারে তবে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বে মজুরি কমতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, কাঁচামালের মূল্য কমে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল কাঁচামাল। তাই তাদের আয় কমে যাবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের আজ তাই হয় এগিয়ে যেতে হবে অথবা পিছিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যেখানে অবস্থান করছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। আজকের উন্নয়নশীল দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল উন্নত দেশের সাথে জ্ঞানের ফারাক (knowledge gap) হ্রাস করা।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তিন ধরনের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বদ্ধ ধারণা জন্মেছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল হার-জিতের খেলা (zero sum game), এ খেলাতে শিল্পোন্নত দেশসমূহ জিতছে আর উন্নয়নশীল দেশসমূহ হারছে। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহ আত্মরক্ষার জন্য সংরক্ষণবাদী অন্তর্মুখী রুদ্ধদ্বার অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল। জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় রুদ্ধদ্বার অর্থনীতি বাইরের দুনিয়ার জ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে অনুন্নয়নের কৃষ্ণ গহ্বর উদ্ভাসিত করার সুযোগ দিচ্ছে না। কাজেই বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে হলে বহির্মুখী ও উন্মুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজ খুব সোজা নয়। শুধু অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং মানব সম্পদের দ্রুত উন্নয়নের জন্য অনুকূল ও উদ্দীপক অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, যারা যোগ্যতর তাদের জন্য উচ্চতর আয় নিশ্চিত করতে হবে। যারা ভাল তাদের পুরস্কৃত করতে হবে এবং যারা খারাপ তাদের শাস্তি দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক শহরের একজন বিখ্যাত গণিত শিক্ষকের উপদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের মনে রাখতে হবে। নিউইয়র্ক শহরের একজন গণিত শিক্ষক ছিলেন যাঁর ছাত্ররা সব সময়েই পরীক্ষাতে খুব ভাল করত। অথচ একই স্কুলে একজন কনিষ্ঠ শিক্ষকের ছাত্ররা তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও খুব খারাপ করছিল। কনিষ্ঠ শিক্ষক বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর ছাত্ররা এত ভাল কিভাবে করে। বিখ্যাত শিক্ষক জবাব দিলেন, "আমি সব সময়েই ছাত্রদের পিঠ চাপড়াই।" কনিষ্ঠ শিক্ষক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "পিঠ চাপড়ালেই কি ছাত্ররা ভাল করবে?" বিখ্যাত শিক্ষক জবাব দিলেন, "পিঠ চাপড়ানোর কায়দা জানা চাই। যারা ক্লাসে ভাল করে অঙ্ক করবে তাদের আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়াবে, আর যারা খারাপ করে তাদের জোরে জোরে পিঠ চাপড়াবে।" উন্নয়নশীল দেশসমূহকেও ভাল আর খারাপের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। এ ধরনের নীতি অনুসরণ করলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এতে ভাল ও খারাপ–সকল ধরনের নাগরিকরাই উপকৃত হবে। কিন্তু সাথে সাথে ভাল

ও খারাপের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্যও বেড়ে যাবে। যে অর্থব্যবস্থায় বিদ্যা বিপণনযোগ্য পণ্য সেখানে শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

## তথ্যসূত্র


১. Bloom, Allan, *The Closing of the American Mind* (New York : Simon and Schuster, 1987), p. 122

২. Durant, Will, *The Life of Greece* (New York : Simon and Schuster, 1966), p. 363

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৫

৪. Durant, Will, *Our Oriental Heritage* (New York : Simon and Schuster, 1966), pp. 31-32

৫. Doniger, Wendy and Smith, Brian K., tr., *The Laws of Manu* (New Delhi: Penguin Books India, 1991), pp. 31-32

৬. রাসেল গ্রীনের উদ্ধৃতি, দেখুন Laurence J. Peter, *Peter's Quotations* (New York: Quill, 1977), p. 172

৭. Marx, Karl and Engels, Frederich, *Selected Works*, vol. I (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962), p. 97

৮. World Bank, *World Development Report*, 1998/99 (New York : Oxford University Press, 1999), p. 23

৯. *প্রাগুক্ত*

১০. Clotfelter, Charles T., "The Familiar but Curious Economics of Higher Education : Introduction to a Symposium", *The Journal of Economic Perspectives*, Winter, 1999, p. 1.

১১. Drucker, Peter F., *Post-capitalist Society* (New York : Harper Business, 1994), pp. 57-58

১২. Thurow, Lester, *The Future of Capitalism* (London : Nicholas Brealey Publishing, 1996), p. 21.

১৩. Thurow, Lester, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২১

১৪. Reich, Robert. B, *The Work of Nations* (New York : Vintage Books, 1992). pp. 208-224

১৫. Thurow, Lester, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯

১৬. World Bank, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১৬

# সোনার বাংলা : অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

"আমার সোনার বাংলা" রবীন্দ্রনাথ কখন লিখেছেন তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ১৮৯৭ সালে নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে "সোনার বাংলা" প্রথম গাওয়া হয়েছিল।[১] ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পালের সিদ্ধান্ত হল যে, গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালে রচিত হয়।[২] পালের অনুমান সঠিক হলে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখেছিলেন। আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মারা যান। জন্মভূমির প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিবিড় মমত্ববোধ এই মধুর সঙ্গীতে সঞ্চারিত তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৯০৫ সালে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, "এবারকার যে আন্দোলনে দেশের হৃদয় জাগ্রত হইয়াছে তাহাকে যাহারা ছলনা করিয়া বিদ্রূপ করিতে পারে তাহারা শয়তানের চেলা।"[৩] সারা জীবনই শয়তানের চেলারা রবীন্দ্রনাথকে জ্বালিয়েছে। ঈর্ষা, লোকনিন্দা ও দলাদলির অচলায়তনে অবরুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক সময় মনে হয়েছে যে, গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা "কুকুরের ল্যাজে ঝুম-ঝুমি বেঁধে" যেভাবে তাড়িয়ে বেড়ায় তেমনি তাঁকেও সারা জীবন নিগৃহীত করা হয়েছে।[৪] রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী জানাচ্ছেন যে, দুঃখ করে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন, "একদিন লিখেছিলুম 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে'। মরার আগে নিজের হাতে এ লাইনটি কেটে দিয়ে যাব"।[৫] ভাগ্যিস বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে অল্পের জন্য পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে রেহাই দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুবছরের মধ্যে তাঁর "সোনার বাংলাতে" অনাহারে ত্রিশ লাখ লোক মারা যায়।[৬] পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বেঁচে থাকলে তাঁর দুর্ভাগা দেশকে কি অভিধায় কবিগুরু আখ্যায়িত করতেন আজ তা অনুমান করা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ "সোনার বাংলা" বাগ্‌ধারাতে 'সোনার' বিশেষণটি কি অর্থে যোগ করেছেন সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মনে কোন সন্দেহ নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন সোনার বাংলার অর্থ হল : "স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি।"[৭] রবীন্দ্রনাথের

আগেই এ অর্থে "সোনার বাংলা" বাগধারাটির প্রচলন দেখা যায়। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত "হুতোম পেঁচার নকসায়" উল্লেখ রয়েছে "হ্যানো সোনার বাংলা খান, পোড়াল নীল হনুমানে।" নীল বিদ্রোহের লোকগীতির একটি চরণে বলা হয়েছে, "নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লে ছারখার।" পণ্ডিতদের যুক্তি অকাট্য। তবু গানটি পাঠ করে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। গানটিতে মূলত বাংলাদেশের ঐশ্বর্য বা উৎপাদনশীলতা তুলে ধরা হয়নি (কবি অবশ্য অগ্রহায়ণের "ভরা ক্ষেতের" কথা বলেছেন। কিন্তু সব সময়েই যদি ফসলের ছড়াছড়ি থাকত তবে মায়ের "বদন খানি মলিন" হত না এবং কবিকেও নয়ন জলে ভাসতে হত না।), গানটিতে রয়েছে বাংলাদেশের অনুপম নিসর্গের বন্দনা। সোনা শব্দটির একটি অর্থ হল অতি আদরের ধন (যথা সোনা ভাই আমার, সোনার ছেলে)। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, "সোনার বাংলা" কি কবিগুরু "অতি প্রিয় বাংলা" অর্থে ব্যবহার করেছেন? ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ আমার সঙ্গে একমত হবেন না। তাঁদের মতে "সোনার বাংলা" শুধু কবির রূপক নয়, "সোনার বাংলা" ইতিহাসের বাস্তবতা। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা ছিল পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্ছলিত অমরাবতী। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে, ব্রিটিশরা জয় করার আগে এ দেশ শুধু অপূর্ব রূপময়ই ছিল না, অমিত ঐশ্বর্যশালীও ছিল। ইংরাজ শাসনের আগে এ দেশে কোন দুর্ভিক্ষ ঘটেনি। এখানে দ্রব্যমূল্য ছিল অত্যন্ত সস্তা। তাই সাধারণত জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত উন্নত। অসাধারণ প্রাচুর্যের এ দেশে দারিদ্র্য ছিল অজানা। বাংলাদেশ তাই মোগল আমলে "জান্নাত-আবাদ" (স্বর্গপুরী) ও "জান্নাত-আল-বিলাদ" (জনপদসমূহের স্বর্গ) নামে পরিচিত ছিল।[৮]

সোনার বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অবশ্য মূলধারার অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে, প্রাক-শিল্প-বিপ্লব সমাজে এ ধরনের নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক সমৃদ্ধি মোটেও সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক ও প্রকরণগত মতবিরোধ সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে প্রাক-শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্ময়কর ঐকমত্য রয়েছে। এ সম্পর্কে ধ্রুপদী, নব্যধ্রুপদী, কেইনসীয় (Keynesian) ও মার্কসীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। ধ্রুপদী (classical) অর্থনীতিবিদ্দের মতে প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব সমাজ ছিল ম্যালথুসীয় ফাঁদে (Malthusian trap) বন্দী। রিকার্ডোর মজুরি সম্পর্কে অমোঘ বিধির (iron law) বক্তব্য হল, শ্রমিকদের মজুরির হার দীর্ঘ মেয়াদে বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম মজুরির প্রয়োজন (subsistence wage) তার চেয়ে বেশি থাকতে পারে না। মজুরি বাড়লে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে মজুরির হার অথবা জীবনযাত্রার মান উচুঁ রাখা সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুসের বিশ্লেষণে প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করত দুর্ভিক্ষ। এ ধরনের অর্থনীতিতে মজুরির হার বেড়ে গেলেই জনসংখ্যা বেড়ে যেত; এর পরিণামে মজুরি আবার নেমে আসত এবং এক পর্যায়ে আয়ের স্বল্পতার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যা কমে গেলে আবার মজুরি বেড়ে যেত। এমনি করে

চক্রাকারে মজুরির হার বাড়ত, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মজুরির হার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরির পর্যায়ে থাকত।

যদিও নব্যধ্রুপদী ও কেইনসীয় অর্থনীতিবিদ্গণ আজকের অর্থনীতিতে ধ্রুপদী অর্থনীতির সূত্রসমূহ অচল গণ্য করেন, তবু প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব সমাজ সম্পর্কে ধ্রুপদী বিশ্লেষণ তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য। নব্যধ্রুপদী ধারার দু'জন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এ ধরনের সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন : "যদি আমরা মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থনৈতিক জীবন আধুনিক মানদণ্ডে বিচার করি, তা হলে দেখতে পাব যে জীবন ছিল বিরামহীন দুর্দশা ... দুর্দশার যুগকে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সে সব যুগকে গ্রাম্য সারল্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে সব যুগ স্বর্ণযুগ ছিল না।[৯] বিংশ শতকের সেরা অর্থনীতিবিদ্ কেইনসও একই ধরনের মত পোষণ করতেন। কেইনস লিখেছেন : "প্রাচীনতম সময় যখন থেকে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ধরুন, খৃষ্ট জন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোন বড় পরিবর্তন হয়নি। উঠানামা হয়েছে নিশ্চয়ই। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধও দেখা দিয়েছে। কখনও এসেছে সোনালী বিরতি। কিন্তু প্রগতিশীল কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।"[১০] প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণাও ছিল একই ধরনের। তিনি বলেছেন যে, হিন্দুস্থানের সোনালী যুগে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে "মর্যাদাহানিকর, স্থবির ও প্রগতিবিহীন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে ভারতের গ্রাম্য সমাজ ছিল "ক্ষুদ্র, আধা-বর্বর ও আধা-সভ্য সমাজ।"[১১]

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হতে "সোনার বাংলা" একটি অলীক কল্পনা মাত্র, বাস্তবে এর অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য ঐতিহাসিকগণ অর্থনীতিবিদ্দের তাত্ত্বিক যুক্তি মানেন না। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতেই প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব। তাঁরা তাই ঠাট্টা করে বলেন:

> An economist is someone who takes something that works in practice and wonders whether it will work in theory.
>
> (অর্থনীতিবিদ্ হলেন এমন ধরনের ব্যক্তি যিনি কোন কিছু বাস্তবে কাজ করছে দেখলেও তত্ত্ব অনুসারে তা কাজ করছে কি না তা নিয়ে মনে মনে উদ্বিগ্ন থাকেন।)

পক্ষান্তরে অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে, তত্ত্ব ছাড়া কোন তথ্যের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যাঁরা দাবি করেন যে, তত্ত্ব ছাড়া শুধু উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব, তাঁরাও এক ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। অর্থনীতিবিদ্ আলফ্রেড মার্শাল মনে করতেন যে, যাঁরা দাবি করেন যে, উপাত্তই ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট, তাঁরা হচ্ছেন সব চেয়ে বেপরোয়া ও বিপজ্জনক তাত্ত্বিক। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি, কোন দিন হবে কি না জানি না। তাই "সোনার বাংলা" সম্পর্কে

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আমাদের ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রচলিত ঐতিহাসিক উপাত্তসমূহের ব্যাখ্যা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই যা বলা হচ্ছে, তার উল্টোটিও সত্য।

"সোনার বাংলা" তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলাদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ কম হয়েছে, এ কথা হয়ত অনেকাংশে সত্যি। কিন্তু আদৌ দুর্ভিক্ষ হয়নি এ অনুমান ঠিক নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্তত তিনটি দুর্ভিক্ষের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম অভিলিখনে রয়েছে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা। মহাস্থানলিপি সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের দু'শ বছর আগে লিখিত হয়। দুজন ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত অভিলেখের নিম্নরূপ ইংরাজি অনুবাদ করেছেন[১২]:

> To Gobardhana of the Samvamgiyas was granted by order (or To the Samvamgiyas was given by order sesamum and mustard seeds). The sumatra will cause it to be carried out from the prosperous city of Pundranagara (And likewise) will cause paddy to be granted to the Samvamgiyas. In order to tide over the outbreak of distress caused by flood (or fire or superhuman agency) and insect (lit. parrots) in the city, this granary and treasury will have to be replenished with paddy and Gandaka coins.
>
> (সংবঙ্গীয়দের গোবর্ধনকে নির্দেশ দেওয়া হয় (অথবা আদেশ অনুসারে সংবঙ্গীয়দের তিল ও সর্ষে বীজ দেওয়া হয়)। সুমাত্র সমৃদ্ধশালী পুণ্ড্রনগর হতে এ আদেশ কার্যকর করবে। একই ভাবে সংবঙ্গীয়দের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করে বন্যা (অথবা অগ্নি ও অতিমানবিক কোন শক্তি) এবং পতঙ্গ (আক্ষরিক অর্থে তোতা পাখি) কর্তৃক সৃষ্ট দুর্দশা অতিক্রমণের জন্য। এই শস্যাগার ও রাজভাণ্ডারের শূন্যতা ধান্য ও গন্ধক মুদ্রায় পুনরায় পূরণ করা হবে।)

"সংবঙ্গীয়" শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন সংবঙ্গীয় হল বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অধিকাংশ পণ্ডিতরাই মনে করেন যে, সংবঙ্গীয় হল একটি জনগোষ্ঠী।[১৩] সংবঙ্গীয় শব্দের অর্থ যাই হোক দৈব দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের যে ব্যবস্থা মহাস্থান অভিলেখে উল্লেখিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন মতদ্বৈততা নেই। দ্বিতীয়ত, আনুমানিক নবম শতকে রচিত "মঞ্জুশ্রী মূলকল্প" গ্রন্থে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে মহাদুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে এ দুর্ভিক্ষ চতুর্থ শতাব্দীতে ঘটে। আবার কেউ কেউ মনে করেন দুর্ভিক্ষটি সম্ভবত সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে ঘটেছিল।[১৪] তৃতীয় দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে "ফতিয়া ইবরিয়া" গ্রন্থে। ১৬৬১ হতে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এ দুর্ভিক্ষ ঘটে। দীর্ঘ দু'হাজার বছরে মাত্র তিনটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অবশ্যই যুক্তি দেখানো সম্ভব যে, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটলেও তা অতি কদাচিৎ ঘটেছে। কিন্তু এ যুক্তি দুটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন সভাসদগণ। জনগণের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে

ধরা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁরা তাঁদের প্রভুদের গুণকীর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে জনগণের দুঃখ দুর্দশা চেপে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশির ভাগ দুর্ভিক্ষই অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকত; সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত না। তার কারণ হল বাংলাদেশে প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল বন্যা। বন্যায় সকল অঞ্চলে সমান ক্ষতি হয় না। যে সব অঞ্চল খরাপ্রধান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে সব অঞ্চলে শস্যহানি হয় ব্যাপক। তাই খরাজনিত দুর্ভিক্ষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়টি চাণক্যের দৃষ্টি এড়ায়নি। অর্থ শাস্ত্রে চাণক্য তাই লিখেছেন, "অতিবৃষ্টির চেয়ে খরা অনেক খারাপ"।[১৫] বন্যার ফলে আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ হত, কিন্তু সারা দেশে দুর্ভিক্ষ হত না। আঞ্চলিক খাদ্যাভাবের তথ্য সভাসদরা অনেক ক্ষেত্রে জানতেই পারত না। কাজেই এ ধরনের খাদ্যাভাবের বর্ণনা ইতিহাসের আকরগ্রন্থে নেই। অথচ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের অনেক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে। অনাহারের বর্ণনা রয়েছে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ "চর্যাপদে" (আনুমানিক দশম হতে দ্বাদশ শতকে রচিত)। উদাহরণস্বরূপ নীচের শ্লোকটি স্মরণ করা যেতে পারে :

টালিতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাঁড়ীতে মোর ভাত নাহি নিতি আবেশী।

(টিলাতে মোর ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত।) "সদুক্তিকর্ণামৃত" (তেরো শতকের প্রথম দিকে সংকলিত) গ্রন্থে অভাব অনটনের নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে :[১৬] "শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মত শীর্ণ, আত্মীয় স্বজনেরা মন্দাদর, পুরাতন ভগ্ন পাত্রে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে, গৃহিণীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র।"

ষোল শতকের কবি জয়ানন্দ তাঁর "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থে একটি আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষের নিম্নরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন[১৭]:

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল
ডাকা-চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া
নানা দেশে সর্ব লোক গেল পালাইয়া।

ময়মনসিংহের লোকগীতি মলুয়াতেও রয়েছে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা[১৮]:

চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে
"আশ্না পানিতে মাও সব শস্যি গেছে।"
মায়ে কান্দে পুতে কান্দে সিরে দিয়ে হাত
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।
হাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল
কি দিয়ে পালিবে মায় কুলের ছাওয়াল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে আকাল ও দারিদ্র্য সম্পর্কে এ ধরনের অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে সব সময়েই

আকাল ও দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত। প্রকৃত পরিস্থিতি হল এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় যখন ফসল ভাল হত তখন অধিকাংশ লোকই স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত কিন্তু প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিত। এর ফলে কোন কোন অঞ্চলে কখনও কখনও দুর্ভিক্ষ বা আকাল দেখা দিত। এ সব আকালের সময় অনেক ক্ষেত্রে গরীবরা দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে অভিবাসী হত। তবে মাঝে মাঝে আকাল সত্ত্বেও বাংলার লোকেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে উপর্যুপরি খরার ফলে অনেক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হত। তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতে দুর্ভিক্ষ সংঘটনের হার ও তীব্রতা ছিল অনেক কম। তবে সোনার বাংলাতে একেবারেই দুর্ভিক্ষ হয়নি এ ধরনের অনুমান আদৌ সঠিক নয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল বাংলায় বিস্ময়কর কম দাম সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ। চতুর্দশ শতকে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, "পৃথিবীতে আর কোথাও এত সস্তা দাম দেখিনি।" চীনা পর্যটক ওয়াং তু ওয়ান চৌদ্দ শতকে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর মতে বাংলায় জিনিসের দাম সস্তা ছিল। সপ্তদশ শতকে অনুরূপ বিবরণ লিখেছেন সিবাস্তিয়ান ম্যানরিক ও ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের। আপাতদৃষ্টিতে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য মনে হয়। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছে। বিদেশী পর্যটকদের আয় ছিল বাংলাদেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় অনেক বেশি। বিদেশী পর্যটকরা সোনার ও রূপার দিনারে জিনিষের দাম হিসেব করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতে সাধারণ লোকদের বিনিময়ের মাধ্যম স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। সাধারণ লোকেরা পণ্য কিনত ও বিক্রয় করত কড়িতে। যারা সোনার ও রূপার দিনারে আয় করত তাদের কাছে কড়িতে কেনা পণ্য সস্তাই মনে হবে। কিন্তু যারা কড়িতে আয় করত তাদের কাছে এ সব পণ্যের মূল্য সস্তা মনে হত না।

উদাহরণস্বরূপ ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্মরণ করা যায়। বাংলাদেশে জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন[১৯]:

> আমি আট দিরহামে আটটি তাজা মোরগ বিক্রয় হতে দেখেছি। এক দিরহামে পনেরটি কচি কবুতর পাওয়া যেত, দুই দিরহামে পাওয়া যেত একটি মোটাসোটা ভেড়া। আমি আর দেখেছি, ত্রিশ হাত লম্বা সর্বোত্তম মানের মিহি তুলার কাপড় দু' দিনারে বিক্রয় হয়েছে, সুন্দরী ক্রীতদাসী বিক্রয় হয়েছে এক দিনারে, যা মরক্কোর মূল্যে আড়াই দিনারের সমান।

ইবনে বতুতার বর্ণনা সম্পর্কে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, ইবনে বতুতা যখন দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি দিনারে ও দিরহামে দাম হিসাব করেছেন। অথচ ইবনে বতুতা নিজেই লিখেছেন যে বাংলায় কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয়ত, ইবনে বতুতা ছিলেন উচ্চ-বর্গের লোক। সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁর আয় ছিল অনেক বেশি। দিল্লীর সুলতান ইবনে বতুতাকে বছরে সতের হাজার দিনার ভাতা দিতেন। ঋণ

শোধ করার জন্য সুলতান ইবনে বতুতাকে পঞ্চান্ন হাজার দিনার দেন। প্রথমবার সালাম জানাতে গেলে দিল্লীর উজির তাঁকে দুই হাজার রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেন। কাজেই বাংলার লোকদের তুলনায় ইবনে বতুতার আয় ছিল অনেক বেশি। তাঁর কাছে দ্রব্যমূল্য সস্তা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, ইবনে বতুতা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে জিনিষের দাম সস্তা মনে হলেও সাধারণ লোকের কাছে সস্তা মনে হত না। তাই ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি তাদের বলতে শুনেছি, এ দামও তাদের জন্য বেশি।"[২০]

মধ্যযুগের বাংলায় দ্রব্যমূল্য সস্তা হওয়ার একটি অত্যন্ত করুণ দিকও রয়েছে। দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে জনগণের আয়ের উপর। জনগণের আয় যখন কমে যায় তখন দ্রব্যমূল্যও কমে যায়। তাই অত্যাচারী শাসকদের রাজত্বকালে দ্রব্যমূল্য কমে যেত কেননা, অত্যাচারী শাসকরা জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করার ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস অর্থনীতির সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, বরং উদ্বেগের কারণ। প্রসঙ্গক্রমে শায়েস্তা খানের রাজত্বকালে দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতা সম্পর্কে কিংবদন্তি স্মরণ করা যেতে পারে। জনশ্রুতি অনুসারে শায়েস্তা খানের রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত। এ সাফল্যে গর্বিত হয়ে তিনি লালবাগ কেল্লাতে একটি তোরণ নির্মাণ করে এর দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি কোন শাসক চালের দাম টাকায় আট মণের পর্যায়ে কমিয়ে আনতে পারে তবেই এ তোরণ খোলা যাবে। সকল ঐতিহাসিকরা এ ঘটনাকে শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার সমৃদ্ধির অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু শায়েস্তা খানের আমলে চালের দাম হঠাৎ কমে এল কেন তার কোন সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেন না। অর্থনীতির সূত্র অনুসারে দাম কমতে পারে সরবরাহ বৃদ্ধির অথবা চাহিদা হ্রাসের ফলে। আকস্মিকভাবে শায়েস্তা খানের আমলে চালের সরবরাহ বৃদ্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাই চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনাই বেশি। চাহিদা হ্রাসের একটি বড় কারণ হতে পারে, লোকের আয় কমে যাওয়া। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান থেকে এ অনুমানটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খান তাঁর শাসনকালে রাজস্ব আদায় বাড়ানোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করে তিনি দিল্লীর বাদশাকে নজরানা দিয়েছেন। নিজের জন্যও জমিয়েছেন অনেক টাকা। একটি হিসাব হতে দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খানের শাসনকালে মোট জাতীয় উৎপাদের ৪৩.৮ শতাংশ থেকে ৬৪ শতাংশ রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।[২১] এত উচুঁ হারে রাজস্ব সংগ্রহের ফলে লোকের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য নীচু পর্যায়ে থাকা জনগণের জন্য আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ।

যে কোন বক্তব্য পরীক্ষা করতে হলে প্রবক্তাগণ কি বলেছেন তা বিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়, তারা কি বলেননি তাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সোনার বাংলার প্রবক্তাগণ

বার বার জোর দিয়ে বলছেন যে, বাংলা শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সমৃদ্ধ ছিল না, বাংলায় দারিদ্র্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁরা বাংলায় মজুরির হার ও দাসত্ব সম্পর্কে আদৌ কোন তথ্য তুলে ধরেননি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত অপ্রতুল। তবে কিংবদন্তি-খ্যাত মসলিনের তাঁতিদের সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হতে এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার মোটেও সম্ভব নয় যে তাঁতিদের মজুরির হার ছিল অত্যন্ত কম। মসলিন ব্যবসায়ে তাঁতিরা লাভবান হত না। লাভ করত বিদেশী ফড়িয়ারা, তাদের দালালরা এবং সরকারী কর্মকর্তারা। আঠারো শতকের শেষ দিকে জন টেলর ঢাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, মসলিনের দামের কমপক্ষে শতকরা বিশ ভাগ মুগল কর্মকর্তাদের কমিশন হিসাবে দিতে হত। নগণ্য মজুরির বিনিময়ে মসলিন উৎপাদনের জন্য শাসকরা তাঁতিদের বাধ্য করত।[২২] ফরাসী লেখক আবে রায়নালও বলেছেন যে, বাংলায় দক্ষ তাঁতি হওয়া ছিল দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, কারণ তাদের স্বল্প মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে হত।[২৩] কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, হিন্দু তাঁতিদের সবচেয়ে নীচু বর্ণে স্থান দেওয়া হয়েছে। মুসলমান তাঁতিদের অবজ্ঞাভরে বলা হত জোলা (যার অর্থ হচ্ছে বোকা)। হিসাব করে দেখা গেছে যে, একখণ্ড মসলিন তৈরির মজুরি বড় জোর এক দিনার ছিল। অথচ একখণ্ড মসলিন তৈরির জন্য একজন ওস্তাদ তাঁতি একজন সহকারী ও একজন শিক্ষানবিসের এক বছর সময় লাগত। শিক্ষানবিস কোন মজুরি পেত না। সহকারী তাঁতি ওস্তাদ তাঁতির আয়ের ২৫ হতে ৫০ শতাংশ পেত। মধ্যযুগে মসলিনের একজন ওস্তাদ তাঁতির বার্ষিক মজুরি দিয়ে খুব বেশি হলে ৫৭.৮ মণ হতে ৭০ মণ চাল কেনা যেত। সহকারী তাঁতি বছরে যে মজুরি পেত তা দিয়ে ১৭.৫ হতে ২৯.৭ মণ চাল কেনা সম্ভব ছিল। আঠার শতকের মধ্য ভাগে তাঁতিদের আয় আরও কমে আসে। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৫১-৫২ সালে তাঁতিরা বছরে ১৩.৬ হতে ৩২.৭ মণ চালের সমপরিমাণ মজুরি অর্জন করত।[২৪] ১৭৩৫ সালের একটি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ফরাসী শ্রমিকদের মজুরির হার ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরির ছয় গুণ ছিল। শুধু মান ও সৌন্দর্যের জন্যই নয়, মূল্যের দিক দিয়েও মসলিন ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু আজকের তৈরি পোষাক শিল্পের মত মসলিনশিল্পেরও তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) ছিল শ্রমের নিম্ন মজুরি। যদি মসলিনশিল্পে মজুরি এত কম হয় তবে অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও মজুরির হার নীচু হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, অন্যথায় মসলিন শ্রমিকরা অন্য পেশাতে চলে যেত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সবচেয়ে স্পষ্ট নিদর্শন হল দাস-প্রথার প্রচলন। অনেক ঐতিহাসিক জোর গলায় দাবি করেন যে, বাংলায় বিদেশী নাগরিকদের দাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছে; কিন্তু স্থানীয় নাগরিকদের দাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়নি। এ অনুমানের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এদেশে দাসপ্রথা প্রাচীনকাল হতে চালু ছিল। আইনজ্ঞ জীমূতবাহন (আনুমানিক দ্বাদশ শতক) দাসব্যবস্থা সম্পর্কে

বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদেশী ভ্রমণকারীরা দাসপ্রথার প্রচলন লক্ষ্য করেছেন। চৌদ্দ শতকে বাংলা ভ্রমণ করে ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি শয্যাভূষণ ক্রীতদাসীদের এক দিনার অর্থাৎ মরক্কোর আড়াই দিনারে বিক্রয় হতে দেখেছি। আমি ঐ দামে আশুরা নামে একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলাম। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। আমার একজন সহযাত্রী দুই দিনার দিয়ে একজন দাস বালক ক্রয় করেছিল।"[২৫] পর্তুগীজ ব্যবসায়ী বারবোসা ষোল শতকে দাস ব্যবসায়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, সিলেট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল থেকে অনেক খোজা সরবরাহ করা হত। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বাংলার দাসপ্রথা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলায় পিতামাতা কর্তৃক কন্যা সন্তান বিক্রয় ছিল নিতান্ত মামুলি ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, "চৈতন্য চরিতামৃত"-এর নিম্নোক্ত শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে[২৬]:

নাহা লুহা লবণ বেচিবে ব্রাহ্মণে
কন্যা বেচিবেক যে সর্ব শাস্ত্র জানে।

তবে বাংলায় দাসপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে প্রমাণ শুধু ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ ও তৎকালীন সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। দাস ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে প্রচুর দলিল পাওয়া গেছে। চন্দননগরে ফরাসী শাসকদের মহাফেজখানায় দাস বিক্রয়ের কমপক্ষে এক শ' দলিল পাওয়া গেছে। দাস বিক্রয়ের দলিল পাওয়া গেছে সিলেটে, হুগলী জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে। কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত একটি দলিলে দেখা যায় যে কায়স্থপাড়া গ্রামের জনৈক গোপীনাথ মজুমদার ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজেকে ইসিদ্দর খানের কাছে আর্থিক দুরবস্থার জন্য বিক্রয় করেছে। শায়েস্তা খানের শাসনামলকে বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ শায়েস্তা খানের রাজত্বকালেই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে দাস হিসাবে বিক্রয় করেছে। দাস বিক্রয়ের অনেক দলিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রয়েছে।[২৭] দাস বিক্রয়ের যে সব দলিল পাওয়া গেছে তাতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাতেও দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে বাংলার জনসংখ্যার কত শতাংশ দাস ছিল তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেশী আসামে দাস, ভূমিদাস ও বন্ধকি দাসরা জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হতে ৯ শতাংশ ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।[২৮] আসামে আনুপাতিক হারে বাংলার চেয়ে দাস বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোন পর্যায়েই বাংলাদেশে দাসের সংখ্যা ৫ শতাংশের বেশি ছিল না, তার অনেক কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে দাস সংক্রান্ত দলিলগুলো হতে দেখা যাচ্ছে, দাসদের বিক্রয়মূল্য ছিল কম। মজুরির হার কম হওয়ার অনুমানের সাথে এ তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে দাসের মূল্য হল একজন দাস সারা জীবন ধরে যা আয় করবে তার বর্তমান মূল্য। দাসদের আয় নির্ভর করে মজুরির উপর। তাই মজুরির হার কম হলে দাসের দামও কম হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা স্বপ্নরাজ্য ছিল না। অন্যান্য প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব সমাজের মত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল ক্ষণভঙ্গুর। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলার অর্থনীতির সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কেন সোনার বাংলার কিংবদন্তি এত দিন ধরে চালু রয়েছে? এর দুটি কারণ রয়েছে, প্রথমত, ইতিহাসের আকরসমূহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে। বাংলার প্রাচুর্য সম্বন্ধে কিংবদন্তি প্রচার করেছেন বিদেশী পর্যটকরা। এরা ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ওয়াকিবহাল। তবে পর্যটকদের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সাধারণত বৈদেশিক পর্যটকরা দারিদ্র্যের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না। এ সম্পর্কে পল্লী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ রবার্ট চেম্বারের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।[২৯] রবার্ট চেম্বার লিখেছেন যে, বিদেশী বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন না। তার কারণ হল পর্যটকরা সাধারণত সবচেয়ে ভাল মওসুমে সফর করে। তারা বড় বড় শহরে রাজপথ দিয়ে চলাফেরা করে। তারা মেলামেশা করে স্থানীয় অভিজাতদের সাথে। দরিদ্ররা থাকে শহর থেকে দূরে যেখানে অনেক সময় আদৌ কোন রাস্তা নেই। মওসুম ভেদে দারিদ্র্য বাড়ে ও কমে। কাজেই বাইরের পর্যটকদের পক্ষে দারিদ্র্যের বিভীষিকা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, যখন কেউ বাংলার সমৃদ্ধির বর্ণনা করেন, তখন তাদের মনে একটি তুলনামূলক চিত্র থাকে। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতে দারিদ্র্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না তবু বাংলাদেশ ভারতের ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল। তার একটি বড় কারণ হল যে, এখানে খরার প্রভাব ছিল সীমিত। সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সমকালীন অন্যান্য সমাজের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় দারিদ্র্যের তীব্রতা ছিল অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে এ সমাজে দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি বিরাজ করত। যখন ফসল ভাল হত তখন সবাই ভালভাবে জীবন কাটাতে পারত। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে অনেকেই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। উপরন্তু সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে এ সমাজে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের গহ্বর ছিল। দাস প্রথার প্রচলন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমাজে অনেক জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তারা বার-বার দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে।

বিপক্ষে যত জোরালো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য অথবা অকাট্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণই উপস্থাপন করা হোক না কেন, বাঙ্গালীর মনোজগত হতে সোনার বাংলার কিংবদন্তি অতি সহজে অপসৃত হবে না। যার যা নেই, তাই সে খুঁজে বেড়ায় এ কথা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, জাতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে অভিবাসীদের বংশধর। তাই তারা তাদের পিতৃপুরুষের পরিচয় জানে না। বিত্ত অর্জন করলেই তারা পূর্ব-পুরুষের পরিচয় খুঁজে বেড়ায়। আবার ফরাসী দেশে নরনারীর সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল। অভিজাত বংশের ছেলেমেয়েদের পিতৃত্ব নিয়ে প্রায়ই কানাঘুষা শোনা যায়। মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন ঠাট্টা করে লিখেছেন, মার্কিনরা বিত্তবান হলে

পিতৃপুরুষের অনুসন্ধান করে, ফরাসীদের পয়সা হলে তারা তাদের পিতৃপরিচয় খুঁজে বেড়ায়। বাঙ্গালীদের পিতা বা পিতামহের পরিচয়ের সমস্যা নেই। সমস্যা হল বিত্তের। যতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে তারা জর্জরিত হবে, ততদিন পর্যন্ত বাঙ্গালীরা অতীতের ইতিহাসে এবং পরকালে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াবে।

## তথ্যসূত্র

১. পাল, প্রশান্ত কুমার, *রবি জীবনী*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫), পৃষ্ঠা, ১৪৩-১৪৪

২. পাল, প্রশান্ত কুমার, *রবি জীবনী*, পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৫), পৃষ্ঠা, ২৫৮-২৫৯

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৬২

৪. পাল, প্রশান্ত কুমার, *রবি জীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯), পৃষ্ঠা, ৪৬৯

৫. দেবী, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী, *স্বর্গের কাছাকাছি* (কলিকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশনস, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ১৬০

৬. Sen, Amartya, *Poverty and Famines* (Oxford : Oxford University Press, 1981), P. 202

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দ-কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, (নিউ দিল্লী ঃ সাহিত্য একাডেমী, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ২২৬৬

৮. চৌধুরী, সুশীল, "সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : নবাবি আমল", *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পাদনা) সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃষ্ঠা ২৯

৯. Rosenberg, Nathan and Birdzwell Jr., L. E., *How the West Grew Rich* (New York : Basic Books 1986), p.1

১০. Keynes, J. M., "Economic Possibilities of Our Grand Children", *Essays in Persuasion* (London, Macmillan 1931), p. 300

১১. Marx, Karl, "The Brtish Rule in India" in Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* (Moscow : Foreign Language Publishing Press, 1962), p. 345

১২. Mukherji, R & Maity S. K., *Corpus of Bengali Inseriptions Bearing on History and Civilization of Bengal* (Calcutta : Firma K. L, Mukhopadhaya, 1967), pp. 39-40

১৩. Tinti, Paola, G., "On the Brahmi Inscription of Mahasthan", *Journal of Bengal Art*, vol. I 1996 pp. 33-38

১৪. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব (সংক্ষেপিত) (কলিকাতা : ১৩৮২), পৃষ্ঠা ২৪১

১৫. Kautilya, *The Arthasastra,* Rangarajan, L. N., ed., (New Delhi : Penguin Books of India, 1992), p. 12

১৬. রায়, নীহার রঞ্জন, *বাঙ্গালী ইতিহাস* (কলিকাতা : লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২), পৃষ্ঠা ১৯৭

১৭. জয়ানন্দ, *চৈতন্য মঙ্গল,* বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১), নদীয়া খণ্ড

১৮. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পাদিত), *ময়মনসিংহ গীতিকা* (কলিকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ৪৪

১৯. Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa* 1325-1354, Gibb, H. A. R., tr., (New York : Argustus M. Kelly, 1969), pp. 269

২০. উদ্ধৃত Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslims of Bengal,* (Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985), vol. 1A, p. 180

২১. Khan, Akbar Ali, "Golden Bengal : Myth and Reality" in *History of Bangladesh*, 1704-1971 : *Economic History*, Serajul Islam, ed., (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), p. 692.

২২. উদ্ধৃত, আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী : ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ১০৫

২৩. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত* ১০৬

২৪. Khan, Akbar Ali. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৭০০

২৫. ইবনে বতুতা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১৯৬

২৬. জয়ানন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২১৬

২৭. খান, তরিকুল আলম, "বাংলাদেশে দাস প্রথা ঃ কতিপয় অপ্রকাশিত দলিল, *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, vol. III. December 1989

২৮. Guha, Amalendu, "The Medieval Economy of Assam", *Cambridge Economic History of India*, vol. I. p. 503

২৯. Chambers, Robert, *Rural Poverty Unperceived; Problems and Remedies* (Mimeo), World Bank Staff Working Refer No. 400, 1980, p. 2

# "ভারতীয় অর্থনীতির" উত্থান ও পতন

একবার জনৈক পাদ্রীকে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে ফারাক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। পাদ্রী বললেন, "স্বর্গ ও নরকের মধ্যে তফাৎ অতি নগণ্য, সামান্য পরিবর্তন হলেই বেহেশত দোজখে পরিণত হয়।" তাজ্জব হয়ে শ্রোতারা পাদ্রীকে উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানায়। পাদ্রী বললেন, "ধরুন স্বর্গ হচ্ছে এমন এক দেশ যেখানে পুলিশ হল ইংরেজ, বাবুর্চিরা বাঙ্গালী, চিত্রকররা ফরাসী আর জার্মানরা হল প্রকৌশলী। নরক হচ্ছে সে দেশ, যে দেশে বাঙ্গালীরা পুলিশ, ইংরেজরা পাচক, চিত্রকররা জার্মান আর ফরাসীরা প্রকৌশলী।"

স্বর্গ ও নরকের ফারাক সম্পর্কে পাদ্রী সায়েবের বক্তব্যের সাথে অনেকেই একমত হবেন না। তবে বিভিন্ন জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি যা বলেছেন, অধিকাংশ লোকই তা অকপটে মেনে নেবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একটি বহুল প্রচারিত ধারণা হল, প্রতিটি মানুষের যেমন ভিন্ন চরিত্র থাকে তেমনি প্রতিটি জাতিরই রয়েছে সুস্পষ্ট চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য। রোমান্টিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা হেগেল ও হার্ডার-এর মতে প্রতিটি জাতির একটি জৈব সত্তা রয়েছে। এই সত্তাই হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চালিকা-শক্তি। রাজনৈতিক দর্শনের মত অর্থনীতির সূত্রপাত হয় জাতিকে সমৃদ্ধতর করার স্বপ্ন নিয়ে। অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ অর্থনীতি বিষয়ক তাঁর প্রথম গ্রন্থের তাই নাম রাখেন "An Enquiry into Causes and Wealth of Nations" (জাতিসমূহের সম্পদ এবং এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান)। জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোই হচ্ছে ধ্রুপদী অর্থনীতির উপজীব্য বিষয়। পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদ্‌রা ভোক্তা ও উৎপাদকদের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন। তবু অর্থনীতির পরিধি শুধু ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টিগত অর্থনীতি বিশ্লেষণ করতে হলে এখনও রাষ্ট্রই (যা প্রধানত জাতিভিত্তিক) হচ্ছে মূল একক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেরই লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের কল্যাণ। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাথে অর্থনীতিবিদ্‌দের একটি বড় তফাৎ রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস

করেন যে, রাজনৈতিক অঙ্গনের কুশীলবদের আচরণ একই ধরনের নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌দের একটি মৌলিক প্রতীতি হল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলেরই (রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি যাই হোক না কেন) আচরণই অভিন্ন; জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক আচরণে আদৌ প্রতিফলিত হয় না। অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাই ভারতের জন্য স্বতন্ত্র "ভারতীয় অর্থনীতি" অথবা বিলাতের জন্য "ব্রিটিশ অর্থনীতির" প্রয়োজন নেই।

এ কথা অনুমান করা মোটেও সঠিক হবে না যে, অর্থনীতিবিদ্‌গণ জাতির ও রাষ্ট্রের বিভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞ; আর তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সকল জাতি একই ধরনের ব্যবহার করে। বরং তার উল্টোটিই সত্য। আঠার ও উনিশ শতকে মূলধারার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্‌ই ছিলেন ইংরেজ। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। উনিশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেল তাঁর Philosophy of History গ্রন্থে লিখেছেন:

> India has always been the land of imaginative inspiration, and appears to us still as a fairy region, an enchanted world.
>
> (ভারত আমাদের কাছে সব সময়েই ছিল কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপনার দেশ এবং এখনও আমাদের কাছে মনে হয় রূপকথার দেশ—একটি মায়াবী জগত।)

মূলধারার অনেক ইংরেজ অর্থনীতিবিদের জ্ঞান শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এঁদের অনেকেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ভারতকে নিবিড়ভাবে জানতেন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বাংলার মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়েছেন। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন সক্রিয় শেয়ার-মালিক ছিলেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হাইলিবারি কলেজে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের অর্থনীতি পড়িয়েছেন। হিতবাদের (utilitarianism) প্রবক্তা স্যার জেমস মিল ও স্যার জন স্টুয়ার্ট মিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ্ কেইনস ইন্ডিয়া অফিসে শিক্ষানবিস হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন রবার্ট টরেনস (Robert Torrens), জন র‍্যামজে ম্যাককুলক (John Ramsay Mcculloch), স্ট্যানলি জেভনস (Stanley Jevons) ও আলফ্রেড মার্শাল। ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ জঁ ব্যাপটিস্ট সে (Jean Baptiste Say) এবং কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু এঁদের কেউই কখনও স্বীকার করেননি যে, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অথবা ভিন্ন ধরনের জাতীয় চরিত্রের ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে শিল্পোন্নত অর্থনীতির সূত্রসমূহ প্রযোজ্য নয়। প্লেটোর সময় হতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাতীয় চরিত্রের ভিন্নতার তাৎপর্য স্বীকার করেন, অথচ মূলধারার অর্থনীতিবিদ্‌দের বিশ্লেষণে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য একেবারেই উপেক্ষিত।

মূলধারার ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে উনিশ শতকে তিন ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথমত, জার্মানিতে ঐতিহাসিক ঘরানার (Historical School) অর্থনীতিবিদ্গণ বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সূত্র অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) অর্থনীতিবিদ্গণ মূলধারার অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। তৃতীয়ত, মার্কসবাদ মূলধারার অর্থনৈতিক সূত্রসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। তবে মূলধারার অর্থনীতির বিরুদ্ধে উনিশ শতকে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ দেখা দেয় ভারতে। এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন রাজনীতিবিদ্গণ, অর্থনীতিবিদ্গণ নয়। এর কারণ হল উনিশ শতকে ভারতে অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখার মর্যাদা লাভ করেনি। ভারতে অর্থনীতি বিভাগ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই উনিশ শতকে ভারতে কোন পেশাদার অর্থনীতিবিদ্ ছিল না; প্রধানত রাজনীতিবিদ্গণই অর্থনীতির চর্চা করতেন।

ধ্রুপদী অর্থনীতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী বক্তব্য হল ভারতীয় রাজনীতিবিদ্গণের সম্পদ-পাচার তত্ত্ব (drain theory)।[১] ধ্রুপদী অর্থনীতির আগে বণিকবাদী (mercantilist) ঘরানার অর্থনীতিবিদ্রা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে হার-জিতের খেলা (zero-sum game) হিসাবে গণ্য করতেন। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যারা বেচে তারা লাভ করে; যারা কেনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো তাঁর তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তত্ত্বে প্রমাণ করেন যে, বাণিজ্যের ফলে যারা কেনে আর যারা বেচে উভয়েই লাভবান হয়। বাণিজ্য হার-জিতের খেলা নয়, বাণিজ্য উভয় পক্ষের জিতের খেলা (win-win game)। পক্ষান্তরে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ দাদাভাই নৌরজী (১৮২৫-১৯১৭) বাণিজ্যের সুফল সম্পর্কে ধ্রুপদী মতবাদ চ্যালেঞ্জ করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাণিজ্য হচ্ছে ভারতের মত অনুন্নত দেশ হতে উন্নত দেশে সম্পদ পাচারের হাতিয়ার মাত্র। পরবর্তী কালে এই বক্তব্য বিকশিত হয় প্রশাসক-পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের হাতে। দাদাভাই নৌরজীর বক্তব্য প্রথমে ১৮৬৭ হতে ১৮৭০ সনের মধ্যে কয়েকটি নিবন্ধে প্রকাশিত হয়। ১৯০০ সালে এসব প্রবন্ধ নৌরজীর "Poverty and the Un-British Rule in India" নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়।[২]

দাদাভাই নৌরজীর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, উনিশ শতকে অংশীদারদের তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে ভারতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠেনি; গড়ে উঠেছে ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পদ পাচারের হাতিয়ার হিসাবে। ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর খরচ, ভারতে ব্রিটিশ বেসামরিক প্রশাসকদের বেতন ও পেনশন এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল বাবদ ভারত থেকে প্রতি বছর সম্পদ পাঠাতে হয়েছে। সম্পদ-পাচার তত্ত্বের প্রবক্তাদের হিসাবে প্রতি বছরে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদের ১.২ শতাংশ হতে ১.৫ শতাংশ সম্পদ পাচার হয়ে যেত। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্তের সিদ্ধান্ত হল : "প্রতি বছরে পাচারকৃত সম্পদ হল ভারতের

জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতি, দেশ থেকে যে অর্থ বেরিয়ে যায় তা আর কোন রূপেই ফিরে আসে না; একটি গরীব দেশের সম্পদ ধনী দেশের শিল্প বাণিজ্যকে ফলবান করে তুলছে।"[৩]

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে ভারত থেকে সম্পদ পাচার হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের নগ্নতম বহিঃপ্রকাশ। ভারতের জনগণ তাই সম্পদ পাচারকে অকাট্য সত্য রূপে গ্রহণ করে। এই তত্ত্বের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দুটো অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে, একটি হল তাত্ত্বিক, অন্যটি হল প্রায়োগিক। তাত্ত্বিক বিচারে, ভারতে বহির্বাণিজ্যের কুফল সম্পর্কে শুধু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই প্রশ্ন তুলেননি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত অনল-বর্ষী জাতীয়তাবাদীগণও সংশয় প্রকাশ করেছেন। "বঙ্গ দেশের কৃষক" নিবন্ধে উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিম লেখেন, "এ সকল তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?"[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দেখা যায় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলস (L. C. A. Knowles)-এর লেখাতে। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে উদ্বৃত্ত থাকত তার একতৃতীয়াংশ ভারতে প্রধানত রেলওয়েতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সুদ হিসাবে গিয়েছে, আর একতৃতীয়াংশ দিয়ে ভারত বাইরে থেকে সোনা-রূপা আমদানী করেছে। সর্বাধিক একতৃতীয়াংশ ব্রিটিশ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয়ের ফলে তাঁর মতে ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক হয়েছে।[৫] ব্রিটিশ শাসন অবসানের পাঁচ দশক পরে আজ দাদাভাই নৌরজী অথবা রমেশচন্দ্র দত্ত নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্র ও নোলস সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। দাদাভাই নৌরজী ও জাতীয়তাবাদী লেখকগণ ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সুদ আসল পরিশোধকে সম্পদ পাচার হিসাবে গণ্য করতেন। আজকে একই শর্তে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ভারত সরকার হন্যে হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী নেতারা এক সময়ে বিদেশী প্রশাসকদের বেতনকে সম্পদের পাচার বিবেচনা করতেন। অথচ আজকের ভারতে বিদেশী পরামর্শক ও বহুজাতিক কোম্পানীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন দিতে কোন কুণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না।

প্রায়োগিক দিক থেকে বড় প্রশ্ন হল, ভারত হতে পাচারকৃত সম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব কতটুকু। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রতি বছর পাচারকৃত সম্পদের পরিমাণ মোট বার্ষিক জাতীয় উৎপাদের দু'শ ভাগের এক ভাগ (.৫%) হতে পারে।[৬] জাতীয়তাবাদীদের হিসাবে এ পরিমাণ আড়াই হতে তিন গুণ বেশি। জাতীয়তাবাদী নেতাদের হিসাব অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

সম্পদ-পাচার তত্ত্বের দুর্বলতা সত্ত্বেও এর অপরিসীম ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের সম্পদ পাচার তত্ত্ব হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে পুরান অথচ পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা যে, কার্ল মার্কস সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের জনক। মার্কস সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন তত্ত্বই লেখেননি। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখক হবসন (Hobson) তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯০২ সালে। উপরন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম তত্ত্ব প্রণয়ন করেন রোজা লুক্‌সেমবার্গ ও লেনিন। রোজা লুক্‌সেমবার্গের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে আর লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।

ভারতীয় অর্থনীতি শুধু ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় অর্থনীতির প্রবক্তাগণ অর্থনীতির একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করান। এঁদের মতে "ভারতীয় অর্থনীতি" একটি ফলিত শাস্ত্র নয়, এটি একটি মৌলিক শাস্ত্র। পশ্চিমা অর্থনৈতিক সূত্র প্রয়োগ করে "ভারতীয় অর্থনীতির" চর্চা সম্ভব নয়। "ভারতীয় অর্থনীতির" প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, অর্থনীতির কোন বিশ্বজনীন সূত্র নেই, দেশ কাল পাত্র ভেদে এর তফাৎ ঘটবে। অর্থনীতি যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় না। এর পেছনে থাকে একটি সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত কাঠামো। ভারতীয় অর্থনীতির উপজীব্য বিষয় হল তাই ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক স্বকীয়তা – যা তার অর্থ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। "ভারতীয় অর্থনীতি" অভিব্যক্তির প্রথম প্রচলন করেন প্রখ্যাত বিচারক, সমাজ সংস্কারক ও ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (১৮৪২-১৯০১)। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্জি, ভি, জি, কালে প্রমুখ।[৭] যদিও ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের বক্তব্যের মিল রয়েছে, তবু প্রকরণগত দিক হতে এঁদের দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : ঐতিহাসিক ঘরানা ও রোমন্টিক ঘরানা।

ঐতিহাসিক ঘরানার ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই ঘরানার পথিকৃৎ ছিলেন রানাডে নিজে।[৮] রানাডের দুটো মূল বক্তব্য ছিল। প্রথমত, রানাডে ছিলেন সমাজসংস্কারক। তিনি মনে করতেন, ধর্মের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর মতে ধর্মীয় কুসংস্কার হল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাই তিনি মনে করতেন যে, ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে খৃষ্টানদের প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের মত সংস্কারবাদী আন্দোলনের আলোকে হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে বাজারের অদৃশ্য হাত নিজে নিজে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে না। জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের অনুকরণে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের মতই রানাডে ছিলেন রক্ষণশীল সংস্কারক। ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের মত তিনি একটি বিভক্ত, দুর্বল ও প্রধানত কৃষিপ্রধান

অর্থনীতিকে একটি গতিশীল শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের উদ্যোগ সমর্থন করেন। সাথে সাথে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সমর্থন করেন।

রানাডের মত ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌গণ শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের পক্ষে ছিলেন। তবে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন নিজে নিজে হবে না, ভারতকে তাঁর নিজের পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক রূপান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। রোমান্টিক ধারার ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের বক্তব্য হল যে, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন ভারতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য বাইরের পরিবর্তন আত্মস্থ করা নয়, বরং বাইরের আঘাত সত্ত্বেও ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর মতে পার্থিব ভোগবিলাস জীবনকে সমৃদ্ধতর করে না, বরং জ্বালাযন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়। গান্ধীর মতে ভোগের সম্প্রসারণ নয়, সংকোচনই হল অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়। গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদে রয়েছে মার্কিন অর্থনীতিবিদ্‌ হেনরি জর্জ ও ফরাসী প্রাকৃতিক-বিধিবাদী (physiocratic) ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রভাব। এঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে কৃষিই হল সম্পদের একমাত্র উৎস। গান্ধীর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল, স্বনির্ভর গ্রামসমূহে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে উত্তাল তরঙ্গের জন্ম দিলেও তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন অতি মুষ্টিমেয় শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাঁরা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের অনেকেরই গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনে আস্থা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পার। রাজনৈতিকভাবে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে তিনি গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি উল্লেখ করেন। প্রথমত, শরৎচন্দ্র ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিকে গান্ধীর মত অবনতির লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করতেন না। তাই তিনি লিখেছেন[৯]:

> "একটা কথা পুরানোপন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না, এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাঁদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্নে না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে; তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা—তাকে স্বীকার করে তার

গোলামি করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।

দ্বিতীয়ত, গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, কুটির শিল্প আধুনিক শিল্পের চেয়ে শ্রেয়। শরৎচন্দ্র এ যুক্তি মানেননি। তাই তিনি বলেন : "কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই ধরনের মত পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন[১০]:

The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.

(চরকা কর্মসূচী এতই বালসুলভ যে এ কর্মসূচী সারাদেশকে যেভাবে বিভ্রান্ত করছে তাতে যে কেউ নিরাশ হয়ে পড়বে।)

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর স্বপ্ন আর ভারতের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলে। গত একশ বছর ধরে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবিত উন্নতির ফলে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেছে। এ জনসংখ্যার চাহিদা সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মিটানো সম্ভব ছিল না। গান্ধীর স্বপ্নের গ্রামগুলি ছিল সম্প্রীতির আর শান্তির নীড়। বাস্তবে ভারতীয় গ্রাম হল গোপন হিংসায় বিদীর্ণ এক সমাজ– যেখানে জীবন, দার্শনিক হবসের ভাষায়, "দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক ও হ্রস্ব।" গান্ধীজীর শিষ্যরাই গান্ধীজীকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়েছে। ভারত-ভাগ্য-বিধাতারা মুখে মুখে গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে একটি আধুনিক ও শিল্পায়িত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথে চলেনি, চলেছে রানাডের মত ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্দের নীল-নকশা অনুসারে। উপরন্তু কার্ল মার্কসের ভাবধারাও জওহরলালের মত গান্ধীর ভাবশিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রেক্ষিতে "ভারতীয় অর্থনীতির" মূল বক্তব্যসমূহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। নব্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার এগিয়ে আসে। তবে রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে "ভারতীয় অর্থনীতি" চর্চায় নবজাগরণ দেখা দেয়নি, বরং ভাটা দেখা দেয়। এর কারণ হল কাছাকাছি সময়ে অন্য যে সব এশীয় ও আফ্রিকান দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাও ছিল একই ধরনের। ভারতীয় অর্থনীতির মূল সূত্রসমূহ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর-পর অর্থনীতির একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে "উন্নয়ন অর্থনীতি" আবির্ভূত হয়। গত পাঁচ দশক ধরে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতিপাদ্য বক্তব্যসমূহ উন্নয়ন অর্থনীতির মূলধারার অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়ায়।

উন্নয়ন অর্থনীতির বক্তব্যসমূহ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ বক্তব্য মূলধারার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদেরও সমর্থন লাভ করে। আনুমানিক ১৯৮০ পর্যন্ত সকল উন্নয়নশীল দেশেই এই নতুন শাস্ত্রের সুপারিশসমূহ ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। উন্নয়ন অর্থনীতির মূল সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ। প্রথমত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে একটা বিরাট ধাক্কার (big push) সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন অর্থনীতির দ্বৈত সত্তা রয়েছে : একধারে রয়েছে চিরাচরিত খাত, অন্যদিকে আধুনিক খাত। কাজেই আধুনিক অর্থনীতির সকল সুপারিশ উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তৃতীয়ত, বাজারের অদৃশ্য হাত উন্নয়নশীল দেশে সক্রিয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাজার নেই, অনেক ক্ষেত্রে বাজার অকার্যকর ও অসম্পূর্ণ। কাজেই সরকারকে অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয়। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশকে শোষণের একটা প্রক্রিয়া। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি দেশকে আমদানী-বিকল্প নীতি অনুসরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের পণ্যের বাজার সৃষ্টি করবে। কাজেই শিশু শিল্পের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্র হতে প্রচুর সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উন্নয়ন অর্থনীতির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র অটুট থেকে যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষে দশকের পর দশক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিম্ন হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ ধরনের ৪ হতে ৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ ঠাট্টা করে "হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার" নাম দিয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ উন্নয়ন অর্থনীতির মৌল সুপারিশের ব্যতিক্রম করে বাজার-বৎসল ও রপ্তানী-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দেখা গেল যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। বস্তুত উন্নয়ন অর্থনীতির সুপারিশ অনুসরণ করে আদৌ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যাবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে বিগত দশকের একটি গল্প মনে পড়ছে। কথিত আছে যে একজন ইহুদি, একজন রাশিয়ান ও একজন ভারতীয় দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বর চাইতে যান। ইহুদি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্র বললেন যে তিনি এ ব্যাপারে অনেক কাজ করেছেন; তাই আগামী দশ হতে পনের বছরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। রাশিয়ার লোকটি ইন্দ্রের কাছে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভিক্ষা করেন। ইন্দ্র জবাবে বলেন যে, কাজটি কঠিন, তবে হয়ত আগামী বিশ-পঁচিশ বছরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার ভারতীয় ব্যক্তিটি দক্ষিণ এশিয়া থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের বর চান। ভারতীয় লোকটির বক্তব্য শুনে ইন্দ্র কেঁদে ফেলেন এবং বলেন যে, তিনিও দক্ষিণ এশিয়া থেকে দারিদ্র্য

দূর করতে চান, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজটি হাসিল হবে কি না সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন।

ভারতে গত দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্য নৈরাশ্যবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেছে। বাণিজ্য উদারকরণ, বহির্মুখী ও বাজার-বৎসল নীতি অনুসরণের ফলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ভারতের অর্থনীতির কোন অন্তর্নিহিত সমস্যা নেই। সমস্যা হল উন্নয়ন অর্থনীতির ভ্রান্ত নীতিমালা। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ক্ষুদ্র-শার্দুল অর্থনীতিসমূহের সাফল্য উন্নয়ন অর্থনীতির মৌল অনুমান সম্পর্কে দু'ধরনের তাত্ত্বিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, উন্নয়ন অর্থনীতির একটি মূল বক্তব্য হল যে, বাজারের ব্যর্থতা হেতু উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যর্থতা বাজারের ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে অনেক দেশেই আমলাতন্ত্র তস্করতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পারমিট আর লাইসেন্সের নামে অনুপার্জিত মুনাফাখোররা "লাইসেন্স-রাজ" প্রতিষ্ঠা করে অর্থনীতির সৃজনশীলতাকে পঙ্গু করেছে। অর্থনীতিবিদ্ এ্যান ক্রুগার রাষ্ট্রের ক্রটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন : "করার ক্রটি" (failures of commission) এবং "না করার ক্রটি" (failures of omission)। "করার ক্রটির" মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকসান এবং উন্নয়নের নামে সরকারের অপচয়। "না করার ক্রটির" মধ্যে রয়েছে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিমালা (যথা বিনিময় হারের অতিমূল্যায়ন অথবা উচ্চ হারে মূল্যস্ফীতি) অনুসরণ। সামগ্রিকভাবে সরকারের ব্যর্থতা বাজারের ব্যর্থতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন অর্থনীতির একটি বড় বক্তব্য হল যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের রীতিনীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ভিন্ন ধরনের তত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ শুধু বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বাজার অর্থনীতির বাইরের বিষয়সমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও এদের প্রয়োগ সম্ভব। এ সব বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিবেচনা করলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটেও অযৌক্তিক নয়। উন্নয়নশীল দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষারা উন্নত দেশের কৃষকদের চেয়ে কোন অংশেই কম বুদ্ধিমান বা কম যৌক্তিক নয়। উন্নয়নশীল দেশের জন্য মোটেও ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। দীপক লাল যথার্থই লিখেছেন[১১]:

> Nor are the so-called institutional features of the third world, such as their strange social and agrarian structures or their usurious informal credit systems necessarily a handicap to growth. They are likely to represent an efficient, second best adaptation to the risks

and uncertainties inevitable in the relevant economic environment. In the absence of other means of eliminating or alleviating risks, the destruction of these traditional institutions could actually do more harm than good.

(তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যথা তাদের অদ্ভুত সমাজের বা কৃষির অদ্ভুত কাঠামো অথবা চড়া সুদের অনানুষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চিত অন্তরায় নয়। তারা সম্ভবত সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সম্ভবশ্রেষ্ঠ অভিযোজন করে। ঝুঁকি দূর বা হ্রাস করা সম্ভব না হলে সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করবে।)

কাজেই মূলধারার বাইরে উন্নয়ন অর্থনীতি সংক্রান্ত স্বতন্ত্র তত্ত্বের আদৌ প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিকভাবে উন্নয়ন অর্থনীতির মূল বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবেও এর মূল বক্তব্যসমূহের অসম্পূর্ণতা আজ সুস্পষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, উন্নয়ন অর্থনীতি এবং তার পূর্বসূরী ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে মতবাদ গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তবে পল ক্রুগম্যান ঠিকই বলেছেন[১২]: "Economic fallacies never die–at best they slowly fade away." (অর্থনীতির ভ্রান্ত মতবাদসমূহ কখনও মরে না–খুব বেশি হলে এরা ধীরে ধীরে লীন হয়ে যায়)। প্রকৃতপক্ষে অনেক ভ্রান্ত অর্থনৈতিক মতবাদই বার বার ফিরে আসে। "ভারতীয় অর্থনীতি" ও "উন্নয়ন অর্থনীতি" দক্ষিণ এশিয়ার জনমনে দুটো ধারণার সৃষ্টি করেছে যা "উন্নয়ন অর্থনীতি" তত্ত্ব হিসাবে হারিয়ে গেলেও লুপ্ত হবে না। প্রথমত, দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ বহির্বাণিজ্যকে সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখবে। বিশ্বায়নের সুফলের কথা যতই বলা হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়াতে সহজে উদার বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ দূরীভূত হবে না। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণের দীর্ঘদিনের প্রচারের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ বাজারের অদৃশ্য হাতের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না, বরং তারা বাজারকে অবিশ্বাস করে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ রাষ্ট্রের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। সংরক্ষণের দেওয়ালের আড়ালে শিল্পায়নের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে দাবি দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার থাকবে। "ভারতীয় অর্থনীতি" ও তার উত্তরাধিকারী "উন্নয়ন অর্থনীতির" তত্ত্ব মরুপথে হারিয়ে গেলেও, তাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাবে। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের তাই মূল্যায়ন হবে : "জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

## তথ্যসূত্র


১. দেখুন Brahmananda, P. R., "A Fresh Look at the Drain Theory", *Indian Economic Journal,* vol. 16 (1968/69), October-December, 1968

২. Naoriji, Dadabhai, *Poverty and Un-British Rule in India* (London : Swan Sonneschein and Co., 1901)

৩. Dutt, R. C., *Economic History of India*, Victorian Age (Delhi : Publication Division), p. 213

৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : কামিনী প্রকাশালয়, ১৯৯১), পৃষ্ঠা ৩১৩

৫. Knowles, L. C. A., *The Economic Development of British Overseas Empire.*, 2nd ed. (London : George Routledge & sons, 1928), vol. I, pp. 392-393

৬. Mukherjee, Tapan, "Theory of Economic Drain : Impact of British Rule on the Indian Economy, 1840-1900" in *The Economic Imperialism* Boulding, K. E. and Mukherjee, T., ed., (Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1972), pp. 221

৭. Spengler, Joseph J., *Indian Economic Thought* (Durham : Duke University Press, 1971)

৮. Price, Ralph, "M. G. Ranade's Theory of Development and Growth", *Explorations in Entrepreneurial History 4* (1966). pp. 40-42

৯. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *শরৎ সাহিত্য সমগ্র* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২), পৃষ্ঠা ১৯৫৫

১০. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২১৪২

১১. Lal, Deepak, *The Poverty of Development Economics* (Cambridge : Harvard University Press, 1985), p. 105

১২. Krugman, Paul, *The Accidental Theorist* (New York : W. W. Norton and Co., 1998), p. 150

# "অর্থনৈতিক মানুষ" ও মানুষ হিসাবে অর্থনীতিবিদ

কেতাবী সংজ্ঞার বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিটি পেশারই একটি ভাবমূর্তি রয়েছে। অনেক সময় এ ভাবমূর্তি বহুলপ্রচারিত চুটকিতে ফুটে উঠেছে। অবশ্যই এ সব ভাবমূর্তি নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবু জনপ্রিয় চুটকির মধ্যেই বিভিন্ন পেশার দুর্বলতাসমূহ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

- সমাজতত্ত্ববিদ (sociologist) হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কোন অপরাধ ঘটলে অপরাধী ছাড়া আর সকলের দায়িত্ব খুঁজে বেড়ান।
- সাংবাদিক হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজে যা বোঝেন না তা সবাইকে বুঝিয়ে বেড়ান।
- দার্শনিক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সমাধানহীন সমস্যার দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।
- রাজনীতিবিদ্ হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সারা দুনিয়াকে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন অথচ নিজের খাসলত এক চুলও পরিবর্তন করেন না।
- কুটনীতিবিদ্ হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কিছু না বলে কথা বলতে পারেন।

গণিতের পরিশুদ্ধ পরিবেশে লালিত অর্থনীতিবিদ্গণ তাঁদের শাস্ত্রকে "সমাজবিজ্ঞানের রানী" বলে দাবি করে থাকেন। তবু জনমনে অর্থনীতির প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। উনিশ শতকে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্দের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীতে হতাশ হয়ে ঐতিহাসিক কার্লাইল অর্থনীতির নাম দিয়েছিলেন "হতাশাবাদী বিজ্ঞান" (dismal science)। প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক জন রাসকিন অর্থনীতিকে "জারজ বিজ্ঞান" (bastard science) বলে আখ্যায়িত করেন। কবি রবার্ট সাউদির মতে অর্থনীতি হল একটি মেকি বিজ্ঞান (pseudo science)। টমাস আর্নল্ড অর্থনীতিবিদ্দের 'এক চোখো প্রাণী' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। মানুষের স্বার্থ নিয়ে অর্থনীতিবিদ্দের মাতামাতি দেখে কার্লাইল এক পর্যায়ে অর্থনীতিকে "শুয়রের দর্শন" (pig philosophy) খেতাব

দেন।[১] অর্থনীতির সমালোচকগণ শুধু অর্থনীতিবিদ্‌দের স্বার্থপরতা ও হতাশা নিয়েই ক্ষুব্ধ নন; তাঁরা মনে করেন যে, অর্থনীতিবিদ্‌গণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মতামত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। জর্জ বার্নাড শ তাই লিখেছেন : "If all economists were laid end to end, they would not reach a conclusion." (এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সকল অর্থনীতিদি্‌কে বিছিয়ে দিলেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।)

অর্থনীতিবিদ্‌গণ অবশ্য স্বীকার করেন যে, অর্থনীতি একটি জটিল বিষয়। তবে এ জটিলতা অর্থনীতিবিদ্‌রা সৃষ্টি করেননি। অর্থনীতির উপজীব্য বিষয় হল মানুষের জীবন। মানুষ অত্যন্ত জটিল প্রাণী, বিচিত্র তার জীবন। তার কার্যকলাপ সাধারণ সূত্রের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। জনৈক রসিক যথার্থই বলেছেন, প্রতিটি মানুষের চরিত্রের একটি নয়, তিনটি রূপ রয়েছে–একটি রূপ তিনি বাইরে দেখান, একটি রূপ তাঁর আসল চরিত্র, আরেকটি রূপ হল তিনি নিজে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যা ভাবেন। জটিল মানুষকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরলীকরণ করেছেন। অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি সকল ধরনের মানুষ নয়, এর মৌল উপাদান হল "অর্থনৈতিক মানুষ"। অর্থনীতিবিদ্‌দের বক্তব্য হল, সকল মানুষ অর্থনৈতিক মানুষ না হলেও, বেশির ভাগ মানুষেরই আচরণ অর্থনৈতিক মানুষের মত। তাই একটি অর্থনৈতিক মানুষের আচরণ হতেই অর্থনীতির কুশীলবদের সামগ্রিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

"অর্থনৈতিক মানুষ" সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণাটির জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল।[২] মিলের লেখাতে "অর্থনৈতিক মানুষ" অভিব্যক্তিটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। তবু "অর্থনৈতিক মানুষ" সম্পর্কে ধারণাটি তাঁর লেখাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। "অর্থনৈতিক মানুষ" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেন মিলের সমালোচকরা, মিল নিজে নয়। মিল মানুষের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি অর্থনীতিকে "রাজনৈতিক অর্থনীতি" আখ্যায়িত করেছিলেন। মিল মনে করতেন যে, রাজনৈতিক অর্থনীতি মানুষের জীবনের সামগ্রিক সত্তার ব্যাখ্যা করে না। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে এর চৌহদ্দি সীমিত। কাজেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য মানুষের খণ্ডিত সংজ্ঞাই যথেষ্ট। মিল জানতেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তু সকল উপাদানের অবদান একত্রে নির্ণয় করা সহজ নয়। উপরন্তু সকল আচরণে সব সামাজিক উপাদানই সক্রিয় থাকে না। কাজেই স্বল্প সংখ্যক উপাদান নিয়ে অর্থনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ শুরু করা যেতে পারে। যদি নির্দিষ্ট উপাদানসমূহের প্রভাব অন্য কিছু ছাপিয়ে যায় তবে ঐ সব বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে তাদের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। মিলের "অর্থনৈতিক মানুষ" ধারণার মূল যুক্তি দার্শনিক নয়; এ ধরনের পূর্ব-অনুমান বিশ্লেষণের জন্য সুবিধাজনক। এ ধরনের বিশ্লেষণে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও বিশৃঙ্খলাকারী কারণসমূহ (disturbing cause) চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে এ সব বিশ্লেষণকে পূর্ণাঙ্গ ও অধিকতর বাস্তব করা সম্ভব হবে। মিলের বক্তব্য হল, সব কিছু

একবারে জানা সম্ভব না হলেও আমরা আস্তে আস্তে জ্ঞান অর্জন করে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারি। মিলের লেখাতে "অর্থনৈতিক মানুষের" দুটো রূপ দেখা যায়: একটি সংকীর্ণ, অপরটি ব্যাপক। অবশ্য পরবর্তীকালে নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ এ দুটো সংজ্ঞার একটিও গ্রহণ করেনি, নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌রা অর্থনৈতিক মানুষের একটি তৃতীয় সংজ্ঞা তুলে ধরেন।

সংকীর্ণ অর্থে "অর্থনৈতিক মানুষ" একটি লোভী প্রাণী । এর জীবনের একমাত্র ব্রত হল, যে কোন উপায়ে অধিকতর সম্পদ কুক্ষিগত করা। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের ধারণা অত্যন্ত স্থূল। তবু এ ধারণারও একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। ফ্রাঙ্ক বুখম্যান (Frank Buchman) যথার্থই বলেছেন[৩]: "There is enough in the world for everyone's needs but not enough for everyone's greed." (পৃথিবীর সকলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সকলের লোভ মেটানোর মত যথেষ্ট সম্পদ নেই।) অর্থনীতির মূল সমস্যা হল সম্পদের অপ্রতুলতা। মানুষের লোভ সম্পদের সঙ্কট আরও প্রকট করে তুলেছে। কাজেই মানুষকে লোভী হিসাবে চিহ্নিত করা হলে সম্পদের সঙ্কট আরও নাটকীয়ভাবে ফুটে ওঠে। নিষ্কাম পরার্থপরদের ফেরেশতাগণ পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌রা তাদের বিশ্বাস করেন না। সংকীর্ণ "অর্থনৈতিক মানুষ" আদলের সমালোচকরা ঠিকই বলে থাকেন যে অধিকাংশ মানুষই সম্পূর্ণ পরোপকারী বা সম্পূর্ণ স্বার্থান্বেষী নয়। লালসা আর পরার্থপরতা–এই দুই মেরুর মধ্যে সাধারণ মানুষ দোদুল্যমান; তাঁকে সাদা অথবা কালো রঙে চিহ্নিত করা যাবে না। অর্থগৃধ্নু মানুষের ধারণা রূপকথার রাজা মাইডাসের মতই অলীক।

মিল "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর সংকীর্ণ সংজ্ঞার অসারতা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি অর্থনৈতিক মানুষের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন। মিলের ব্যাপক সংজ্ঞায় "অর্থনৈতিক মানুষ" চারটি তাড়নায় পরিচালিত। "অর্থনৈতিক মানুষ" অবশ্যই অর্থলোভী। কিন্তু উপার্জন ছাড়া তার আরও লক্ষ্য রয়েছে। "অর্থনৈতিক মানুষ" শ্রমের চেয়ে অবসর পছন্দ করে। তাই সে কম কাজ করতে চায়। "অর্থনৈতিক মানুষ" ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানকে পছন্দ করে। কাজেই সম্ভব হলে সে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ না জমিয়ে বর্তমান সময়ে ভোগ ও বিলাসিতা করতে চায়। সবশেষে "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর রয়েছে সন্তান উৎপাদনের জৈব তাড়না। মিল মনে করেন যে, তাঁর অর্থনৈতিক মানুষের ব্যাপকতর সংজ্ঞার ভিত্তিতে অর্থনীতির বাস্তব বিশ্লেষণ সম্ভব। সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে এ সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের মৌল তাড়নার যে চারটি উপাদান মিল চিহ্নিত করেছেন তা যথেষ্ট নয়। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে এ চারটির অতিরিক্ত মৌল তাড়না নেই এ যুক্তি গ্রহণ করার পক্ষে কোন তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা নেই।

উনিশ শতকের শেষে নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থনৈতিক মানুষের একটি নতুন ভাবমূর্তি উপস্থাপন করেন। তাঁদের বক্তব্য হল, অর্থনৈতিক মানুষের মূল বিশেষত্ব হল এই যে, সে আবেগে তাড়িত হয়ে কোন কিছু করে না। অর্থনৈতিক মানুষ অত্যন্ত

যুক্তিশীল। অপ্রতুল সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অর্থনৈতিক মানুষ তাঁর উপযোগিতা সর্বোচ্চায়নের চেষ্টা করেন। বিংশ শতকে অর্থনীতিবিদ্ লায়নেল রবিন্স প্রমাণ করলেন যে, অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান নয়, অর্থনীতি হল চয়নের বিজ্ঞান। "অর্থনৈতিক মানুষ" সম্পর্কে নব্যধ্রুপদী ধারণার দুটো উপাদান রয়েছে। একটি হল self-interest বা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়ত যৌক্তিকতা বা rationality। নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে মানুষের স্বার্থ যৌক্তিক পদ্ধতিতে চরিতার্থ করা হয়, অযৌক্তিকভাবে নয়।

"অর্থনৈতিক মানুষের" যে সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হোক না কেন, এই ধারণার একটি মূল প্রতীতি হল যে, সকল অর্থনৈতিক মানুষ একইভাবে তাদের স্বার্থ অর্জন করে থাকে। কাজেই অর্থনীতি হল একটি সমাজের সকল অর্থনৈতিক মানুষের কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এদের একজনকে বুঝতে পারলেই সকলের আচরণ বোঝা যাবে। এ ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। সকল মানুষের উপযোগিতা এক নয়। যদি বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতা ও চাহিদা ভিন্ন হয় তবে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। এ প্রতিযোগিতার ফলে কেউই হয়ত নিজে যা চায় তা পাবে না। অর্থনৈতিক মানুষরা একে অপরের সাথে আপোষ করতে গিয়ে কেউই তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। অমর্ত্য সেন তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতার শুরুতেই এ পরিস্থিতি অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন[৪]:

> A camel, it has been said, "is a horse designed by a committee" ... The difficulty that a small committee experiences may be only greater where it comes to decision of a sizable society reflecting the choices of the people, by the people, for the people.
>
> (যথার্থই বলা হয়েছে যে উট হচ্ছে একটি কমিটি কর্তৃক পরিকল্পিত ঘোড়া। ... একটি ছোট কমিটির যে সমস্যা তা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায় যখন একটি বৃহৎ সমাজের সিদ্ধান্তে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।)

"অর্থনৈতিক মানুষ" শীর্ষক বিমূর্ত ধারণার সমালোচনা করেছেন ঐতিহাসিকগণ, সমাজতত্ত্ববিদগণ, মনস্তাত্ত্বিকগণ এবং নারীবাদিগণ। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হল, "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর ধারণা বণিকবাদী সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। আজকের যুগে এ ধারণা একান্তই অনুপযোগী। অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা ভিক্টোরীয় যুগের বিশেষ মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রকরণগতভাবে সমাজতত্ত্ববিদগণ "অর্থনৈতিক মানুষ" আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে সামাজিক আচরণ সমাজের সকল ব্যক্তির আচরণের সমষ্টি নয়। সামাজিক আচরণ ও প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বাইরে এবং ঊর্ধ্বে এবং সমাজ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ব্যক্তিভিত্তিক প্রকরণ (methodological individualism) তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে সমগ্রতাভিত্তিক প্রকরণ (methodological holism) সঠিক প্রণালী।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, "অর্থনৈতিক মানুষ" ধারণায় যুক্তিশীল মানুষের যে মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবতাবর্জিত কল্পনার ফানুস। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিশীল, আবার অনেক ক্ষেত্রে তার আচরণ যুক্তির ধার ধারে না। প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন পক্ষপাত-দোষ থাকে। এ সব পক্ষপাত সম্পর্কে এরা অনেক সময় জানেই না। অনেক বিষয় সম্পর্কে মানুষ অল্প কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণের চেষ্টা করে। অনেকে একবার যা বিশ্বাস করে তার বিপক্ষে অজস্র প্রমাণ থাকলেও সে মত পরিবর্তন করে না। আবার অনেকে কবির ভাষায়, "যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়" এবং যাহা পায় তাহা চায় না। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে না। একই প্রশ্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলে একই ব্যক্তি একেবারে উল্টো জবাব দেয়। ধরা যাক ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে শতকরা ৫৫ ভাগ রোগী ভালো হয় এবং ৪৫ ভাগ রোগী তাড়াতাড়ি মারা যায়। দেখা গেছে, যদি প্রশ্ন করা হয় ৫৫ ভাগ রোগী ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না—সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগীই হ্যাঁ-সূচক জবাব দেবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ৪৫ ভাগ ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি মরার সম্ভাবনা থাকলে এ চিকিৎসা করা ঠিক হবে কি না—সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগী এ চিকিৎসার বিপক্ষে মত দেয়। অর্থাৎ একই প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বিপরীত জবাব দেয়। এ ধরনের পক্ষপাতকে মনস্তত্ত্ববিদগণ Formulation bias বা উপস্থাপনগত পক্ষপাতিত্ব নাম দিয়েছেন।

সবশেষে নারীবাদী অর্থনীতিবিদ্‌গণ "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর ধারণাকে পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করেন। একজন নারীবাদী অর্থনীতিবিদ্ অর্থনৈতিক মানুষ সম্পর্কে লিখেছেন[৩]:

> As in our Robinson Crusoe stories, he has no childhood or old age, no dependence on anyone and no responsibility for anyone but himself.
>
> (আমাদের রবিনসন ক্রুসো গল্পের মত অর্থনৈতিক মানুষের শৈশব নেই, বার্ধক্য নেই, কারও উপর নির্ভরশীলতা নেই এবং নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারুর প্রতি দায়িত্ব নেই।)

নারীর জীবনে যে সব জটিল বাস্তবতা কাজ করে তার কোন উপলব্ধি "অর্থনৈতিক মানুষ" নামক ধারণাতে নেই।

"অর্থনৈতিক মানুষ" অবশ্যই একটি খণ্ডিত চিত্র। মানুষের জীবনের সামগ্রিক জটিলতা এতে বিধৃত নয়। তবু এ ধারণার একটা সুবিধা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ব্যবহার করে অর্থনীতির মূল সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করা সহজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফুকুইয়ামা মূলধারার অর্থনীতির একজন কড়া সমালোচক। তিনি মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ উপেক্ষা করা হয়েছে। এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও মূলধারার

অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ফুকুইয়ামার ভাষায়[৬]:

> The edifice of free market economies is, to repeat, about eighty percent right, which is not bad for a social science and substantially better than its rivals as the basis for public policy.
>
> (মুক্ত অর্থনীতির কাঠামো, আবার বলছি, প্রায় আশি শতাংশ সঠিক, এ সাফল্য একটি সমাজবিজ্ঞানের জন্য খারাপ নয় এবং গণনীতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে প্রতিযোগী শাস্ত্রসমূহের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রেয়।)

ফুকুইয়ামা কিসের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে শতকরা আশি নম্বর দিয়েছেন জানি না। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্ই মনে করেন যে, অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা যতই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হোক না কেন এ ধারণার ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। কাজেই এ ধারণা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কোন ধারণাই কেতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বাস্তব জীবনে সকল ধারণারই প্রভাব দেখা যায়। কাজেই প্রশ্ন ওঠে যে, "অর্থনৈতিক মানুষের" বিমূর্ত ধারণা মানুষের সামাজিক আচরণকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে। প্রাপ্ত উপাত্ত হতে দেখা যাচ্ছে, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় অর্থনীতিবিদ্দের আচরণে "অর্থনৈতিক মানুষের" ধারণা অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়। বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনীতিবিদ্রা নিজেরা নিজেদের ধারণার প্রেমে পড়েছেন। অর্থনীতিবিদ্দের অবস্থা গ্রীক রূপকথার রাজা পিগম্যালিয়নের মত। সাইপ্রাসের রাজা পিগম্যালিয়ন গজদন্তের একটি অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্তি তৈরি করেন। মূর্তিটি তৈরি করে নিজেই মূর্তিটির প্রেমে পড়ে যান। দেবীর আশীর্বাদে এই নারীমূর্তি গ্যালাটিয়া নামে আবির্ভূত হয়ে পিগম্যালিয়নের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর ধারণা প্রচার করতে করতে অর্থনীতিবিদ্গণ নিজেরাই নিজেরদেরকে অর্থনৈতিক মানুষের আদলে গড়ে তুলছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি সমীক্ষার ফলাফল নীচে তুলে ধরছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর। অর্থনীতির ছাত্ররা "অর্থনৈতিক মানুষ"-এর মত নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।[৭] সহকর্মীদের উপর তাদের আস্থা অনেক কম। এ সমীক্ষাতে এক দল ছাত্রের, যাদের মধ্যে অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের ছাত্র ছিল, প্রত্যেককে সমপরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। তাদের যে টাকা দেওয়া হয় তারা ইচ্ছা করলে সে টাকা নিজেরা রেখে দিতে পারে। অন্যথায় এ টাকার সম্পূর্ণ বা একটি অংশ দলের তহবিলে তারা বিনিয়োগ করতে পারে। দলের তহবিলে যে টাকা জমা হবে তার দেড় গুণ টাকা দেওয়া হবে। তবে দলের তহবিলের জন্য যে টাকা দেওয়া হবে তা দলের সকল সদস্যকে অর্থাৎ যারা টাকা জমা দিয়েছে এবং যারা টাকা জমা দেয়নি সকলে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। যদি সবাই একে অপরকে বিশ্বাস করে তবে সবাঁই

দলের তহবিলে টাকা জমা দিয়ে দেড় গুণ টাকা পাবে। যে বেশি স্বার্থপর সে ভাববে টাকা জমা না দিলেও দলের তহবিলের ভাগ পাওয়া যাবে, তাই সে নিজের সম্পূর্ণ অর্থ নিজের কাছে রেখে দেবে। আবার কেউ যদি দলের তহবিলে জমা না দেয় তবে কারো অর্থই বাড়বে না। এ নিরীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা তাদের অর্থের মাত্র ২০ ভাগ দলের তহবিলে বিনিয়োগ করে, পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় তারা দলের তহবিলে ৪৯ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করে। বেশির ভাগ অর্থনীতির ছাত্র অন্যের উপর মাগনা সওয়ারি (free riding) করতে চায়, দলের তহবিলে অর্থ বিনিয়োগ না করে লাভের ভাগ চায়।[৮] পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় তাদের বেশির ভাগ সহকর্মীদের বিশ্বাস করে, তাই দলীয় তহবিলে অনেক বেশি বিনিয়োগ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলেজের অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এ সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের তুলনায় অর্থনীতির অধ্যাপকদের গড় দানের পরিমাণ কম। অর্থনীতির অধ্যাপকদের ৯.২ শতাংশ আদৌ কোন দান খয়রাত করেনি। অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের দান না করার হার অর্থনীতির অধ্যাপকদের হারের প্রায় একতৃতীয়াংশ হবে।[৯]

অর্থনীতির ছাত্র ও অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের আচরণের তারতম্য সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে "কয়েদীর উভয় সঙ্কট" (prisoners dilemma) খেলাতে। এ খেলাতে দুইজন কয়েদী থাকে। এরা একই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত। পুলিশ উভয় কয়েদীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছে। পুলিশ দু'জন কয়েদীর সাথে আলাদা কথা বলে। পুলিশ তাদের স্বীকাররোক্তির ফলাফল সম্পর্কে নিম্নরূপ জানায় :

- যদি তুমি চুপ করে থাক এবং তোমার সহযোগী অপরাধ স্বীকার করে তবে তোমার পাঁচ বছরের জেল হবে এবং তোমার সহযোগীর তিন মাসের জেল হবে।
- যদি তুমি এবং তোমার সহযোগী দু'জনেই অপরাধ স্বীকার কর, তবে দু'জনেরই তিন বছরের জেল হবে।
- যদি তুমি স্বীকার কর আর তোমার সহযোগী চুপ করে থাকে তবে তোমার সহযোগীর পাঁচ বছরের জেল হবে আর তোমার তিন মাসের জেল হবে।
- যদি তোমরা উভয়েই চুপ করে থাক তবে তোমাদের দু'জনেরই এক বছরের জেল হবে।

যদি এক কয়েদীর অন্য কয়েদীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকে তবে উভয়েই চুপ করে থাকবে এবং উভয়েরই এক বছরে জেল হবে। কিন্তু এরা যদি একে অপরকে বিশ্বাস না করে তবে উভয়েই অপরাধ স্বীকার করবে এবং তিন বছরের কারাদন্ড ভোগ করবে।

কয়েদীদের উভয় সঙ্কটের মত পরিস্থিতিতে ছাত্ররা কি করবে এ সম্পর্কে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্রদের ৬০.৪ শতাংশ একে অপরকে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা উভয়েরই স্বীকারোক্তির পথ বেছে নেয়।

পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় এদের মাত্র ৩৮.৮ শতাংশ একে অপরকে বিশ্বাস করে না।[১০] এ ধরনের খেলাতে প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থনীতির ছাত্র তারা অন্যদেরকে অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বাস করে। তাই অন্যদের সাথে তাদের সহযোগিতা সীমাবদ্ধ। তারা অর্থনৈতিক মানুষের মতই স্বার্থপর। কিন্তু যারা অর্থনীতি পড়েননি তারা অপেক্ষাকৃত কম স্বার্থপর।

এ সব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনজন অর্থনীতিবিদ্ দাবি করেছেন যে, একই ধরনের পরীক্ষাতে তাঁরা ভিন্ন ধরনের ফল পাচ্ছেন।[১১] কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত। উপরন্তু মেয়েরা অর্থনীতি কম পড়ে, পুরুষদের সংখ্যা এখানে বেশি। অর্থনীতির ছাত্রদের আচরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ অর্থনীতির শিক্ষা নয়। এর একটি কারণ হল অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য। পুরুষরা সাধারণত স্বার্থপর হয়ে থাকে। অর্থনীতির ছাত্র ও অন্য বিষয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন তফাতের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করলেও দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা অধিকতর স্বার্থপর, তারা অন্যদের চেয়ে কম সহযোগিতা করে এবং অন্যের ঘাড়ে চড়ে মাগনা সওয়ারি করতে ভালবাসে। তার একটি বড় কারণ হল, অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে "অর্থনৈতিক মানুষের" ধারণা অনেক বেশি প্রখর। অর্থনীতিবিদ্‌রা নিজেদের বাগ্মিতায় নিজেরাই বিমুগ্ধ হয়ে যান এবং উৎসাহের সাথে "অর্থনৈতিক মানুষের" ধারণা বরণ করেন। এর ফলে মানুষ হিসাবে এরা অনেক বেশি স্বার্থপর ও অসহযোগী হয়ে ওঠেন। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ্ই এ অভিযোগ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, অর্থনীতি শুধু স্বার্থপরতাই শেখায়নি, আধুনিক অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুফলও শিখিয়ে থাকে। আধুনিক অর্থনীতির একটি মূল বক্তব্য হল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়–ক্রেতারও লাভ হয়, বিক্রেতারও লাভ হয়।

অবশ্য বেশিরভাগ সমীক্ষাতে দেখা যায় যে অর্থনীতিবিদ্‌গণ অন্যদের চেয়ে ভিন্ন এবং অধিকতর স্বার্থপর। কিন্তু এর কারণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণের ফলে অর্থনীতিবিদ্‌গণ সমাজের অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যান। এখানে পূর্ব-অনুমান হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের আগে সকল ছাত্রেরই জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সবাই অর্থনীতি পড়ে না কেন? কারা অর্থনীতিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে? অন্য বিষয় যারা পড়ে তাদের চেয়ে তারা কি ভিন্ন? যদি অর্থনীতি পড়ার আগেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ভিন্ন হয় তা হলে পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদ্‌দের আচরণ অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণের ফল না হয়ে তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রতিফলন হতে পারে। দু'জন অর্থনীতিবিদ্ একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রভাব সম্পর্কিত অনুমানই সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে "Economists are born, not made." (অর্থনীতিবিদ্‌গণ জন্মসূত্রে অর্থনীতিবিদ্, প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউকে অর্থনীতিবিদ্ করা হয় না।)[১২]

কারণ যাই হোক না কেন, অর্থনীতিবিদ্গণের অবস্থা অনেকটা মোল্লা নস্রুদ্দীনের মত। কথিত আছে, মোল্লা নস্রুদ্দীন একবার চিন্তামগ্ন হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন। এমন সময় একদল ছোকরা তাঁকে ঢিল মারতে থাকে। মোল্লা ছিলেন ছোটখাট মানুষ। শারীরিক কসরতে এতগুলি ছোকরার সাথে টিকে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোকরাদের নজর অন্যদিকে ফেরানোর জন্য মোল্লা বললেন, "তোমরা ঢিল মেরো না। আমি তোমাদের একটি ভাল খবর দিতে পারি।" ছেলেরা বলল, "বেশ, তাই বল, তবে তোমার দর্শন-টর্শন চলবে না।" মোল্লা বললেন, "আজকে আমীর সবাইকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বাইরে থেকে বাবুর্চি আনা হয়েছে। মজার মজার সব চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় তৈরি হচ্ছে।" মোল্লার কথা শুনে ছোকরারা আমীরের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। ছেলেদের দৌড় দেখে মোল্লাও তার কাপড় গুটিয়ে ছেলেদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকেন। মনে মনে বলতে থাকেন, "এতগুলি ছেলে দৌড়াচ্ছে, বলা ত যায় না সত্যি সত্যি যদি ভোজন থাকে।"

অর্থনীতিবিদ্গণ নিজেরাই "অর্থনৈতিক মানুষ" ধারণাটি গড়েছে। এখন নিজেরাই "অর্থনৈতিক মানুষ" ধারণার পেছনে দৌড়াচ্ছে।

## তথ্যসূত্র


১. Persky, Joseph, "Retrospectives : a Dismal Romantic", *The Journal of Economic Perspectives*, Fall 1990, vol. IV, No. 4, pp. 173-182

২. Persky, Joseph, "Retrospectives : The Ethnology of Homo Economicus", *The Journal of Economic Perspective*, Spring 1995, vol. IX, No. 2 pp. 221-232

৩. উদ্ধৃত Partington, Angela, ed., *The Concise Oxford Dictionay of Quotations* (Oxford : Oxford University Press, 1997), p. 77

৪. Sen, Amartya, "The Possibility of Social Choice," *American Economic Review*, June 1999. vol. 89, No. 3. pp. 349

৫. Nelson, Julie A., "Feminism and Economics," *The Journal of Economic Perspectives*, Spring 1995, vol. 9, No. 2

৬. Fukuyama, Francis, *Trust* (New York : Simon and Schuster, 1995), p. 17

৭. Frank, Robert L., et al., "Does Studying Economics Inhibit Cooperation", *The Journal of Economic Perspectives*, Spring 1993, vol. 7, No. 2, pp 159-171

৮. Maxwell, Gerald and Ruth Ames, "Economic Free Ride, Does Anyone Else," *Journal of Public Economics*, June 1981, 15:3, pp. 295-316

৯. Frank, Robert L., et al, *প্রাগুক্ত*, p. 162

১০. *প্রাগুক্ত*, ১৬৩-১৬৭

১১. Yezer, Anthony M., et al., "Does Studying Economics Discourage Cooperation", *The Journal of Economic Perspectives*, Winter 1996. vol. X, No. 1, pp. 177-186

১২. Carter, John R. and Irons, Michael D., "Are Economists Different and If so, Why?" *The Journal of Economic Perspectives*, Spring 1991, vol. V. No. 2. pp. 171-177

# অর্থনীতির দর্শনের সন্ধানে

প্রখ্যাত দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (Ludwig Wittgenstein) মনে করতেন যে, দর্শন একটি অতি সহজ বিষয়। তাই তিনি লিখেছেন[১]: "A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." (একটি চিন্তাশীল ও উত্তম দার্শনিক গ্রন্থ শুধুমাত্র ঠাট্টা-তামাশার সমাহারে লেখা সম্ভব।) যাঁরা দর্শন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা অনেকেই ভিটগেনস্টাইনের সাথে একমত হবেন না। কিন্তু আমার মত যারা অর্বাচীন তাদের পক্ষে অবশ্য দর্শন পুরোপুরি না বুঝলেও ঠাট্টা-তামাশাটাই বোঝা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির দর্শন সম্পর্কে আমার নিজের আগ্রহ জন্মে একটি মজার ঘটনা থেকে। ষাটের দশকে আমাদের এক বন্ধু, যিনি ছিলেন গড়পড়তা মানের ছাত্র, ক্লাসের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। ক্লাসের তাবৎ তুখোড় তুখোড় ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেল করে যায়। কাজেই সবাই আগ্রহের সাথে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া বন্ধুটির খাতা দেখতে যাই। পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল : "একচেটিয়া উৎপাদকের সরবরাহ রেখা আছে কি?" এ প্রশ্নের সঠিক জবাব হল, নেই (কেননা সরবরাহ রেখাতে বিভিন্ন বাজার দরে সরবরাহের পরিমাণ প্রতিফলিত হয়, একচেটিয়া ব্যবসায়ে পণ্যের দাম বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না – একচেটিয়া উৎপাদক নিজেই নির্ধারণ করে)। ক্লাসের সবাই জবাব দেয়, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সরবরাহ রেখা আছে। আমার বন্ধুটি প্রশ্নটির জবাব জানতেন না। তিনি দীর্ঘ জবাব দিয়ে যা বলেন তার সারমর্ম হল: কেউ কেউ বলেন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সরবরাহ রেখা আছে, আবার কেউ কেউ বলেন নেই; আমার মনে হয় এটি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। ক্লাসে সবাই ভুল উত্তর দেওয়াতে শিক্ষক মহোদয় এই অস্পষ্ট জবাবকেই সর্বোচ্চ নম্বর দেন। আমার বন্ধুর উত্তরটি অবশ্য আমারও পছন্দ হয়েছিল। তাঁর উত্তরের মধ্যে বিনয় ছিল, সবজান্তার ভাব ছিল না। পরবর্তীকালে জানতে পারি যে, আমার বন্ধুর সংশয়বাদ তাঁর মৌলিক অবদান নয়। দর্শনের জগতে সংশয়বাদ একটি অতি পুরানো মতবাদ। দু'হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক আরসেসিলস (Arcesilaus)

লিখেছেন[২]: "Nothing is certain, not even that." (কোন কিছুই নিশ্চিত নয়, এমনকি যা বললুম তাও নয়)। এই সংশয়বাদই দার্শনিক নীটসের হাতে "মিথ্যুকের আপাত-স্ববিরোধী সত্য"-এর (liar paradox) রূপ লাভ করে।[৩] নীটস বলতেন, সত্য বলে কিছু নেই, শুধু সত্য নামধারী কতগুলি ব্যাখ্যা রয়েছে। নীটসের বক্তব্য যদি সঠিক হয়, সত্য সম্পর্কে নীটসের ব্যাখ্যাও সঠিক হতে পারে না, এ ব্যাখ্যাও মিথ্যা।

বিজ্ঞান অবশ্য জন্মলগ্ন হতেই নিজেকে সংশয় হতে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। বার্ট্রান্ড রাসেল সুন্দরভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে তফাৎ করেছেন[৪]: "Science is what you know, philosophy is what you do not know" (বিজ্ঞান হচ্ছে আমরা যা জানি, দর্শন হচ্ছে আমরা যা জানি না)। বিজ্ঞানীরা অপরিবর্তনীয় সত্য জানতে চান। দার্শনিকদের আনন্দ "সত্যের আপাত-স্ববিরোধিতায়।" দার্শনিক কীর্কেগার্ড (Kierkegaard) লিখেছেন[৫]: "The thinker without a paradox is like a lover without feeling, a paltry mediocrity." (আপাত-স্ববিরোধী সত্য ছাড়া একজন চিন্তাবিদ্ হচ্ছেন অনুভূতিহীন প্রেমিকের মত, তুচ্ছ সাধারণ ব্যক্তিত্ব)। বিজ্ঞানীরা সংশয়ের দোদুল দোলায় দুলতে রাজি নন। তাই তাঁরা সংশয়-মুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জন্মলগ্ন থেকেই বিজ্ঞানের টোপর মাথায় নিয়ে অর্থনীতির আত্মপ্রকাশ। লাগসই দর্শনের সন্ধানে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে টানাপড়েন ও আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দেয় তা অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে ছিল অনেকাংশে অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাতে অর্থনীতিবিদ্‌রা আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতির স্বীকৃতি। তাই তাঁরা বারবার সমকালে সর্বাধিক জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিত্তিতে তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতির দর্শনের ও বিজ্ঞানের দর্শনের ইতিহাস বহুলাংশে অভিন্ন এবং সকল ক্ষেত্রেই সমান্তরাল।

অর্থনীতির জন্ম আঠারো শতকে। ততদিনে বিজ্ঞানের দর্শন অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এসেছে। খৃষ্টের জন্মের দু'শ থেকে চার শ বছর আগে–অর্থাৎ অর্থনীতির জন্মের প্রায় দু'হাজার থেকে বাইশ শ বছর আগে গ্রীসে ইউক্লিড তাঁর জ্যামিতিতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের একটি নতুন মান প্রতিষ্ঠা করেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্বয়ংসিদ্ধ সত্য (axioms) থেকে তর্ক ও যুক্তির ভিত্তিতে নতুন নতুন উপপাদ্য প্রমাণ করা সম্ভব। এ ধরনের উপপাদ্য তর্কশাস্ত্র অনুসারে অবিসংবাদিত সত্য। নতুন প্রকরণের সাথে আঠারো শতকে নতুন দর্শন সংযুক্ত হয়। আঠারো শতকের সমাজবিজ্ঞানী আগস্ট কোঁতের (August Comte) মতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির তিনটি পর্যায়ে বিকাশ ঘটেছে। প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানের উৎস ছিল ধর্মতত্ত্ব (theology)। এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হত যে, নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব–মানুষের পক্ষে নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্ঞানের উৎস হল পরাবিদ্যা (metaphysics)। পরাবিদ্যা হল চূড়ান্ত বাস্তবতা সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদ, পরাবিদ্যার সূত্রসমূহ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ সম্ভব নয়। সবশেষ পর্যায়ে জ্ঞানের উৎস হল

দৃষ্টবাদ বা প্রত্যক্ষবাদ (positivism)। প্রত্যক্ষবাদই হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস। প্রত্যক্ষবাদ শুধুমাত্র সে জ্ঞানকেই বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করে যা বক্তা-নিরপেক্ষ (objective) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষবাদ আর ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রকরণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যে নতুন দর্শন গড়ে ওঠে তার নাম হল প্রতিপাদনবাদ (verificationism)। অবশ্য এ দর্শনের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে বিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনার দার্শনিকদের হাতে। এ মতবাদের মূল প্রতিজ্ঞা অথবা তর্কের ভিত্তি (premise) হল দুটি। প্রথমত বৈজ্ঞানিক বক্তব্য এমন হবে যা প্রমাণ করা সম্ভব। কেউ যদি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে এক হাজার বছর পর কেয়ামত হবে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বৈজ্ঞানিক বক্তব্য রূপে গণ্য করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক বক্তব্য দু'ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব : পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে অবরোহ (deductive) পদ্ধতি অনুসরণ করে অথবা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরোহ (inductive) পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

মূলত ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌রা বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনীতি হল প্রতিপাদনভিত্তিক বিজ্ঞান। রিকার্ডো দাবি করতেন যে তাঁর সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রমাণ সম্ভব। ধ্রুপদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌রা ঐতিহাসিক ঘরানা বা প্রতিষ্ঠানিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ্‌দের সাথে কখনও একমত হননি যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অর্থনীতির মূল সূত্রসমূহ পরিবর্তিত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ বিশ্বজনীন সত্য।

আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রতিপাদনবাদকে যতই নিখুঁত প্রকরণ মনে হোক না কেন, বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে সত্যতা প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসাবে প্রতিপাদনবাদের দুটো দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই সকল বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। কাজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হল জানা সত্য হতে অজানা সত্যে উপনীত হওয়া। অবরোহ পদ্ধতিতে সাধারণত দুটি প্রতিজ্ঞা থেকে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নরূপ তার্কিক প্রক্রিয়াটি দেখা যেতে পারে:

মানুষ মরণশীল,<br>
সক্রেটিস মানুষ,<br>
সুতরাং সক্রেটিস মরণশীল।

এই তার্কিক প্রক্রিয়াতে দুটো প্রতিজ্ঞাই সত্য, তাই সিদ্ধান্তও এ ক্ষেত্রে সঠিক। এ ক্ষেত্রে দুটি জানা সত্য হতে একটি অজানা সত্যতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত সঠিক হলেই প্রতিজ্ঞাসমূহ সত্য হবে এ ধরনের নিশ্চয়তা নেই। উদাহরণ স্বরূপ নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

সকল অর্থনীতিবিদ্ পুরুষ
আইনস্টাইন একজন অর্থনীতিবিদ্
সুতরাং আইনস্টাইন একজন পুরুষ

এ ক্ষেত্রে দুটো প্রতিজ্ঞাই ভুল। সকল অর্থনীতিবিদ্ পুরুষ নন এবং আইনস্টাইন একজন অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না। তবু আইনস্টাইন একজন পুরুষ সিদ্ধান্তটি সঠিক। তর্কের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তর্কশাস্ত্রে দুটো সূত্র রয়েছে।[৬] একটি সূত্র "modus ponens" নামে পরিচিত। এ সূত্র অনুসারে দুটো সত্য প্রতিজ্ঞা বা বক্তব্য হতে একটি নতুন সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু সিদ্ধান্ত সঠিক হলে প্রতিজ্ঞাসমূহ সঠিক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয় সূত্রটি "modus tollens" নামে অভিহিত। এ সূত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত অসত্য হলে, প্রতিজ্ঞা দুটি বা কমপক্ষে একটি প্রতিজ্ঞা অসত্য হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত সত্য হলেই প্রতিজ্ঞাসমূহের সত্যতা সম্পর্কে কোন অনুমান সম্ভব নয়। কাজেই তর্কের ভিত্তিতে সব সময়ে অজানা সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপাদনবাদ তাই অচল।

দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান (statistical inference)। দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কোন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপাদন সম্ভব নয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে শুধু এতটুকু বলা সম্ভব যে কোন প্রতিজ্ঞা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞা বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হলেই তা সত্য নয়। এর কারণ হল সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমানের দু'ধরনের ক্রটি রয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিকরা এ সব ক্রটির নাম দিয়েছেন : পয়লা কিসিমের ক্রটি (type I error) এবং দোসরা কিসিমের ক্রটি (type II error)। সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমানসমূহ সকল সম্ভাব্য সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় না, কেননা সকল সম্ভাব্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রচুর সময় ও সম্পদের প্রয়োজন। তাই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্ভর করে সংখ্যার দৈব চয়নের উপর। দৈব চয়নের (random sampling) ভিত্তিতে যে সব সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না সে সব সংখ্যা সম্পর্কেও অনুমান করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একশ ভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ থেকে ৯৯ ভাগ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিশ্চয়তার পর্যায় যত উঁচু হবে প্রাপ্ত গড় তথ্যের সাথে সম্ভাব্য তথ্যের আস্থার ব্যবধান (confidence interval) তত বড় হবে। পক্ষান্তরে নিশ্চয়তার পর্যায় যত কম হবে আস্থার ব্যবধান তত কম হবে। অর্থাৎ নিশ্চয়তার পর্যায় কম হলে প্রতিপাদনীয় বক্তব্য সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ পর্যায়ে প্রতিপাদনযোগ্য বক্তব্য গ্রহণীয় মনে হলেও, প্রতিপাদনটি ভুল হওয়ার মত যথেষ্ট পাল্টা তথ্য থাকতে পারে। যদি প্রতিপাদনীয় বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় অথচ আসলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে তাকে type I error অথবা পয়লা কিসিমের ক্রটি বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের ভ্রান্তি হ্রাসের

উপায় হল নিশ্চয়তার পর্যায় বৃদ্ধি। নিশ্চয়তার পর্যায় বাড়লে প্রাপ্ত উপাত্তের গড়ের সাথে আস্থার ব্যবধান বাড়বে। তার ফলে অনেক প্রতিপাদনীয় বক্তব্য সঠিক হলেও সে সব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হবে না। এ ধরনের ভ্রান্তিকে type II error বা দোসরা কিসিমের ক্রটি বলা হয়ে থাকে। বাস্তব পরিস্থিতি হল প্রথম ধরনের ভ্রান্তির সম্ভাবনা হ্রাস করতে গেলে দ্বিতীয় ধরনের ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ধরনের ভ্রান্তি কমাতে গেলে প্রথম ধরনের ভ্রান্তি বেড়ে যায়। কাজেই সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে কোন বক্তব্যই নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।[৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্ জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতির সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বড় তফাৎ তুলে ধরেন। অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের মত অমোঘ নয়। অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ হচ্ছে প্রবণতা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম সকল ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি সাধারণ অর্থনৈতিক সূত্র হল এই যে, কোন পণ্যের দাম কমলে ক্রেতারা তা বেশি পরিমাণে কিনবে। কিন্তু সকল ক্রেতা একই ধরনের ব্যবহার নাও করতে পারে। অতি অল্প সংখ্যক ক্রেতা থাকতে পারে যারা কোন পণ্যের দাম কমলেও তা কম কেনে। অতি অল্প সংখ্যক ক্রেতার এই আচরণের জন্য মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সূত্র অচল বলে গণ্য করা সঠিক হবে না। এই ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক ক্রেতার আচরণ হল ব্যাতিক্রমধর্মী—যাকে জন স্টুয়ার্ট মিল বিশৃঙ্খল শক্তি (disturbing force) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে বিশৃঙ্খল শক্তির বদলে *ceteris paribus* শর্তাবলীর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। *ceteris paribus*-এর অর্থ হল অন্যসব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থনৈতিক সূত্রের ক্ষেত্রে অনুক্ত অনুমান হল যে, অন্যসব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে অর্থনীতিবিদ্‌দের বর্ণিত প্রবণতা দেখা যাবে। অনেকে মনে করে থাকেন যে, অন্যসব কিছু অপরিবর্তিত থাকার শর্ত শুধু অর্থনীতিতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত প্রয়োগ করা হয় না। এ অনুমান কিন্তু মোটেও সঠিক নয়। অতি অল্পসংখ্যক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের ক্ষেত্রে এ শর্ত ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই অনুমান করতে হয় যে, অন্য কিছু পরিবর্তিত হয়নি। অন্যসব কিছু অপরিবর্তিত থাকার শর্ত যোগ করার সাথে সাথে অর্থনীতির সূত্রসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই। যদি বাস্তবতা সূত্রের সাথে না মেলে, তাহলে সূত্র অবশ্যই ক্রটিপূর্ণ প্রমাণিত হবে না। বরং পরীক্ষা করে দেখতে হবে—যে উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সূত্রের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ রয়েছে কি না। তাই প্রতিপাদনবাদের ভিত্তিতে অর্থনীতির কোন সূত্র বাতিল করা সম্ভব নয়।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে প্রতিপাদনবাদ প্রয়োগ আদৌ ফলপ্রসূ কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনুসন্ধেয় বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানী

ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত নয়। পর্যবেক্ষণ ও গণনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বাইরে থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে তা সম্ভব নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশীদার। এর অসুবিধে আছে, আবার সুবিধেও আছে। অসুবিধা হল, সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ তাঁদের গবেষণাকে পক্ষপাত-দুষ্ট করে তুলতে পারে। সুবিধা হল, সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষ অংশীদার হওয়ার ফলে অন্তর্জ্ঞান (intuition) এবং অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা (empathy) প্রয়োগ করে গভীর ও অর্থবহ বিশ্লেষণ সম্ভব। এ ধরনের পদ্ধতিকে জার্মান সমাজবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "verstehen", যার আক্ষরিক অনুবাদ হল "উপলব্ধি"। সমাজবিজ্ঞানে প্রতিপাদনবাদ সমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিতে পারে, কিন্তু "উপলব্ধি" দিতে পারবে না।

প্রতিপাদনবাদের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা হতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বৈজ্ঞানিক বক্তব্যসমূহের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক বক্তব্য হল ফৌজদারী মামলার আসামীর মত। ফৌজদারী মামলায় কেউ নির্দোষ কি না প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রমাণিত হয় কেউ নিঃসন্দেহে অপরাধী কি না, কোন সন্দেহ থাকলে আসামী "অপরাধী নয়" বলে বিবেচিত হবে। বৈজ্ঞানিক বিবৃতিও মিথ্যা হলে তা প্রমাণ করা সম্ভব। যে সব বিবৃতি এখন পর্যন্ত মিথ্যা নয় সে সব বিবৃতি সত্য প্রমাণিত হতে পারে, নাও হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের নতুন দর্শন নিয়ে আসেন কার্ল পপার। পপারের বক্তব্য হল বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ সম্ভব নয়; শুধুমাত্র অসারতা প্রতিপাদন সম্ভব। পপারের এই নতুন মতবাদের নামকরণ করা হয় অসারতা-প্রতিপাদনবাদ (falsificationism)। পপারের বিশ্লেষণ অনুসারে, কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রই সত্য নয়, সব বৈজ্ঞানিক সূত্রই হল সাময়িক অনুমান, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হবে না, তা ব্যবহৃত হতে থাকবে। এইভাবে মিথ্যা সূত্রসমূহ বাদ দিতে দিতে বিজ্ঞান সত্যের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একটি বক্তব্যের সমর্থনে অজস্র সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও একে সত্য বলে গণ্য করার উপায় নেই। ভবিষ্যতে যদি একটিও উল্টো প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পপারের একটি প্রিয় উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। পপার বলতেন যে, আমরা যত শাদা বকই দেখি না কেন বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে সকল বকই শাদা কেননা একটিও যদি ভিন্ন বর্ণের বক দেখা যায় তবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতে হবে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলতেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বিয়োগান্ত নাটক হল একটি সুন্দর তত্ত্বের শুধু একটি মাত্র বিসদৃশ তথ্য দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। পপারের বক্তব্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই পপারের "অসারতা-প্রতিপাদনবাদ" গ্রহণ করে। অর্থনীতিতে এ তত্ত্ব প্রথম প্রয়োগ করেন টি ডাবলু হাচিনসন (T. W. Hutchinson)। পরবর্তীকালে স্যামুয়েলসনসহ অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্‌ই এ মতবাদ গ্রহণ করেন।

দার্শনিকরা "প্রতিপাদনবাদের" দুর্বলতাসমূহ স্বীকার করেন, কিন্তু "অসারতা-প্রতিপাদনবাদ" পূর্ববর্তী দর্শনের চেয়ে উন্নত এ বক্তব্য তারা মোটেও মানেন না। পপারের দর্শনের তিনটি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, শুধুমাত্র দু'একটি অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য পেলেই কোন তত্ত্বকে মিথ্যা বলে বাতিল করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সবসময়েই সন্দেহ থেকে যায় যে, প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ যথেষ্ট নয়। উপরন্তু তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে আদর্শ অবস্থা অনুমান করা হয়েছিল সে অবস্থা বাস্তবে নাও থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল, একটি তত্ত্ব বাতিল করাই যথেষ্ট নয়, এর বিকল্প তত্ত্বও সাথে সাথে দাঁড় করাতে হবে। দ্বিতীয়ত, উপাত্ত শূন্য থেকে আসে না। যে কোন উপাত্ত সংগ্রহ করার আগে একটি পূর্ব-ধারণা (hypothesis) থেকে শুরু করতে হয়। আর এ সব পূর্ব-ধারণা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রচলিত তত্ত্ব দ্বারা। কাজেই বক্তা-নিরপেক্ষ (objective) কোন উপাত্ত নেই। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে মার্ক ব্লাউ (Mark Blaug) যথার্থই বলেছেন, সকল উপাত্তই হল তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত আর সকল তত্ত্বই হল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত।[৮] কাজেই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিরপেক্ষ উপাত্তের কষ্টিপাথরে যারা তত্ত্বের যাচাই করার বড়াই করে তারা মিথ্যার মোহে আচ্ছন্ন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ্ আলফ্রেড মার্শাল যথার্থই লিখেছেন[৯]: "The most reckless and dangerous theorist is the man who claims to let the facts speak for themselves." (সবচেয়ে বেপরোয়া ও বিপজ্জনক হচ্ছে সেই তত্ত্ববিদ যিনি দাবি করেন যে উপাত্ত নিজে নিজে কিছু প্রমাণ করবে)। তৃতীয়ত, যেখানে কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের শুধু একটি কারণ থাকে পপারের পদ্ধতি সেখানে সহজভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু যেখানে অনেক কারণ থাকে সেখানে কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রতিপাদনবাদের মত অসারতা-প্রতিপাদনবাদও আদর্শ প্রকরণ হিসাবে দার্শনিকদের সমর্থন লাভ করতে পারেনি।

দার্শনিকদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে সকলক্ষেত্রে সত্যতা বা অসত্যতা কোনটিই প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়। টমাস কুন (Kuhn) তাই মনে করেন যে, বিজ্ঞানীদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করে বিজ্ঞানের দর্শন নির্ধারণ করা যাবে না, বরং বিজ্ঞানীরা কিভাবে বিজ্ঞান চর্চা করছে তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানের দর্শন প্রণয়ন করা সম্ভব। তাঁর মতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিজ্ঞানের দর্শন এবং বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বের সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে তত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে। টমাস কুনের মতে বিজ্ঞানে বিশেষ সূত্রের সত্যতা বা অসত্যতা বড় কথা নয়। বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আদল বা paradigm ।[১০] এই তাত্ত্বিক আদল সম্পর্কে সমকালীন বিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করে। এই আদল দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত থাকে। তবে মাঝে মাঝে আদলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াতে একটি আদলের স্থলে ভিন্ন আদল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তা অপরিবর্তিত থাকে। কুনের আদল তত্ত্ব (paradigm theory) সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কিন্তু দার্শনিকগণ কুনের সাথে একমত নন। কুনের বক্তব্য মেনে নিলে

বৈজ্ঞানিকদের সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, তাত্ত্বিক আদল পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা তত্ত্বকে প্রভাবিত করবে না। আসলে তাত্ত্বিক আদলে আকস্মিক বিপ্লব আসে না। ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাত্ত্বিক আদল পরিবর্তিত হয়। উপরন্তু একটি আদল অন্য আদলের চেয়ে শ্রেয় তা প্রমাণ করা সহজ নয়। কাজেই আদল পরিবর্তনের ফলে বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ঘটেছে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তত্ত্ব হিসাবে নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও কুনের তত্ত্বের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রথমত, কুন প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কোন কোন বিজ্ঞানে বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে (core areas) শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার (empirical evidence) ভিত্তিতে তত্ত্বে পরিবর্তন ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের আচরণ সম্পর্কে নানা ধরনের প্রতিকূল উপাত্ত থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদ্গণ এখন পর্যন্ত লাভ-সর্বোচ্চায়নের (profit-maximization) পূর্বানুমান বাতিল করে নি। দ্বিতীয়ত, কুন আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞান সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে। তাই বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বকে উপেক্ষা করার জো নেই।

আদল তত্ত্বের (paradigm theory) পরবর্তী পর্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিমিত্তবাদ (predictive instrumentalism) উপস্থাপিত হয়। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীর নিমিত্ত মাত্র। এ সব তত্ত্বের কার্যকারিতা নির্ভর করে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের উপর। অর্থনীতিতে এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা হলেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। তাঁর মতে অর্থনৈতিক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতার কষ্টিপাথর হল, এই তত্ত্ব সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কি না। যদি তত্ত্ব সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী না করতে পারে তবে তত্ত্বের পূর্বানুমান সঠিক হলেও কিছু লাভ নেই। আর যদি সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তবে যে সব পূর্বানুমান ব্যবহৃত হয় সেগুলো সঠিক না হলেও কিছু যায় আসে না। মিল্টন ফ্রিডম্যানের লেখা পড়লে এক পাদ্রী সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ে যায়। একজন অত্যন্ত ধার্মিক পাদ্রী সারা জীবন সৎ পথে থেকে ধর্ম সাধনা করেন। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে সেই পাদ্রী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত একজন বেপরোয়া ট্যাক্সি-চালকের শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। এর কয়দিন পর পাদ্রী নিজে মারা যান। স্বর্গে যাওয়ার পর পাদ্রী দেখতে পান যে, ট্যাক্সি চালকেরও স্বর্গে স্থান হয়েছে। কিন্তু স্বর্গে ট্যাক্সি চালকের মর্যাদা পাদ্রী সাহেবের অনেক ঊর্ধ্বে। পাদ্রী মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সেন্ট পিটারকে বললেন, ট্যাক্সি চালকটি মাতাল হয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালাত এবং নানা কুকর্মে লিপ্ত থাকত। তিনি সারা জীবন ধর্মকর্ম করেছেন, অথচ স্বর্গে তাঁর মর্যাদা ট্যাক্সি চালকের নীচে। স্বর্গে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা ন্যায় বিচার নয়। সেন্ট পিটার জবাব দিলেন, "দেখ হে বাপু, স্বর্গে স্থান নির্ভর করে কার্যকারিতার উপর। তুমি অবশ্যই নিজে ধর্মকর্ম করেছ। কিন্তু তুমি খুব বেশি লোককে দিয়ে প্রার্থনা করাতে পারনি। গির্জায় তোমার বক্তৃতা শুনে বেশির ভাগ শ্রোতা ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু বেপরোয়া ট্যাক্সি চালক যখনই গাড়ি চালাত, গাড়ির আরোহীরা ভয়ে জোরে জোরে (প্রাণ বাঁচানোর জন্য)

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে ট্যাক্সি চালক অনেক কার্যকর। তাই স্বর্গে তার স্থান উপরে।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করাই যথেষ্ট নয়, সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। কাকতালীয়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হলে চলবে না। পূর্বানুমান ভুল হলেও সিদ্ধান্ত সঠিক হবে এ ধরনের ধারণা অর্থনীতিবিদ্‌দের সম্পর্কে একটি বহুল-প্রচলিত গল্প মনে করিয়ে দেয়। একবার একটি নির্জন দ্বীপে একজন প্রকৌশলী, একজন পাদ্রী ও একজন অর্থনীতিবিদ্ আটকা পড়েন। তাঁদের সাথে একটি টিনের বাক্স ভর্তি খাবার ছিল। টিনের বাক্সটি খোলার জন্য কোন যন্ত্র ছিল না। প্রথমে প্রকৌশলীকে টিনের বাক্সটি খোলার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকৌশলী দ্বীপে যে সব পাথর, ডালপালা পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে টিনের বাক্সটি খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এবার প্রকৌশলীটি পাদ্রীকে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। পাদ্রী তাঁর অনুরোধ শুনে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মত ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনা করার পরও ভগবানের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন দু'জনে অর্থনীতিবিদের পরামর্শ চাইলেন। অর্থনীতিবিদ্ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "অনুমান করুন টিনের বাক্স খোলার যন্ত্র আমাদের কাছে রয়েছে।" কিন্তু অনুমান করা ছাড়া অর্থনীতিবিদ্ আর কোন পরামর্শ দিতে পারেনি।

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের অপ্রতুলতার ফলে সম্প্রতি এক নতুন দর্শনের জন্ম হয়েছে। এ দর্শনের নাম হল দার্শনিক নৈরাজ্য (philosophical anarchism)। এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন ফেয়েরাবেন্ড (Feyerabend)।[১১] তাঁর লেখা পড়লে ১৯৭১ সালে আমার এক তরুণ সহকর্মী আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, "ঠেইলা খেলেন, ফাউল নাই।" আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, ফেয়েরাবেন্ডের জগতেও ফাউল নেই। ফেয়েরাবেন্ডের শ্লোগান ছিল–"Anything goes" অর্থাৎ সব কিছুই চলবে। ফেয়েরাবেন্ডের যুক্তি হল যে, কোন বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের দর্শনের আদর্শ প্রকরণ অনুসরণ করে বিজ্ঞান চর্চা করেনি। যদি বিজ্ঞানীরা বিশেষ প্রকরণে বন্দী হয়ে যেত তবে বিজ্ঞানের বিকাশই সম্ভব হত না। অবশ্য ফেয়েরাবেন্ড এ কথাও বলেছেন যে, সব কিছু চলবে মানে এই নয় যে বিজ্ঞান চর্চার কোন পদ্ধতি নেই। এর অর্থ হল, যে কোন পদ্ধতি দিয়েই বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব। ফেয়েরাবেন্ডের বক্তব্য হল সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি মাত্র পদ্ধতি নেই, বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, দার্শনিক নৈরাজ্য বিজ্ঞানের জগতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেনি, বরং বিজ্ঞানের জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা এবং বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

দার্শনিক নৈরাজ্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব বা chaos theory"র উদ্ভব হয়েছে।[১২] এতদিন বিজ্ঞানের জগত ছিল সমস্থিতির (equilibrium); এ জগত ছিল বিন্যস্ত (orderly)। এ জগতে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের স্থান ছিল না।

বিশৃঙ্খলা-তত্ত্বের প্রবক্তারা এ জটিল জগতের সমাধান খুঁজছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গঠনকারী এককসমূহের ব্যবহার সমগ্র ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সূত্রে এ সব বৈসাদৃশ্যের কোন ব্যাখ্যা ছিল না। অত্যন্ত জটিল ও বিস্তারিত অঙ্কের ভিত্তিতে "বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব" বিজ্ঞানের জগতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। "বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব" ইতোমধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব প্রয়োগ করা হচ্ছে। পল ক্রুগম্যান বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ভিত্তিতে আঞ্চলিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেছেন।[১৩]

বিজ্ঞানের দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিতর্কের সাথে সাথে বার বার প্রশ্ন উঠছে অর্থনীতি আদৌ বিজ্ঞান কি না। অর্থনীতিবিদ্ ম্যাকলস্কির (McCloskey) মতে অর্থনীতির পদ্ধতি আসলে বৈজ্ঞানিক নয়। তাঁর মতে অর্থনীতি হচ্ছে বাগ্মিতার মাধ্যমে বক্তব্য বোঝানোর প্রয়াস (rhetorical persuasion)। ম্যাকলস্কির বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন[১৪]:

> Economic theories and models do not speak for themselves and against their rivals. Data do not speak for or against theories. Logic does not speak for or against theories. Economists speak for or against theories by appealing to data, logic and a number of other things. Economists attempt to justify theories by trying to persuade their audiences.
>
> (অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও আদলসমূহ নিজেরা নিজেদের সপক্ষে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের বিপক্ষে কথা বলে না। উপাত্ত কোন তত্ত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলে না। তর্কশাস্ত্র কোন তত্ত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলে না। অর্থনীতিবিদ্‌গণ উপাত্ত, তর্ক ও অনেক কিছু ব্যবহার করে কোন তত্ত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁদের শ্রোতাদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি করে তাঁদের তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপাদন করেন।)

ম্যাকলস্কির বাগ্মিতা চাপাবাজি  নয়। এ বাগ্মিতা হচ্ছে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বক্তাদের বক্তব্য শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয়। ম্যাকলস্কির মতে অর্থনীতিতে চূড়ান্ত সত্য কিছু নেই। অর্থনীতিতে সত্য অর্থ নিশ্চয়তা নয়। অর্থনীতিতে সত্য অর্থ হল আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ বা যুক্তিসঙ্গত (plausible) । এ ধরনের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। এ ধরনের যুক্তিতর্কে নিয়ম মেনে চলতে হবে। এ প্রক্রিয়াতে জানার আগ্রহ থাকতে হবে এবং অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। যাঁরা অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ একমাত্র এঁদের পক্ষেই এ ধরনের যুক্তিতর্ক ব্যবহার করা সম্ভব।

সকল ধরনের বিজ্ঞানে ও বিশেষ করে অর্থনীতিতে বাগ্মিতার বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু অর্থনীতির সবটুকুই বাগ্মিতা এ ধরনের দাবি অতিরঞ্জিত। অর্থনীতিবিদ্‌গণ এত যত্নের সাথে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করছেন তার সবটুকুই

ছলনা নয়। অবশ্য ম্যাকলস্কি দাবি করছেন যে American Economic Reviewতে যে সব প্রবন্ধ ছাপা হয় তার শতকরা ৭৫ ভাগ সংখ্যাতত্ত্বের অপপ্রয়োগ করে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ বস্তুনিরপেক্ষ না থাকতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্ই প্রতারণা করছেন এ দাবি গ্রহণ করা শক্ত। এঁদের অনেকেই লব্ধ উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে তাঁদের মতামত পরিবর্তন করে থাকেন। অর্থনীতিতে বাগ্মিতা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অর্থনীতি শুধু বাগ্মিতাতে সীমাবদ্ধ নয়।

বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে দীর্ঘ ও অমীমাংসিত বিতর্ক হতে বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বলতা ও সবলতা দুটো দিকই বের হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের দীর্ঘ পথ পরিক্রমাতে আজ আমরা বুঝতে পারছি বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সন্ধান, জ্ঞানের প্রাপ্তি নয়; বিজ্ঞান জ্ঞানের সংকলন নয়, বিজ্ঞান হল জ্ঞান অর্জনের কার্যকলাপ। এই নতুন মতবাদ অবধারণমূলক নিমিত্তবাদ (cognitive instrumentalism) হিসাবে পরিচিত। এ মতবাদ অনুসারে তর্ক ও উপাত্তসমূহ অবধারণের বা উপলব্ধির নিমিত্ত মাত্র। বিজ্ঞানের সাধনার ফলে বিশ্ব সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যাবে, কিন্তু এই জ্ঞানকে নিশ্চিত গণ্য করা ঠিক হবে না। বিজ্ঞানের যত বিকাশ হবে ততই আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা কমে আসবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে আমাদের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই থাকবে অনিশ্চিত (contingent)। বস্তুনিরপেক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান অর্থনীতির আদর্শ হিসাবে থাকবে–কিন্তু অর্থনীতি সংক্রান্ত জ্ঞানের বিশেষত্ব হবে না। এতে আমাদের অবশ্য হতাশ হওয়ার কারণ নেই। অধ্যাপক স্কট গর্ডন (Scott Gordon) সুন্দরভাবে বলেছেন[১৫]:

> Perfect cleanliness is also impossible but that does not serve as a warrant for not washing, much less for rolling in a manure pile.
> (নিখুঁত পরিচ্ছন্নতাও অসম্ভব, কিন্তু এতে পরিষ্কার না করার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয় না আর এ জন্য ময়লার স্তূপে গড়াগড়ি খাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।)

পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান লাভ সম্ভব না হলেও অর্থনীতিতে ও সামাজিক বিজ্ঞানে আমাদের সাধনা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।

## তথ্যসূত্র

১. Bullivant, Alison, *The Little Book of Humorous Quotations* (Bristol : Parragon, 1994, p. 147

২. Durant, Will, *The Life of Greece* (New York : Simon and Schuster, 1966), p. 643

৩. Scruton, Roger, *Modern Philosophy* (Hammondsworth : Penguin Books, 1994), p. 402

৪. Peter, Laurence J., *Peter's Quotations* (New York : Quill, 1977), p. 383

৫. Scruton, Roger, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৩৯৭

৬. Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science* (London: Routledge, 1991), p. 40

৭. Kelejian, Harry H. & Oates, Wallace E., *Introduction to Econometrics* (New York : Harper and Row, 1974), pp 83-84

৮. Blaug, Mark, *The Methodology of Economics* (Cambridge : Cambridge University Press, 1980), p. 124

৯. উদ্ধৃতি Krugman, Paul, *Peddling Prosperity* (New York : W. W. Norton & Company, 1994), p. 112

১০. Kuhn, J. S., *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago : University of Chicago Press, 1970)

১১. Feyerabend, P. K., *Against Method, Outline of An Anarchist Theory of Knowledge* (London : NLB, 1975)

১২. Gleick, James, *Chaos* (New York : Penguin Books, 1987)

১৩. Krugman, Paul, *The Self-Organizing Economy* (Cambridge : Blackwell Publishers, 1996)

১৪. Maki, Uskali, "Diagnosing McCloskey", *Journal of Economic Literature*, September 1995, vol XXXIV, p. 1303

১৫. Gordon, Scott, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৬৬৭

# পরিভাষা কোষ

## (ইংরেজী থেকে বাংলা)

| | |
|---|---|
| Absentee landlord | অনুপস্থিত ভূস্বামী |
| Accountability | জবাবদিহিতা |
| Adam Smith problem | এডাম স্মিথ সমস্যা |
| Affirmative Action Programme | ইতিধর্মী কার্যক্রম |
| Agency of woman | নারীদের এজেন্সী |
| Alienation | বিচ্ছিন্নতা |
| Alternative technology | বিকল্প প্রযুক্তি |
| Altruism | পরার্থপরতা |
| Assumption | পূর্বানুমান |
| Automation | স্বতশ্চলন |
| Average wage | গড় মজুরি |
| Axioms | স্বয়ংসিদ্ধ সত্য |
| Bastard science | জারজ বিজ্ঞান |
| Beneficiary | উপকারভোগী |
| Big bang approach | প্রচণ্ড আঘাত পন্থা |
| Big push | বিরাট ধাক্কা |
| Biological entity of a nation | জাতির জৈব সত্তা |
| Biological instinct | জৈব তাড়না |
| Birth control | জন্ম শাসন |
| Bonded labour | বন্ধকি দাস |
| Budget deficit | বাজেট ঘাটতি |

| | |
|---|---|
| Bureaucracy | আমলাতন্ত্র |
| Capability Poverty Measure | সক্ষমতার অভাবের পরিমাপ |
| Case study | ঘটনা সমীক্ষা |
| Ceteris Paribus | অন্যসব কিছু অপরিবর্তিত থাকার শর্ত |
| Chain reaction | নিরন্তর প্রতিক্রিয়া |
| Chaos Theory | বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব |
| Class consciousness of the proletariat | সর্বহারার শ্রেণী চেতনা |
| Classical economics | ধ্রুপদী অর্থনীতি |
| Classified loan | শ্রেণী-বিন্যাসিত ঋণ |
| Cognitive instrumentalism | অবধারণমূলক নিমিত্তবাদ |
| Colonial exploitation | ঔপনিবেশিক শোষণ |
| Command economy | নির্দেশ অর্থনীতি |
| Comparative advantage | তুলনামূলক সুবিধা |
| Conditionally | শর্তনির্ভরশীলতা |
| Confidence interval | সম্ভাব্য তথ্যের আস্থার ব্যবধান |
| Conflict of interest | স্বার্থের সংঘাত |
| Consumer | ভোক্তা |
| Contingent | অনিশ্চিত |
| Correlation | সহগমন |
| Cumulative | পুঞ্জীভূত |
| Data | উপাত্ত |
| Decentralization of power | ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ |
| Deductive method | অবরোহ পদ্ধতি |
| Default loan | খেলাপী ঋণ |
| Devaluation of currency | মুদ্রার অবমূল্যায়ন |
| Developing country | উন্নয়নশীল দেশ |
| Development economics | উন্নয়ন অর্থনীতি |
| Development expenditure | উন্নয়ন ব্যয় |
| Disaster prevention measures | দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা |
| Dismal science | হতাশাবাদী বিজ্ঞান |
| Distributional coalition | বণ্টনমূলক জোট |
| Disturbing force | বিশৃঙ্খল শক্তি |
| Drain Theory | সম্পদ-পাচার তত্ত্ব |
| Economic doctrine | অর্থনৈতিক মতবাদ |

| | |
|---|---|
| Economic emancipation | অর্থনৈতিক মুক্তি |
| Economic growth | অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি |
| Economic inequality | অর্থনৈতিক বৈষম্য |
| Economic man | অর্থনৈতিক মানুষ |
| Economic philosophy | অর্থনৈতিক দর্শন |
| Economic stability | অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা |
| Economic theory | অর্থনৈতিক তত্ত্ব |
| Economist of historical school | ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ |
| Economist of mercantile school | বণিকবাদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ |
| Empathy | অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা |
| Empowerment of woman | নারীদের ক্ষমতায়ন |
| Equilibrium | সমস্থিতি |
| Export-oriented economic development | রপ্তানী ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন |
| Failure of the state | রাষ্ট্রের ব্যর্থতা |
| Failures of commission | করার ত্রুটি |
| Failures of omission | না করার ত্রুটি |
| Falsificationism | অসারতা প্রতিপাদনবাদ |
| Feminization of poverty | দারিদ্র্যের মহিলায়ন |
| Fiscal deficit | আর্থিক ঘাটতি |
| Flood Action Plan | বন্যা সম্পর্কিত কর্মসূচী |
| Flood control embankment | বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ |
| Flood proofing measures | বন্যা-প্রতিরোধক্ষম ব্যবস্থা |
| Formulation bias | উপস্থাপনগত পক্ষপাতিত্ব |
| Free market | মুক্তবাজার অর্থনীতি |
| Free riding | মাগনা সওয়ারি |
| Gender discrimination | লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য |
| Gender Empowerment Measure | নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাণ |
| Genetic engineering | প্রজনন প্রকৌশল |
| Gini Coefficient | অসাম্যের সূচক |
| Globalized economic system | বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা |
| Good governance | সুশাসন |
| Gradualism | ধীরপন্থা |

| | |
|---|---|
| Great Disruption | মহাভাঙ্গন |
| Gresham's classic law | গ্রেসামের সনাতন বিধি |
| Gross Domestic Product | স্থূল জাতীয় উৎপাদ |
| Hammurabi's Code | হামুরাবির সংহিতা |
| Health care | স্বাস্থ্য পরিচর্যা |
| Health insurance | স্বাস্থ্য বীমা |
| Hippocratic oath | হিপোক্রেটিসের শপথ |
| Homogeneous | সমজাতীয় |
| Household income | গৃহস্থালী আয় |
| Human capital | মানবিক পুঁজি |
| Human Development Index | মানব উন্নয়ন সূচক |
| Hypothesis | পূর্ব ধারণা |
| Ideological empowerment | আদর্শভিত্তিক ক্ষমতায়ন |
| Imperialism | সাম্রাজ্যবাদ |
| Income inequality | আয়ের বৈষম্য |
| Index of inequality | অসাম্যের সূচক |
| Inductive method | আরোহ পদ্ধতি |
| Industrialized country | শিল্পায়িত দেশ |
| Inequality | বৈষম্য |
| Infant industry | শিশু শিল্প |
| Inferior goods | নিকৃষ্ট পণ্য |
| Infrastructure | অবকাঠামো |
| Institutional sclerosis | প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন |
| Intermediary | অন্তর্বর্তী |
| Intermediate class | অন্তর্বর্তী শ্রেণী |
| International financial institutions | আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ |
| International market | আন্তর্জাতিক বাজার |
| International Monetary Fund (IMF) | আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল |
| International trade | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য |
| Intuition | অন্তর্জ্ঞান |
| Investment | বিনিয়োগ |
| Invisible hand of the market | বাজারের অদৃশ্য হাত |
| Iron law | অমোঘ বিধি |
| Kleptocracy | তস্করতন্ত্র |

| | |
|---|---|
| Knowledge | জ্ঞান |
| Knowledge gap | জ্ঞানের ফারাক |
| Knowledge society | জ্ঞানভিত্তিক সমাজ |
| Labour Force Participation Rate | শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ |
| Landless labour | ভূমিহীন শ্রমিক |
| Law of Diminishing Return | ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি উৎপাদনবিধি |
| Law of Immiserization of the Working Classes | শ্রমিক শ্রেণীসমূহের ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের-বিধি |
| Least Developed Country | স্বল্পোন্নত দেশ |
| Life expectancy | প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল |
| Local government | স্থানীয় সরকার |
| Local infrastructure | স্থানীয় অবকাঠামো |
| Luxury | বিলাস দ্রব্য |
| Macroeconomics | সমষ্টিগত অর্থনীতি |
| Mainstream economics | মূলধারার অর্থনীতি |
| Malpractice insurance | কর্তব্যে অবহেলা বীমা |
| Malthusian trap | ম্যালথুসীয় ফাঁদ |
| Manufacturing industry | প্রক্রিয়াজাত শিল্প |
| Market based solution | বাজারভিত্তিক সমাধান |
| Market demand | বাজারের চাহিদা |
| Market economy | বাজার অর্থনীতি |
| Market failure | বাজারের ব্যর্থতা |
| Market-friendly | বাজার বৎসল |
| Material science | কাঁচামাল বিজ্ঞান |
| Materialistic empowerment | বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন |
| Meltdown | দ্রবীভবন |
| Metaphysics | পরাবিদ্যা |
| Method | প্রকরণ |
| Methodological holism | সমগ্রতাভিত্তিক প্রকরণ |
| Methodological individualism | ব্যক্তিভিত্তিক প্রকরণ |
| Modernization | আধুনিকায়ন |
| Monopolist | একচেটিয়া উৎপাদক |
| Monopoly | একচেটিয়া ব্যবসা |
| Mono-sociality | সামাজিক একক-বন্ধন |

| | |
|---|---|
| Moral dilemma | নৈতিক উভয় সংকট |
| Moral hazard | নৈতিক ঝুঁকি |
| Muti-sociality | সামাজিক বহুবিধ বন্ধন |
| National character | জাতীয় চরিত্র |
| National distinctiveness | জাতীয় স্বাতন্ত্র |
| Neo-classical economies | নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতি |
| Neo-imperialism | নব্য সাম্রাজ্যবাদ |
| New man | নতুন মানুষ |
| Non-agricultural sector | অকৃষি খাত |
| Non-profit organization | লাভের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রতিষ্ঠান |
| Normal goods | স্বাভাবিক পণ্য |
| Objective | বক্তা-নিরপেক্ষ |
| Old boys' network | পুরানো ছাত্রদের চক্র |
| Opportunity cost | বিকল্পের নিরিখে ব্যয় |
| Optimum sequencing | সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরাভিত্তিক |
| Outward-oriented economic development | বর্হিমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন |
| Paradigm | পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আদল |
| Paradigm theory | আদলতত্ত্ব |
| Paradox | সত্যের আপাত স্ববিরোধিতা |
| Patron-client | পোষক-মক্কেল |
| Peer group | সমগোত্র |
| Per capita calorie intake | মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ |
| Per capita food production | মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন |
| Per capita income | মাথাপিছু জাতীয় আয় |
| Petty bourgeoisie | পাতি বুর্জোয়া |
| Philosophical anarchism | দার্শনিক নৈরাজ্য |
| Philosophy of Science | বিজ্ঞানের দর্শন |
| Physical Quality of Life Index | জীবনযাত্রার ভৌতমানের সূচক |
| Physiocratic school of economists | প্রাকৃতিক-বিধিবাদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ |
| Pig philosophy | শুয়রের দর্শন |
| Political economy | রাজনৈতিক অর্থনীতি |
| Poor Law | গরীব আইন |

| | |
|---|---|
| Population control | জন্ম নিয়ন্ত্রণ |
| Positivism | দৃষ্টবাদ প্রত্যক্ষবাদ |
| Post-Industrial Revolution | শিল্প বিপ্লব-উত্তর |
| Predictable corruption | নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি |
| Prediction | ভবিষ্যদ্বাণী |
| Predictive instrumentalism | ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিমিত্তবাদ |
| Pre-industrial economy | প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতি |
| Premise | তর্কের ভিত্তি, মূল প্রতিজ্ঞা |
| Prisoner's dilemma | কয়েদীর উভয় সঙ্কট |
| Private charity | ব্যক্তিগত দান-খয়রাত |
| Private good | ব্যক্তিগত পণ্য |
| Producer | উৎপাদক |
| Productivity | উৎপাদনশীলতা |
| Professional middle class | পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী |
| Profit maximization assumption | লাভ সর্বোচ্চায়নের পূর্বানুমান |
| Pseudo science | মেকি বিজ্ঞান |
| Public goods | গণপণ্য |
| Public policy | গণনীতি |
| Purchasing power | ক্রয় ক্ষমতা |
| Quiet violence | নীরব হিংস্রতা |
| Radical | আমূল সংস্কারপন্থী |
| Random sampling | দৈব চয়ন |
| Rate of economic growth | অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার |
| Rationality | যৌক্তিকতা |
| Reductio ad absurdum | যুক্তির উদ্ভট পরিণতি |
| Reforms | সংস্কার |
| Rent-seeker | অনুপার্জিত মুনাফাখোর |
| Revenue expenditure | রাজস্ব ব্যয় |
| Reverse discrimination | উল্টো ধরনের বৈষম্য |
| Revolutionary | বৈপ্লবিক |
| Rhetoric | বাগ্মিতা |
| Risk | ঝুঁকি |
| Risk diversification | ঝুঁকি বৈচিত্রায়ন |
| Risk management | ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা |

| | |
|---|---|
| Sceptism | সংশয়বাদ |
| School | ঘরানা |
| Scientific theory | বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব |
| Screening | যোগ্যতার বাছাই |
| Segmented | খণ্ডিত |
| Service sector | সেবা খাত |
| Sharecropper | ভাগচাষী |
| Signaling device | যোগ্যতার সংকেত প্রক্রিয়া |
| Significance level | নিশ্চয়তার পর্যায় |
| Skilled labour | দক্ষ কারিগর শ্রেণী |
| Social capital | সামাজিক পুঁজি |
| Social Distance Discounting Theory | সামাজিক দূরত্বের মাপকাঠি তত্ত্ব |
| Social science | সমাজবিজ্ঞান |
| Social security system | সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা |
| Social structure | সামাজিক কাঠামো |
| Socio-biology | সামাজিক-জৈববিজ্ঞান |
| Sociology | সমাজতত্ত্ব |
| Source of knowledge | জ্ঞানের উৎস |
| Special interest group | বিশেষ স্বার্থের গোষ্ঠী |
| State intervention | রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ |
| State-owned enterprises | রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান |
| State-sponsored insurance | রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বীমা |
| Statistical inference | সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান |
| Statistical method | সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি |
| Statutory public authority | সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ |
| Strategic enclave | কৌশলগত ছিটমহল |
| Structural Measures for flood control | বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত ব্যবস্থা |
| Subsidy | ভর্তুকি |
| Subsistence wage | বাঁচার জন্য ন্যূনতম মজুরি |
| Suffrage movement | ভোটাধিকারের আন্দোলন |
| Supervisory managerial class | তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক শ্রেণী |
| Supply curve | সরবরাহ রেখা |
| Sustainable | টেকসই |
| System loss | সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি |

| | |
|---|---|
| Systemic problem | সামগ্রিক কাঠামোগত সমস্যা |
| Tariff | শুল্ক |
| Tax reform | কর-সংস্কার |
| Techne | নৈপুণ্য |
| Technical reliability | কারিগরী নির্ভরযোগ্যতা |
| Technical standard | কারিগরী মান |
| Technological change | কারিগরী পরিবর্তন |
| The Corps of Engineers | সেনাবাহিনীর প্রকৌশল |
| The dictatorship of the proletariat | শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব |
| The Enlightenment | বুদ্ধিবিভাসা আন্দোলন |
| The oppressed | শোষিত শ্রেণী |
| The oppressor | শোষক শ্রেণী |
| The proletariat | সর্বহারা শ্রেণী |
| Theocratic state | ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র |
| Theology | ধর্মতত্ত্ব |
| Totalitarian | সমগ্রতাবাদী |
| Trade reform | বাণিজ্য সংস্কার |
| Traditional bureaucracy | সনাতন আমলাতন্ত্র |
| Transparency | স্বচ্ছতা |
| Tullock paradox | তুলকের আপত-স্ববিরোধী সত্য |
| Type I error | পয়লা কিসিমের ত্রুটি |
| Type II error | দোসরা কিসিমের ত্রুটি |
| Uncertainty | অনিশ্চয়তা |
| Under-estimate | অবপ্রাক্কলন |
| Unearned income | অনুপার্জিত আয় |
| Unearned rent | অনুপার্জিত মুনাফা |
| Unequal distribution of income | সম্পদের অসম বণ্টন |
| Unpredictable corruption | অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি |
| Unskilled labour force | অদক্ষ জনশক্তি |
| Upfront conditionality | প্রাক-কর্মসূচী শর্তনির্ভরশীলতা |
| Utilitarian | হিতবাদী |
| Utopia | স্বপ্নরাজ্য |
| Value addition | মূল্য সংযোজন |
| Verstehen | উপলব্ধি |

| | |
|---|---|
| Vested interest | কায়েমী স্বার্থবাদী |
| Voluntary labour | স্বেচ্ছাশ্রম |
| Voluntary organization | স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান |
| Wage rate | মজুরির হার |
| Weighted average | ভারিত গড় |
| Wellbeing | জীবনকুশলতা |
| Wellbeing of woman | মহিলাদের জীবনকুশলতা |
| Winner-take-all-society | বাজিমাৎ সমাজ |
| Win-win game | উভয় পক্ষের জিতের খেলা |
| World Bank | বিশ্বব্যাংক |
| X-inefficiency | অজানা অকার্যকারিতা |
| Zero sum game | হার-জিতের খেলা |
| Zoning Law | অঞ্চল বিভাগের বিধি |

# পরিভাষা কোষ

## (বাংলা থেকে ইংরেজী)

| | |
|---|---|
| অকৃষি খাত | Non-agricultural sector |
| অজানা অকার্যকারিতা | X-inefficiency |
| অঞ্চল বিভাগের বিধি | Zoning Law |
| অদক্ষ জনশক্তি | Unskilled labour force |
| অনিশ্চয়তা | Uncertainty |
| অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি | Unpredictable corruption |
| অনিশ্চিত | Contingent |
| অনুপার্জিত আয় | Unearned income |
| অনুপার্জিত মুনাফাখোর | Rent-seeker |
| অনুপার্জিত মুনাফা | Unearned rent |
| অনুপস্থিত ভূস্বামী | Absentee landlord |
| অন্যসব কিছু অপরিবর্তিত থাকার শর্ত | Ceteris Paribus |
| অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা | Empathy |
| অর্থনৈতিক দর্শন | Economic philosophy |
| অর্থনৈতিক বৈষম্য | Economic inequality |
| অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি | Economic growth |
| অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার | Rate of economic growth |
| অর্থনৈতিক মানুষ | Economic man |
| অর্থনৈতিক মুক্তি | Economic emancipation |

| | |
|---|---|
| অর্থনৈতিক মতবাদ | Economic doctrine |
| অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা | Economic stability |
| অর্থনৈতিক তত্ত্ব | Economic theory |
| অন্তর্জ্ঞান | Intuition |
| অন্তর্বর্তী শ্রেণী | Intermediate class |
| অন্তর্বর্তী | Intermediary |
| অবরোহ পদ্ধতি | Deductive method |
| অবধারণমূলক নিমিত্তবাদ | Cognitive instrumentalism |
| অবপ্রাক্কলন | Under-estimate |
| অবকাঠামো | Infrastructure |
| অমোঘ বিধি | Iron law |
| অসাম্যের সূচক | Gini Coefficient Index of inequality |
| অসারতা প্রতিপাদনবাদ | Falsificationism |
| আদর্শভিত্তিক ক্ষমতায়ন | Ideological empowerment |
| আদলতত্ত্ব | Paradigm theory |
| আধুনিকায়ন | Modernization |
| আমলাতন্ত্র | Bureaucracy |
| আমূল সংস্কারপন্থী | Radical |
| আয়ের বৈষম্য | Income inequality |
| আরোহ পদ্ধতি | Inductive method |
| আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল | International Monetary Fund (IMF) |
| আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | International financial institutions |
| আন্তর্জাতিক বাজার | International market |
| আন্তর্জাতিক বাণিজ্য | International trade |
| আর্থিক ঘাটতি | Fiscal deficit |
| ইতিধর্মী কার্যক্রম | Affirmative Action Programme |
| উৎপাদক | Producer |
| উৎপাদনশীলতা | Productivity |
| উন্নয়ন অর্থনীতি | Development economics |
| উন্নয়ন ব্যয় | Development expenditure |
| উন্নয়নশীল দেশ | Developing country |
| উপস্থাপনগত পক্ষপাতিত্ব | Formulation bias |
| উপলব্ধি | Verstehen |

| | |
|---|---|
| উপকারভোগী | Beneficiary |
| উপাত্ত | Data |
| উভয় পক্ষের জিতের খেলা | Win-win game |
| উল্টো ধরনের বৈষম্য | Reverse discrimination |
| একচেটিয়া উৎপাদক | Monopolist |
| একচেটিয়া ব্যবসা | Monopoly |
| এডাম স্মিথ সমস্যা | Adam Smith problem |
| ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ | Economist of historical school |
| ঔপনিবেশিক শোষণ | Colonial exploitation |
| কর-সংস্কার | Tax reform |
| করার ত্রুটি | Failures of commission |
| কর্তব্যে অবহেলা বীমা | Malpractice insurance |
| কয়েদীর উভয় সঙ্কট | Prisoner's dilemma |
| কায়েমী স্বার্থবাদী | Vested interest |
| কারিগরী পরিবর্তন | Technological change |
| কারিগরী মান | Technical standard |
| কারিগরী নির্ভরযোগ্যতা | Technical reliability |
| কাঁচামাল বিজ্ঞান | Material science |
| কৌশলগত ছিটমহল | Strategic enclave |
| ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি উৎপাদনবিধি | Law of Diminishing Return |
| ক্রয় ক্ষমতা | Purchasing power |
| ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ | Decentralization of power |
| খণ্ডিত | Segmented |
| খেলাপী ঋণ | Default loan |
| গড় মজুরি | Average wage |
| গরীব আইন | Poor Law |
| গণনীতি | Public Policy |
| গণপণ্য | Public goods |
| গৃহস্থালী আয় | Household income |
| গ্রেসামের সনাতন বিধি | Gresham's classic law |
| ঘটনা সমীক্ষা | Case study |
| ঘরানা | School |

| | |
|---|---|
| জবাবদিহিতা | Accountability |
| জাতির জৈব সত্তা | Biological entity of a nation |
| জাতীয় চরিত্র | National character |
| জাতীয় স্বাতন্ত্র | National distinctiveness |
| জারজ বিজ্ঞান | Bastard science |
| জীবনযাত্রার ভৌতমানের সূচক | Physical Quality of Life Index |
| জীবনকুশলতা | Wellbeing |
| জৈব তাড়না | Biological instinct |
| জ্ঞান | Knowledge |
| জ্ঞানভিত্তিক সমাজ | Knowledge society |
| জ্ঞানের উৎস | Source of knowledge |
| জ্ঞানের ফারাক | Knowledge gap |
| জন্ম শাসন | Birth control |
| জন্ম নিয়ন্ত্রণ | Population control |
| ঝুঁকি | Risk |
| ঝুঁকি বৈচিত্র্যায়ন | Risk diversification |
| ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা | Risk management |
| টেকসই | Sustainable |
| তস্করতন্ত্র | Kleptocracy |
| তুলকের আপত-স্ববিরোধী সত্য | Tullock paradox |
| তুলনামূলক সুবিধা | Comparative advantage |
| তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক শ্রেণী | Supervisory managerial class |
| তর্কের ভিত্তি/মূল প্রতিজ্ঞা | Premise |
| দক্ষ কারিগর শ্রেণী | Skilled labour |
| দার্শনিক নৈরাজ্য | Philosophical anarchism |
| দারিদ্র্যের মহিলায়ন | Feminization of poverty |
| দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা | Disaster Prevention Measures |
| দোসরা কিসিমের ক্রটি | Type II error |
| দৃষ্টবাদ | Positivism |
| দৈব চয়ন | Random sampling |
| দ্রবীভবন | Meltdown |
| ধর্মতত্ত্ব | Theology |
| ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র | Theocratic state |
| ধীরপন্থা | Gradualism |

| | |
|---|---|
| ধ্রুপদী অর্থনীতি | Classical economics |
| নতুন মানুষ | New man |
| নব্য সাম্রাজ্যবাদ | Neo-imperialism |
| নব্যধ্রুপদী অর্থনীতি | Neo-classical economies |
| না করার ত্রুটি | Failures of omission |
| নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাণ | Gender Empowerment Measure |
| নারীদের ক্ষমতায়ন | Empowerment of woman |
| নারীদের এজেন্সী | Agency of woman |
| নির্দেশ অর্থনীতি | Command economy |
| নিশ্চয়তার পর্যায় | Significance level |
| নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি | Predictable corruption |
| নিরন্তর প্রতিক্রিয়া | Chain reaction |
| নিকৃষ্ট পণ্য | Inferior goods |
| নীরব হিংস্রতা | Quiet violence |
| নৈপুণ্য | Techne |
| নৈতিক উভয় সংকট | moral dilemma |
| নৈতিক ঝুঁকি | Moral hazard |
| পয়লা কিসিমের ত্রুটি | Type I error |
| পরার্থপরতা | Altruism |
| পরাবিদ্যা | Metaphysics |
| পাতি বুর্জোয়া | Petty bourgeoisie |
| পুঞ্জীভূত | Cumulative |
| পুরানো ছাত্রদের চক্র | Old boys' network |
| পূর্ব ধারণা | Hypothesis |
| পূর্বানুমান | Assumption |
| পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আদল | Paradigm |
| পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী | Professional middle class |
| পোষক-মক্কেল | Patron-client |
| প্রকরণ | Method |
| প্রক্রিয়াজাত শিল্প | Manufacturing industry |
| প্রচণ্ড আঘাত পন্থা | Big bang approach |
| প্রজনন প্রকৌশল | Genetic engineering |
| প্রত্যক্ষবাদ | Positivism |
| প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল | Life expectancy |

| | |
|---|---|
| প্রাক্-কর্মসূচী শর্তনির্ভরশীলতা | Upfront conditionality |
| প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতি | Pre-industrial economy |
| প্রাকৃতিক-বিধিবাদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ | Physiocratic school of economists |
| প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন | Institutional sclerosis |
| বক্তা-নিরপেক্ষ | Objective |
| বণ্টনমূলক জোট | Distributional coalition |
| বন্যা সম্পর্কিত কর্মসূচি | Flood Action Plan |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত ব্যবস্থা | Structural Measures for flood control |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ | Flood control embankment |
| বন্যা-প্রতিরোধক্ষম ব্যবস্থা | Flood proofing measures |
| বন্ধকি দাস | Bonded labour |
| বণিকবাদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ | Economist of mercantile school |
| বর্হিমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন | Outward-oriented economic development |
| বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন | Materialistic empowerment |
| বাগ্মিতা | Rhetoric |
| বাঁচার জন্য ন্যূনতম মজুরি | Subsistence wage |
| বাজারের অদৃশ্য হাত | Invisible hand of the market |
| বাজারের ব্যর্থতা | Market failure |
| বাজারের চাহিদা | Market demand |
| বাজার অর্থনীতি | Market economy |
| বাজার বৎসল | Market-friendly |
| বাজারভিত্তিক সমাধান | Market based solution |
| বাজেট ঘাটতি | Budget deficit |
| বাজিমাৎ সমাজ | Winner-take-all-society |
| বাণিজ্য সংস্কার | Trade reform |
| বিকল্পের নিরিখে ব্যয় | Opportunity cost |
| বিকল্প প্রযুক্তি | Alternative technology |
| বিজ্ঞানের দর্শন | Philosophy of Science |
| বিচ্ছিন্নতা | Alienation |
| বিনিয়োগ | Investment |
| বিরাট ধাক্কা | Big push |
| বিলাস দ্রব্য | Luxury |

| | |
|---|---|
| বিশ্বব্যাংক | World Bank |
| বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | Globalized economic system |
| বিশৃঙ্খল শক্তি | Disturbing force |
| বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব | Chaos Theory |
| বিশেষ স্বার্থের গোষ্ঠী | Special interest group |
| বুদ্ধিবিভাসা আন্দোলন | The Enlightenment |
| বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব | Scientific theory |
| বৈপ্লবিক | Revolutionary |
| বৈষম্য | Inequality |
| ব্যক্তিগত দান-খয়রাত | Private charity |
| ব্যক্তিগত পণ্য | Private goods |
| ব্যক্তিভিত্তিক প্রকরণ | Methodological individualism |
| ভর্তুকি | Subsidy |
| ভবিষ্যদ্বাণী | Prediction |
| ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিমিত্তবাদ | Predictive instrumentalism |
| ভাগচাষী | Sharecropper |
| ভারিত গড় | Weighted average |
| ভূমিহীন শ্রমিক | Landless labour |
| ভোক্তা | Consumer |
| ভোটাধিকারের আন্দোলন | Suffrage movement |
| মজুরির হার | Wage rate |
| মহাভাঙ্গন | Great Disruption |
| মহিলাদের জীবনকুশলতা | Wellbeing of woman |
| মাগনা সওয়ারি | Free riding |
| মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ | Per capita calorie intake |
| মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন | Per capita food production |
| মাথাপিছু জাতীয় আয় | Per capita income |
| মানব উন্নয়ন সূচক | Human Development Index |
| মানবিক পুঁজি | Human capital |
| মুক্তবাজার অর্থনীতি | Free market |
| মুদ্রার অবমূল্যায়ন | Devaluation of currency |
| মূলধারার অর্থনীতি | Mainstream economics |
| মূল প্রতিজ্ঞা | Premise |
| মূল্য সংযোজন | Value addition |

| | |
|---|---|
| মেকি বিজ্ঞান | Pseudo science |
| ম্যালথুসীয় ফাঁদ | Malthusian trap |
| যুক্তির উদ্ভট পরিণতি | Reductio ad absurdum |
| যোগ্যতার বাছাই | Screening |
| যোগ্যতার সংকেত প্রক্রিয়া | Signaling device |
| যৌক্তিকতা | Rationality |
| রপ্তানী ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন | Export-oriented economic development |
| রাজনৈতিক অর্থনীতি | Political economy |
| রাজস্ব ব্যয় | Revenue expenditure |
| রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান | State-owned enterprises |
| রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বীমা | State-sponsored insurance |
| রাষ্ট্রের ব্যর্থতা | Failure of the state |
| রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ | State intervention |
| লাভ সর্বোচ্চায়নের পূর্বানুমান | Profit maximization assumption |
| লাভের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রতিষ্ঠান | Non-profit organization |
| লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য | Gender discrimination |
| শিল্প বিপ্লব-উত্তর | Post-Industrial Revolution |
| শিশু শিল্প | Infant industry |
| শিল্পায়িত দেশ | Industrialized country |
| শুয়রের দর্শন | Pig philosophy |
| শুল্ক | Tariff |
| শ্রেণী-বিন্যাসিত ঋণ | Classified loan |
| শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ | Labour Force Participation Rate |
| শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব | The dictatorship of the proletariat |
| শ্রমিক শ্রেণীসমূহের ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের-বিধি | Law of immiserization of the working classes |
| শর্তনির্ভরশীলতা | Conditionality |
| শোষক শ্রেণী | The oppressor |
| শোষিত শ্রেণী | The oppressed |
| সত্যের আপাত স্ববিরোধিতা | Paradox |
| সনাতন আমলাতন্ত্র | Traditional bureaucracy |
| সমগোত্র | Peer group |
| সমগ্রতাবাদী | Totalitarian |
| সমজাতীয় | Homogeneous |

| | |
|---|---|
| সমস্থিতি | Equilibrium |
| সমাজবিজ্ঞান | Social science |
| সমাজতত্ত্ব | Sociology |
| সমষ্টিগত অর্থনীতি | Macroeconomics |
| সম্পদ-পাচার তত্ত্ব | Drain Theory |
| সম্পদের অসম বণ্টন | Unequal distribution of income |
| সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরাভিত্তিক | Optimum sequencing |
| সম্ভাব্য তথ্যের আস্থার ব্যবধান | Confidence interval |
| সরবরাহ রেখা | Supply curve |
| সক্ষমতার অভাবের পরিমাপ | Capability Poverty Measure |
| সর্বহারা শ্রেণী | The proletariat |
| সর্বহারার শ্রেণী চেতনা | Class consciousness of the proletariat |
| সহগমন | Correlation |
| সংস্কার | Reforms |
| সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি | Statistical method |
| সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান | Statistical inference |
| সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ | Statutory public authority |
| সংশয়বাদ | Sceptism |
| সমগ্রতাভিত্তিক প্রকরণ | Methodological holism |
| সামাজিক দুরত্বের মাপকাঠি তত্ত্ব | Social Distance Discounting Theory |
| সামাজিক পুঁজি | Social capital |
| সামাজিক বহুবিধ বন্ধন | Muti-sociality |
| সামাজিক একক-বন্ধন | Mono-sociality |
| সামাজিক কাঠামো | Social structure |
| সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা | Social security system |
| সামাজিক-জৈববিজ্ঞান | Socio-biology |
| সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি | System loss |
| সামগ্রিক কাঠামোগত সমস্যা | Systemic problem |
| সাম্রাজ্যবাদ | Imperialism |
| সুশাসন | Good governance |
| সেবা খাত | Service sector |
| সেনাবাহিনীর প্রকৌশল | The Corps of Engineers |
| স্বচ্ছতা | Transparency |
| স্বতশ্চলন | Automation |

| | |
|---|---|
| স্বপ্নরাজ্য | Utopia |
| স্বয়ংসিদ্ধ সত্য | Axioms |
| স্বল্পোন্নত দেশ | Least Developed Country |
| স্বার্থের সংঘাত | Conflict of interest |
| স্বাভাবিক পণ্য | Normal goods |
| স্বাস্থ্য পরিচর্যা | Health care |
| স্বাস্থ্য বীমা | Health insurance |
| স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান | Voluntary organization |
| স্বেচ্ছাশ্রম | Voluntary labour |
| স্থানীয় অবকাঠামো | Local infrastructure |
| স্থানীয় সরকার | Local government |
| স্থূল জাতীয় উৎপাদ | Gross Domestic Product |
| হতাশাবাদী বিজ্ঞান | Dismal science |
| হামুরাবির সংহিতা | Hammurabi's Code |
| হার-জিতের খেলা | Zero sum game |
| হিতবাদী | Utilitarian |
| হিপোক্রেটিসের শপথ | Hippocratic oath |

# নির্ঘণ্ট


অকৃষি খাত ১১০
অজানা অকার্যকারিতা ৯৮
অঞ্চল বিভাগের বিধি ১১১
অতিকেন্দ্রীভূত ঘুষখোর আমলাতন্ত্র ১৪
অতিকেন্দ্রীভূত সৎ আমলাতন্ত্র ১৪
অত্যাচারী শাসক ৭০, ৭১, ১৩৩
অর্থনীতিতে সত্য ১৭০
অর্থনীতির অধ্যাপক ১৫৭
অর্থনীতির ছাত্র ১৫৬-১৫৮
অর্থনীতির দর্শন ১৬২
অর্থনৈতিক অগ্রগতি ৫৭, ৬৩
অর্থনৈতিক অসাম্য ৬৫, ৭৭, ১২৬
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৬১, ৬৪, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭
অর্থনৈতিক দুর্নীতি ১৬
অর্থনৈতিক নীতি বীর ২৬
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬৩, ৬৫, ১৪৭
অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৫, ৭৭, ১২৩
অর্থনৈতিক মানুষ ১৫২-১৫৯
অর্থনৈতিক সংকোচন ৪১
অদক্ষ পরিচালনা ১০০
অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি ১৫
অনিশ্চয়তা ১৫
অনুন্নত দেশ ৪২
অনুপস্থিত ভূস্বামী ৭৫
অনুপযোগী প্রতিষ্ঠান ১৮
অনুপার্জিত আয় ১১৪
অনুপার্জিত মুনাফা ৩১, ১০০
অনুপার্জিত মুনাফাখোর ১৪৭
অন্তর্জ্ঞান ১৬৬
অন্তর্বর্তী শ্রেণী ১২, ৭৪, ৭৫
অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষমতা ১৬৬
অবকাঠামো ২৫, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৪৭
অবকাঠামো নির্মাণ ১০১
অবধারণমূলক নিমিত্তবাদ ১৭১
অবরোহ পদ্ধতি ১৬৩
অবিবাহিত মহিলা ৮৮
অবিবাহিত মায়ের সন্তান ৬৫
অবৈধ বসতি ১১০
অমোঘ মজুরি বিধি ১২৮
অরওয়েল, জর্জ ১২৩
অলসন, মনসুর ২৩-২৪
অশুল্ক বাধা ২৭
অসাম্য ৭৮
অসারতা প্রতিপাদনবাদ ১৬৬, ১৬৭
অসাম্যের সূচক ৬৫
অস্ট্রেলিয়া ১৭, ৬০, ৮৭, ১২৪

আইনস্টাইন ১৬৪
আকবর ১৩৫
আখতার হামিদ খান ১১২-১১৩
আচার্য ১১৯
আত্মকর্মসংস্থান ৭৫
আত্মকল্যাণ ২৪
আর্থিক অসাম্য ৬৪, ৬৫
আদলতত্ত্ব ১৬৭, ১৬৮
আদিম সাম্যবাদী সমাজ ৬৯
আধুনিক অর্থনীতি ৩৭, ১৪৬
আধুনিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ ৩৬
আধুনিক খাত ১৪৬
আধুনিক বিজ্ঞান ৫৭
আধুনিক বিশ্ব ১২২
আধুনিক রাষ্ট্র ১৮, ২৫
আধুনিক শিল্প ১৪৫
আধুনিকায়ন ১৪৪
আনবিক শক্তি ৬২
আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত
শ্রমিক ৭৪, ৭৬
আর্নল্ড, টমাস ১৫১
আন্তর্জাতিক আর্থিক
প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪১-৪২
আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি সংক্রান্ত গবেষণা
পরিষদ ৬
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১২৫, ১৪১, ১৪৬
আন্তর্জাতিক মুদ্রা
তহবিল ৩৭, ৪০-৪১, ১০৫
আপৎকালীন পরিকল্পনা ৩২
আফ্রিকা ৮৩, ১৪৫
আবদুল মান্নান সৈয়দ ৮১
আবুল ফজল ১৩৫
আমন ধান ১০৬, ১০৯
আমার সোনার বাংলা ১২৭
আমলা ১০০
আমলাতন্ত্র ১৫, ২৬, ১৪৭
আমূল সংস্কারপন্থী অর্থনীতিবিদ ৮৯
আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ ১৭০
আলাউদ্দিন খান ১২০
আরসেসিলস ১৬১
আরোহ পদ্ধতি ১৬৩
আসাম ১৩৫
আর্সেনিক দূষণ ৯৭

ইউক্লিড ১৬২, ১৬৩
ইউনুস, ডক্টর ৯
ইউরোপ ৬০, ৬৫, ১০৭, ১২৩
ইংরেজ ১৩৯
ইংল্যান্ড ৭, ৫৬, ৫৮
ইতালী ৮৭
ইতিধর্মী কার্যক্রম ৯০
ইদি আমিন ৩১
ইদ্রিস শাহ ৩৮-৩৯
ইন্ডিয়া অফিস ১৪০
ইন্দোনেশিয়া ৯১, ৯৫, ১০৫
ইবনে বতুতা ১৩২-১৩৩, ১৩৫
ইসলামী জমহুরিয়াত ১০৫
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ৫৮, ১৩৪, ১৪০
ইসিদ্‌দর খান ১৩৫

উগান্ডা ৩১
উচ্চ ফলনশীল বীজ ৪০, ৬২
উচ্চ ফলনশীল শস্য ১০৬, ১০৯
উচ্চবর্ণ ১১৯, ১২০
উচ্চ শিক্ষা, মুসলিম বিশ্বে ১২০
উৎপাদনশীলতা ৮, ১৬, ৭৭, ৯৩
উন্নতজাতের বীজ ৬২
উন্নত দেশ ১৭, ৬৪, ১২৪, ১৪৭
উন্নয়ন ৪২, ৯৪, ১২১
উন্নয়ন অর্থনীতি ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
উন্নয়ন অর্থনীতির ভ্রান্ত নীতিমালা ১৪৭
উন্নয়ন বাজেট ৯৮
উন্নয়ন ব্যয় ৯৮

উন্নয়নশীল দেশ ১৬, ১৭, ২০, ২৬, ৩২, ৪০-৪২, ৪৬, ৬৪, ৬৫, ৯১, ৯৫, ৯৭ ৯৮, ৯৯, ১২৪, ১২৫, ১৩৬,১৪৬, ১৪৭
উন্নয়নের সূচক ৯৪
উপকারভোগী ১০১
উপলব্ধি ১৬৬
উপস্থাপনগত পক্ষপাতিত্ব ১৫৫
উপাধ্যায় সম্প্রদায় ১১৯
উফশী ১০৬, ১০৯
উভয় পক্ষের জিতের খেলা ১৪১
ওয়াকফ ১২০
ওয়াং তু ওয়ান ১৩২
উল্টো ধরনের বৈষম্য ৯০
একচেটিয়া উৎপাদকের সরবরাহ রেখা ১৬১
একচেটিয়া ব্যবসা ১৪, ৪৭, ১০০, ১৬১
একচেটিয়া ব্যবসার লাইসেন্স ১৪
একনায়কত্ব ১৫, ৩১
এগনু, স্পিরো ১৭
এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক ১২১
এডাম স্মিথ সমস্যা ৪
এডামসের স্ত্রী ৮৮
এন্টিফন ৩৬
এন্টিফেনিস ১২০
এম. আই. টি. ১২৩
এরলিক ৬১
এরিস্টটল ৩৬
এরিস্টিপাস ১১৮, ১১৯, ১২০
এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার ৫৭
এশিয়া ৬০, ৭২, ১৪৫
এ্যাসল্যান্ড, এন্ডারস ২৭
ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ ১৪১, ১৪৩, ১৬৩
ঐতিহাসিক যুগ ৬৯

ওয়াইল্ড, অস্কার ১০৬
ওয়াং তু ওয়ান ১৩২
ওলন্দাজ ১০৭
ঔপনিবেশিক শোষণ ১২৫

কড়ি ১৩২
কর্তব্যে অবহেলা বীমা ৫১
কনফুসিয়াস ৭০, ৭১, ১১৯
কনফুসিয়াসবাদ ৮৫
কমিউনিস্ট ১১
কমিউনিস্ট পার্টি ১১, ৭২, ৭৬
কমিউনিজম ৭৮
কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ২৪
কর্মচারীদের বেতন ১৪২
কর্মরত মহিলা ৮৪
কম্পিউটার প্রযুক্তি ১২১
কয়েদীর উভয় সংকট ১৫৭
কর অব্যাহতি ৪
কর ইজারা ১৪
কর-সংস্কার ৪১
করার ত্রুটি ২৫, ১৪৭
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪১
কলেজ শিক্ষা ৯৫
কল্যাণ রাষ্ট্র ৭৬
কঁদরসে, মার্কুই দ্য ৫৮
কার্টার, জিমি ৬১
কামাল সিদ্দিকী ৭৫-৭৬
কার্যকারণের অবশ্যম্ভাবিতা ৩৭
কায়েমী স্বার্থবাদী ২৪, ৩১, ৩২
কারখানাতে তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক শ্রেণী ৭৪
কারস্টেয়ার্স, রিচার্ড ১১১-১১২
কারিগরী পরিবর্তন ৫৩, ৬২-৬৪, ৭১, ৭২, ১২১, ১২২, ১২৪
কার্লাইল ৬৩, ১৪১
কালে, ভি. জি. ১৪৩
কাঁচামাল বিজ্ঞান ৬২
কীর্কেগার্ড ১৬২
কুটির শিল্প ১৪৫
কুন, টমাস ১৬৭-১৬৮

কুমিল্লা শহর ১১১
কুড়িগ্রাম জেলা ১১৩
কৃষক বিদ্রোহ ৭১
কৃষিখাত ১০৯, ১১০
কৃষি ঋণ ৬
কৃষি জমি ৬২
কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা ৬০
কৃষি প্রধান অর্থনীতি ১৪৩-১৪৪
কৃষির প্রযুক্তি ৬০
কৃষ্ণ রমনী ৮১
কেইনস ৩৫, ৬৬, ১২৩, ১২৯, ১৪০
কেইনসীয় অর্থনীতিবিদ ১২৮, ১২৯
কেতাবের লড়াই ৫৬
কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা ১৫
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ১৪
কেন্দ্রীয় সরকার ১০১
কেয়ার ১১৩-১১৪
কোমডো, লা গায়ো ৮১
কোরান ২
কোঁতে, আগস্ট ১৬২
কৌশলগত সিটমহল পদ্ধতি ২৯, ৩০
ক্যানাডা ৮৭, ১২৪
ক্যারিট, মাইকেল ১১-১২, ১৫
ক্লাব অব রোম ৬১
ক্রমহ্রাসমান-বাড়তি-উৎপাদনবিধি ৫৯
ক্রুগম্যান, পল ৪৬, ৪৯, ১৪৮
ক্রুগার, এ্যান ২৫, ১৪৭
ক্রুসেড ১২১
ক্ষুদ্র নিয়োগকারী ৭৪

খনিজ সম্পদ ৬২, ৬৩
খরা ৪০, ১০৬, ১৩১, ১৩২, ১৩৬
খাদ্য উৎপাদন ৬০
খাদ্যের দাম ৫৭
খুলনা শহর ৯৬-৯৭
খৃষ্টান ১৪৩
খোজা ১৩৫

গডউইন, উইলিয়াম ৫৮
গর্ডন, স্কট ৫৭, ৭৬, ১৭১
গড় আয়ু ৪৭
গড় আয়ুর প্রত্যাশা ৪৬, ৯৪
গড় মজুরি ৬৪
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ৩১, ৭৭
গণপণ্য ৪৮
গথিক উপাসনালয় ১২১
গরীব আইন ৭
গরীবদের কর্মসূচী ৯
গান্ধী, মোহন দাস করম চাঁদ ১৪৪, ১৪৫
গুরু ১৩৯, ১২০
গৃহযুদ্ধ ৭৭
গৃহস্থালী আয় ৩
গোমতী নদী ১১১, ১১২
গোমতী বাঁধ ১১১, ১১২, ১১৩
গৌড় ১৩
গ্রীক দার্শনিক ৩৬, ৫৫, ৬৪
গ্রেশাম ১৭
গ্রেশামের সনাতন বিধি ৯

ঘুষ ১২, ১৪, ১৫

চট্টোপাধ্যায় ১১৯
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪২
চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র ১৪৪
চণ্ডীদাস ৮১, ৯৭
চর্যাপদ ১৩১
চরকা কর্মসূচী ১৪৫
চাকরানীর পারিশ্রমিক ৯৩
চাকুরির জন্য মমতা ১৬
চার্চিল, উইনস্টন ৭, ৮
চাণক্য ১৩, ১০৬, ১০৭,১৩১
চাষযোগ্য জমি ৬২
চাঁদপুর শহর ১১৪
চিকিৎসাখাত ৪৬, ৪৯
চিকিৎসা খাতে ব্যয় ৪৬

চিপোলা, কারলো ৬০
চিরাচরিত খাত ১৪৬
চিলি ১৭
চীন ৪৬, ৭০, ৭৪, ৮৩, ৯৫, ১১১
চেম্বার, রবার্ট ১৩৫
চৈতন্য চরণামৃত ১৩৫
চৈতন্যমঙ্গল ১৩১

ছিন্নমূল মানুষ ৭৩
ছোঁয়াচে রোগ ৪৮

জর্জ, হেনরি ১৪৪
জনশক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ১২৪
জনসংখ্যা ৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২, ১০৬, ১২৮
জনসন, স্যামুয়েল ৯
জনস্বাস্থ্য খাত ৪৮
জনস্বাস্থ্য সেবা ৪৮
জলাবদ্ধতা ১০৮, ১১০, ১১১
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৮৬
জবাবদিহিতা ১৯
জয়ানন্দ ১৩১
জাতিসংঘ ২, ৭৪
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ৯৪
জাতিসংঘের মানবউন্নয়ন প্রতিবেদন ৮৮, ৮৯
জাতিসমূহের অভিবাসন ১২১
জাতির চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ১৩৯
জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৪০
জাতির জৈব সত্তা ১৩৯
জাতীয় আয় ৯৩
জাতীয় আয়ের অবপ্রাক্কলন ৯৩
জাতীয় উৎপাদ ৯৩, ১৩৩, ১৪২
জাতীয় সম্পদ ৫৭
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১১
জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ১২
জান্নাত-আবাদ ১২৮
জান্নাত-আল-বিলাদ ১২৮
জাপান ৭১, ৮৭, ১২৩, ১২৪
জাপানী ৮৬
জার্মানি ৭২, ৭৩, ৮৭, ৯৮-৯৯, ১৪১
জারজ বিজ্ঞান ১৫১
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ১৩৫
জ্ঞান ১২১, ১২২, ১২৪, ১৬৩, ১৬৬, ১৭১
জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ১২৫
জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ৬৩, ১২৪
জ্ঞানের উৎস ১৬২
জ্ঞানের ফারাক ১২৫
জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি ৪১
জীবনকুশলতা পরিমাপ ৯৩
জীবনযাত্রার ভৌতমানের সূচক ৯৪
জীবনানন্দ ৮১, ৮২
জীমূতবাহন ১৩৫
জে-লু ৭০
জেফারসন, টমাস ১২৪
জেভনস, স্ট্যানলি ৬১, ১৪০
জেরার্ড, রোনাল্ড ২৮
জৈব তাড়না ৮৫

ঝুঁকি ১৫, ১৬, ৩৭-৩৮
ঝুঁকি বৈচিত্রায়ন ৩৮-৪০
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৩৮

টরেনস, রবার্ট ১৪
টাইমস পত্রিকা ৭
টীকা ৪৮
টেকসই পরার্থপরতা ৯
টেলর, জন ১৩৪
টেলিফোন ৯৯
টোয়েন, মার্ক ১৩৭
ট্রুম্যান, হ্যারি ৩৫, ৩৬
ট্রেড ইউনিয়ন ৩২

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ১২৭
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১২৭-১২৮, ১৪৫

ডাক্তার ৪৭, ৯৬
ডাক্তারদের একচেটিয়া ব্যবসা ৪৯
ডাক্তারদের নৈতিক উভয় সংকট ৫৩
ডাক্তারদের নৈতিক দায়িত্ব ৫২
ডাক্তারদের নৈতিক ভূমিকা ৫০-৫৩
ডাক্তারদের নৈতিক সমস্যার উৎস ৪৯
ডাক্তারদের ফি ৪৫
ডায়নোসিয়াস ১২০
ডিউয়াট্রিপন্ট, ম্যাথিয়াস ২৮
ডিকেন্স, চার্ল ৭
ডুভালিয়র ৩১
ডুরান্ট, উইল ১৮

ঢাকা ১০০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ১৩৫

তথ্য প্রযুক্তি ৬৩
তস্করতন্ত্র ১৫
তুলক, গর্ডন ১৭
তুলকের আপাত স্ববিরোধী সত্য ১৭
তুলনামূলক সুবিধা ১৩৪
তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব ১৪১
তেলের দাম ৬২
তেলের বিকল্প প্রযুক্তি ৬২
ত্রাণ সামগ্রী ৯
ত্রাণ সামগ্রীর আত্মসাৎ ৫
ত্রিপুরা রাজ্য ১৩৫

থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৯৬
থ্যালিস ১২০-১২১

দক্ষ কারিগর শ্রেণী ৭৪
দক্ষ জনশক্তি ১২৪, ১২৫
দক্ষিণ এশিয়া ৮৩, ১০৭, ১৪০,১৪৬, ১৪৮
দক্ষিণ কোরিয়া ৪৭
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ১৪৬
দত্ত, রমেশ চন্দ্র ১৪১, ১৪২
দরিদ্রদের ক্রয় ক্ষমতা ৭৭
দস্যু-কুবের ১৪
দস্যু সরকার ৩২
দাতব্য প্রতিষ্ঠান ৩
দান-খয়রাত ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮
দারিদ্র নিরসন ৫
দারিদ্রের দৃষ্টান্ত ১৪৬
দারিদ্র্যের মহিলায়ন ৮৮
দার্শনিক নৈরাজ্য ১৬৯
দাস ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
দাস প্রথা ৭৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
দাস বিক্রয়ের দলিল ১৩৫
দাস ব্যবসা ১৩৫
দিনার ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
দিরহাম ১৩২
দিল্লীর বাদশাহ ১৩৩
দিল্লীর সুলতান ১৩২
দুর্নীতি ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০
দুর্নীতি সংক্রান্ত নিরপেক্ষ কমিশন ১৭
দুর্নীতি পরায়ণ সরকার ১৫
দুর্নীতিবাজ আমলা ১০০
দুর্দশার যুগ ১২৯
দুর্ভিক্ষ ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৬৩
দৃষ্টবাদ ১৬৩
দেবী, মৈত্রেয়ী ১২৭
দৈব চয়ন ১৬৪
দোসরা কিসিমের ক্রটি ১৬৪, ১৬৫
দ্রব্যমূল্য ১৩৩
দ্রাকমা ১১৮

ধর্ম ১৪৩
ধর্মতত্ত্ব ২, ১৬২
ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ৭৭
ধীরপন্থা ২৭, ২৮, ২৯
ধ্রুপদী অর্থনীতি ৭, ১৩৯, ১৪১

ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্ ৭, ১২৮, ১২৯, ১৪০, ১৬৩
ধ্রুপদী পুঁজিবাদি ব্যবস্থা ২৫
ধ্রুপদী শিক্ষা ১২০

নকল বাজি ৯৫
নজরানা ১৫, ১৩৩
নতুন মানুষ ১২৩
নব্যধ্রুপদী অর্থনীতি ৮৯
নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ ১২৮, ১২৯, ১৫৩
না করার ক্রটি ২৫, ১৪৭
নাইজার ৩২
নাইজিরিয়া ১০৫
নাটোর ৮২, ১২৭
নারী আন্দোলন ৮৬
নারী জীবনের জটিলতা ১৫৫
নারী পুরুষের বৈষম্য ৮৮
নারী শিক্ষা ৯০
(নারীদের *আরও দেখুন* মহিলাদের)
নারীদের আর্থিক অবস্থা ৮৬-৮৭
নারীদের এজেন্সী ৯০
নারীদের ক্ষমতায়ন ৯১
নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাপ ৯১
নারীদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা ৮৫
নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ৮৩
নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন ৮৬, ৮৮, ৮৯
নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৮৭, ৮৮, ৯৯
নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ১৫৫
নিউইয়র্ক ১৭, ৫৩, ১০০, ১২৫
নিউ সাউথ ওয়েলস্ ১৭
নিউটন, আইজাক ৩৭, ৫৭
নিকৃষ্ট পণ্য ৫, ৬, ৯
নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি ১৫৪
নির্দেশ অর্থনীতির দ্রবীভবন ৪৮
নিরন্তর প্রতিক্রিয়া ১৮
নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি ১৫
নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৮৬
নিরুদ্দিষ্ট নারী ৮২, ৮৩, ৮৪
নিসবেট, রবার্ট ৫৬
নীটস ১৬২
নীল বিদ্রোহ ১২৮
নীরব হিংস্রতা ৮৮
নৃপতিবিহীন জনপদ ৭১
নেদারল্যান্ড ৯৫
নেহেরু, জওহরলাল ১৪৫
নৈতিক ঝুঁকি ৪৭
নৈপুণ্য ১২২, ১২৪
নোবেল পুরস্কার বক্তৃতা ১৫৪
নোলস, এল. সি. এ. ১৪২
নৌরজী, দাদা ভাই ১৪১
ন্যূনতম মজুরি ১২৮, ১২৯

পণ্যের মূল্য ১৭
পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ১১৫
পত্রকোষ তত্ত্ব ৩৮
পঞ্চাশের মন্বন্তর ১২৭
পপার, কার্ল ১৬৬
পয়ঃনিষ্কাশন ৯৫, ১০১
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ৯৫
পয়লা কিসিমের ক্রটি ১৬৪
পরাবিদ্যা ১৬২
পরার্থপরতা ৩, ৪, ৮, ৯
পরার্থপরতার অর্থনীতি ৩
পরিচালনা ও মেরামত ৯৮, ১০১
পরিবার ৬৫
পরিবার অবলুপ্তির সমস্যা ৬৫
পরিবেশ ১৫, ৪০, ১০১
পরিবেশগত সমস্যা ১০৯
পরিবেশের বৈচিত্র্যায়ন ৪০
পলিমাটি ১০৬, ১০৮
পল্লী অঞ্চল ৬, ১১০, ১১১
পশ্চিম এশিয়া ৮৩

পাকিস্তান ৮৩, ৯১, ১০৫
পানি ১০১
পানি চুরি ৯৮
পানির অবকাঠামো ১২১
পানীয় জল সরবরাহ ৯৬
পারমিট ২০, ১৪৭
পাল, প্রশান্ত কুমার ১২৭
পিগম্যালিয়ন ১৫৬
পিতৃহীন সমাজ ৬৫
পুঞ্জিভূত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৬৩
পুণ্ড্রনগর ১৩০
পুরানো ছাত্রদের চক্র ৮৯
পুরুষের শোষণ ৮৫
পুরোহিত ১১৯
পুলিশ ১০০, ১৩৯
পুঁজি ২৮, ৬৩, ৬৫, ১২৪
পুঁজিঘন যন্ত্রপাতি ৬০
পুঁজিবাদ ১৪, ৬৯, ৭৭, ১২১
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ২, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১২২-১২৩, ১২৪
পুঁজির ঘাটতি ৯৭
পুরুষালি বিপ্লব ৭২, ৭৩
পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আদল ১৬৭
পূর্ব ইউরোপ ৭২, ৭৩
পূর্ব ধারণা ১৬৭, ১৬৮
পেরো, চার্ল ৫৬
পেশাদারদের সমিতি ২৪
পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৭৪
পোর্টেস, রিচার্ড ২৮
পোষক-মক্কেল ৭৩
পাসক্যাল ৩৮
প্রকল্প ১০০
প্রক্সমায়ার ১১০
প্রক্রিয়াজাত শিল্প ৭৪
প্রগতির ধারণা ৫৬, ৮৭
প্রচণ্ড আঘাত পন্থা ২৭, ২৮, ২৯
প্রজনন কৌশল ৬৪
প্রতিপাদনবাদ ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন ২৮
প্রত্যক্ষবাদ ১৬৩
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৪৬
প্রথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪৭
প্রয়াগের মেলা ১, ২
প্রশাসনিক সংস্কার ২৬
প্রাক্-কর্মসূচি শর্তনির্ভরশীলতা ৪১
প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ৭১-৭২
প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা ১৩৫, ১৩৬
প্রাক্-ব্রিটিশ ভারত ১২৯
প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব অর্থনীতি ১২৮
প্রাক্-শিল্প-বিপ্লব সমাজ ১২৮, ১২৯, ১৩৬
প্রাকৃতিক পরিবেশ ১০৭
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১৬৫, ১৬৬, ১৭১
প্রাকৃতিক সম্পদ ৬৩, ১২৪
প্রাগৈতিহাসিক যুগ ৬৯
প্রাচীন গ্রীস ৯, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১
প্রাচীন চীন ৮৪, ১১৯
প্রাচীন বাংলা ১৩০-১৩১, ১৩৪, ১৩৫
প্রাচীন ভারত ৮৪, ১১৯, ১২০
প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ ৩৬, ১৪১, ১৬৩
প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন ২৩, ২৪
প্রিমাকভ ৪০
প্রোটাগোরাস ১১৮
প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ১৪৩
প্লেগ ১২৯
প্লেটো ২০, ১৪০

ফঁতনেল, বার্নাড দ্য ৫৬
ফতিয়া ইবরিয়া ১৩০
ফরাসী জাতি ৭৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯
ফরাসী মহাফেজখানা ১৩৫
ফরাসী শ্রমিক ১৩৪
ফারম্যাট ৩৮
ফু সোয়ান ৮৪

ফুকুইয়ামা ৬৫, ৮৫, ১৫৫, ১৫৬
ফুখ্‌স, ভিক্টর আর ৮৮
ফেয়েরাবেন্ড ১৬৯
ফ্রাঙ্কলিন, বেনজামিন ৮৩
ফ্রান্স ৫৬, ৫৮
ফ্রিডম্যান, মিল্টন ৪৯, ৫২, ১৬৮
ফ্রিয়েরে, পাওলো ৯০

বক্তা-নিরপেক্ষ উপাত্ত ১৬৭
বঙ্গ দেশের কৃষক ১৪২
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১২৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ১২৭
বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনী ১৪৪
বঞ্চিতা নারী ৮১
বণ্টনমূলক জোট ২৪, ৩২
বণিকবাদী ঘরানার অর্থনীতিবিদ ১৪১
বদ্বীপ ১০৬, ১০৯
বর্ণপ্রথা ৭৭
বর্ধমান জেলা ১১৯
বনলতা সেন ৮১-৮২
বন্ধকি দাস ১৩৫
বন্যা ৪০, ১০৫, ১০৬, ১০৭
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ১০৭, ১১১
বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ১০৯, ১১৩, ১১৪
-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০৭, ১০৯-১১০
বন্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক মুনাফা ১০৯
বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত ব্যবস্থা ১০৭, ১১০
বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ১১০
বন্যা-প্রতিরোধক্ষম ব্যবস্থা ১১৩
বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ ১০৯, ১১১
বন্যার ক্ষতি ১০৬
বন্যার পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় ১০৮
বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ ১২৭
বয়েস, জেমস ৮৮
বসনিয়া ৭৪
বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন ৯০
বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৭
বহুজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ১০৫
বহির্মুখী ও বাজার বৎসল নীতি ১৪৭
বাইবেল ২, ৮৫
বার্ক, এডমুন্ড ২৩
বার্গ, এন্ড্রু ২৭
বাগ্মিতা ১১১, ১৫৮, ১৭০, ১৭১
বাগ্মিতার মাধ্যমে বক্তব্য বোঝানোর প্রয়াস ১৭০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১১১, ১১৪
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১০৯
বাংলাদেশ শ্রমশক্তি সমীক্ষা ১৯৯৫-৯৬, ৭৫
বাংলাদেশের শিক্ষাখাত সমীক্ষা ৯৬
বাংলার তাঁতি ১৩৪
বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা ১৪০
বাংলায় দ্রব্যমূল্য ১১৩
বাঙ্গালী শ্বাশুড়ি ৮৩
বাজার অর্থনীতি ৮-৯, ১৪৭
বাজার ভিত্তিক সমাধান ৫
বাজারের অদৃশ্য হাত ৮
বাজারের চাহিদা ১২২
বাজারের ব্যর্থতা ১৪৭
বাজিমাৎ সমাজ ১২৩
বাজেট ঘাটতি ১৫, ২৫, ৩০
বার্নস্টাইন, পিটার এল ৩৭-৩৮
বাণিজ্য উদারকরণ ২৭, ৩০, ১৪৭
বাণিজ্য সংস্কার ৪১
বার্নিয়ের, ফ্রাঁসোয়া ১৩২
বার্নোলি ৩৮
বার্মার মহিলা ৮৬
বায়ুচালিত শক্তি ৬২
বারবোসা ১৩৫
বার্লিন ৭৩
বিকেন্দ্রীকরণ ১০১

বিচ্ছিন্নতা ৭১
বিজ্ঞান ১৬২, ১৬৩
বিজ্ঞানের দর্শন ১৬২, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭১
বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ১৩২
বিদেশী বিনিয়োগকারী ১৬
বিদ্যুৎ ৯৯
বিদ্যুৎ চুরি ৯৫, ৯৮
বিদ্যুৎ, কারিগরী ক্ষতি ৯৫
বিদ্যুৎ, সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি ৯৫
বিনিময় হার ২৫
বিনিময় হারের অতিমূল্যায়ন ১৪৭
বিনিয়োগ ৯৮, ১২২
বিনিয়োগ ব্যয় ৯৮
বিবর্তনবাদী ৭৭
বিবাহিত মহিলা ৮৪
বিরাট ধাক্কা ১৪৬
বিল ডাকাতিয়া ১০৯
বিলাস দ্রব্য ৫
বিশৃঙ্খল শক্তি ১৬৫
বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব ১৬৯, ১৭০
বিশেষ স্বার্থের গোষ্ঠীসমূহ ২৪
বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৬৩
বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ৩১, ৯৪, ১০০
বিশ্ব ব্যাংক ১৬, ২৮, ৩৭, ৪০, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১০৫, ১২৪
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ১২২
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ৯৫
বিশ্বায়ন ১৪৮
বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ১২৪, ১২৫
বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০
বিসমার্ক, অটোফন ৭, ৮, ৭৬
বুখম্যান, ফ্রাঙ্ক ১৫৩
বুদ্ধিবিভাসা আন্দোলন ৫৬
বেকন, ফ্রান্সিস ২, ৯
বেকার, কার্ল ৫৬
বেকার, গ্যারি এস ৮৯
বেদ ১১৯
বেনিন ৯৫
বেসরকারী খাত ২৭, ১০২
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১৯
বেসরকারীকরণ ৪১
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৬
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ৪৮, ১৬৮
বৈজ্ঞানিক দর্শন ১৬৩
বৈদেশিক ঋণের আসল ১৪১
বৈদেশিক ঋণের সুদ ১৪১
বৈদেশিক সাহায্যদাতাদের নালিশ ৫
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ৯৮
বৈষম্য ১৫, ৪৫, ৫৩, ৬৫, ৭৭, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০৭
বোগারডাস ৪
বেরো ফসল ১০৬
বৌদ্ধ সম্প্রদায় ১৩০
ব্যক্তিগত দান খয়রাত ১৫৭
ব্যক্তিগত পণ্য ৪৮
ব্যক্তিভিত্তিক প্রকরণ ১৫৪
ব্যবসায়ীদের জোট ২৪
ব্যাংক ৪৫, ৯৭
ব্যভিচার ২৩
ব্রাজিল ৬৫
ব্রিটিশ শাসন আমল ১২
ব্রিটিশ অর্থনীতি
ব্রিটেন ৮৭
ব্লাউ, মার্ক ১৬৭

ভগবান বুদ্ধ ৭৬
ভর্তুকি ৬, ২৬, ১০০, ১০১
ভল্টেয়ার ৪৫, ৫২
ভবিষ্যদ্বাণী ৫৫-৫৬, ৫৮, ৬০, ৬৬, ৭১, ৭৩, ১২০, ১৫২, ১৬৯
ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিমিত্তবাদ ১৬৮
ভাগচাষী ৭৫, ৭৬

ভারত ৭৭, ৭৩, ৯১
ভারতে বহির্বাণিজ্যের কুফল ১৪০
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৪৪
ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তা ১৪৪
ভারতের জনসংখ্যা ১৪৫
ভারতীয় অর্থনীতি ১৩৯, ১৪০, ১৪৩,
১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১১
ভারিত গড় ৯৫
ভিক্টোরীয় যুগ ১৫৪
ভিঞ্চি, লিউনার্দো দ্য ৮১
ভিটগেনস্টাইন, লুডভিগ ১৬১
ভিয়েনার দার্শনিক ১৬৩
ভূমিদাস ১৩৫
ভূমিসংস্কার ৭৫
ভূমিহীন শ্রমিক ৭৫, ৭৬
ভৌত অবকাঠামো ২৫, ১৪৭
ভৌত কাঠামোর অকার্যকরতা ২৫
ভৌত পুঁজি ১২৪

মজুমদার, গোপীনাথ ১৩৫
মজুরি ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৩৫
মজুরি সম্পর্কে অমোঘ বিধি ১২৮
মঞ্জুশ্রী মূলকল্প ১৩০
মর্তুজা, ডাক্তার ৫৩
মধ্যপ্রাচ্য ৫৫
মধ্যযুগের বাংলা ১৩১, ১৩২, ১৩৩,
১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ১৩, ১৩১
মন্দ দেনা ২৮
মনুস্মৃতি ১২-১৩, ৮৪, ১০৭, ১১৯
মবুতু সরকার ৩১
মরিস, মরিস ডি ৯৪
মলুয়া লোকগীতি ১৩-১৪, ১৩১
মসলিন ১৪
মহাজন ৪০, ৪১
মহাভাঙ্গন ৬৫
মহামারী ৫৮
মহাস্থান লিপি ১৩০
(মহিলাদের *আরও দেখুন* নারীদের)
মহিলাদের অবসর ৮৮
মহিলাদের অধিকারপন্থী মতবাদ ৯০
মহিলাদের আয় ৮৭-৮৮
মহিলাদের মজুরির হার ৮৮
মহিলাদের জীবনকুশলতা ৮৮
মহিলাদের মৃত্যুর হার ৮৩
মাইহার ১০
মাও সে তুং ৭২-৭৩
মার্কভিজ ৩৮
মার্কস, কার্ল ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫,
৭৬, ১২১, ১২৯, ১৪০, ১৪৩
মার্কসবাদ ৮৫, ১৪১
মার্কসবাদী আন্দোলন ৭৭
মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ ১২৮
মার্কসের তত্ত্ব ৭৫, ৭৬, ১৪৫
মার্কিন কংগ্রেস ১১০
মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ১২১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩, ৮, ১৪, ১৫, ৪৫, ৪৬,
৪৭, ৫০, ৫৩, ৬১, ৬২, ৬৫, ৭৪, ৭৭,
৮৩, ৮৭, ৯৬, ১০২, ১২১, ১২৩,
১২৪, ১৩৬, ১৪১, ১৫৬, ১৫৭
মার্কিন শিক্ষার্থী ১১৭
মার্কিন সিনেট ১১০
মাগনা সওয়ারি ১৫৭, ১৫৮
মাছের জীবনচক্র ১০৮
মাৎস্যন্যায় ৭১
মাথাপিছু আয় ৬৫, ৯৪
মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ৮৮
মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ৬০
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৬
মাধ্যমিক শিক্ষা ৯৬, ১২৩
মাথাপিছু আয় ৬৫
মাথাপিছু জাতীয় আয় ৯৩
মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ৮৮, ৯১

মানব উন্নয়ন সূচক ৯৪
মানব দারিদ্র্য সূচক ৯৪
মানব সম্পদ উন্নয়ন ১২৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ৮৯
মানব সম্পদ বিনিয়োগ ১২৪
মানবিক পুঁজি ১২২
মানুষের লোভ ১৫৩
মায়েদের আয়ুষ্কাল ৮৫
মালয়েশিয়া ৯১, ১০৫
মার্শাল, আলফ্রেড ১২৯, ১৪০, ১৬৭
মিথ্যুকের আপাত-স্ববিরোধী সত্য ১৬২
মিরডাল, গুনার ১৫
মিল, জন স্টুয়ার্ট ১৪০, ১৫২, ১৫৩, ১৬৫
মিল, জেমস ৭, ১৪০
মিশর ৮৩, ১২১
মুকুন্দরাম ১৩
মুক্তবাজার অর্থনীতি ৯০
মুখার্জী, রাধা কুমুদ ১৬৩
মুখোপাধ্যায় ১১৯
মুদাররিস ১২০
মুদ্রার অবমূল্যায়ন ৪১
মুনাফা ১৯, ৫৭, ১২২
মূলধারার অর্থনীতি ১৫৫, ১৫৬
মূলধারার ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব ১৪১
মূল্যস্ফীতি ১৫
মেয়েলি বিপ্লব ৭১, ৭২
মেরামত ও পরিচালনার জন্য ব্যয় ৯৮, ৯৯
মেকি বিজ্ঞান ১৫১
মেডিক্যাল বিল ৪৫
মেয়ার, শেভালিয়ে দ্য ৩৮
মোগল আমল ১২৮
মোনালিসা ৮১
মোয়াভ, আব্রাহাম দ্য ৩৮
মোল্লা নস্‌রুদ্দীন ২৭, ২৮, ৩৫-৪৩, ১৫৯
মৌলবাদী খ্রীস্টান ৭৬
ম্যাককুলক, র‍্যামজে ১৪০
ম্যাকলস্কি ১৭০, ১৭১
ম্যাকিনন, রোনাল্ড ২৮
ম্যাকিয়াভেলি, নিকোলো ৩০
ম্যানরিক, সিবাস্তিয়ান ১৩২
ম্যান্ডারিন ১১৯
ম্যালথুস, টমাস রবার্ট ৭, ৫৭-৫৮, ৬১, ১২৮, ১৪০
-জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব ৫৮
ম্যালথুস, ডেনিয়েল ৫৮
ম্যালথুসীয় ফাঁদ ১২৮
ম্যালথুসের সূত্র ৫৮-৬১

যুক্তরাজ্য ৭, ৪৭, ৮৩
যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ বিভাগ ৬১
যুক্তরাষ্ট্রের তৈল সম্পদ ৬১
যুক্তির উদ্ভট পরিণতি ৫৯
যুদ্ধ ১২৯
যোগ্যতার বাছাই ১২২
যোগ্যতার সংকেত প্রক্রিয়া ১১২
যৌক্তিকতা ১৫৪

রক্ষণাবেক্ষণ খাত ৯৮, ১১৪
রক্ষণাবেক্ষণে জন্য সম্পদ ৯৮
রজার্স, উইল ১৮, ২০, ৯৫
রবিনসন, জোয়ন ২৭
রবিন্স, লায়নেল ১৫৪
রাজনৈতিক অর্থনীতি ৫৮, ৯৩, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১৫২
রাজস্ব ২৬, ১৩৩
রাজস্ব বাজেট ৯৮
রাজস্ব ব্যয় ৯৮
রানাডে ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫
রানী প্রথম এলিজাবেথ ৭
রামায়ণ ৭১
রায়নাল, আবে ১৪
রাশিয়া ৮৩, ৮৭
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ২৭, ২৮, ৩১
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ ২৭

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ৯৭
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ১৮
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বীমা ৭
রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব ৭৬
রাষ্ট্রীয় খাত ১৯
রাষ্ট্রের আর্থিক ঘাটতি ২৫
রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ২৫
রাষ্ট্রের ত্রুটি ১৪৭
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ২৭
রাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি ২৫
রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ২৫, ১৪৭
রাসেল, বার্ট্রান্ড ১৬২
রাসকিন, জন ১৫১
রিকার্ডো, ডেভিড ৭, ৫৭, ১২৮, ১৪০, ১৪১, ১৬৩
রিখ, রবার্ট বি ১২৩
রূপাজীবা ৮২-৮৩, ৮৪
রেনেসাঁ যুগের চিত্রকর ৫৭
রোগী ৪৭, ৯৬
রোজ, এ, এল ৮১
রোম ১২১
রোমান্টিক ঘরানার অর্থনীতিবিদ ১৪৩, ১৪৪
রোমান্টিক মতবাদ ৭৬
রোমার, পল ৬৩-৬৪

লন্ডন ১০০
লাইবনিজ ৩৮
লাইবেনস্টাইন, হার্ভে ৯৭-৯৮
লাইসেন্স ১৪, ২০, ১৪৭
লাইসেন্স রাজ ১৪৭
লাওজু ১১৯
লাভ সর্বোচ্চায়নের পূর্বানুমান ১৬৮
লাভের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রতিষ্ঠান ৩
লাল, দীপক ১৪৭
লালবাগের কেল্লা ১৩৩
লিঙ্গভিত্তিক আর্থিক বৈষম্য ৮১, ৮৯
লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সমস্যা ৮৮, ৮৯, ৯১
লিপটন, ডেভিড ২৭
লুকসেমবার্গ, রোজা ১৪৩
লুণ্ঠন ১৪
ল্যাতিন আমেরিকা ৭২
ল্যান্ডিস, ডেভিড এস ৭১
ল্যামিয়ের, এমিলিয়া ৮১

শ, জর্জ বার্নাড ২৬, ২৫২
শক্তিচালিত পাম্প ৯৭
শর্তনির্ভরশীলতা ৪০-৪১
শহরাঞ্চল ১১০
শাক্য মুনি ৭৬
শায়েস্তা খান ১৩৩, ১৩৫
শিক্ষা খাত ১২৫
শিক্ষার্থী ১১৯
শিক্ষার আদর্শ ১১৭
শিক্ষার উন্নয়ন ১২৫
শিক্ষার চাহিদা ১২২
শিক্ষার ভূমিকা ১২৪
শিক্ষার লক্ষ্য ১১৭, ১১৯, ১২০
শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি ১৪৪
শিল্পপতিদের জোট ২৪
শিল্প বিপ্লব ৭২
শিল্প বিপ্লব-উত্তর ইউরোপ ৫৭
শিল্পায়ন ১৪৪, ১৪৮
শিল্পায়িত দেশ ৪৬
শিল্পোন্নত দেশ ৩, ৪, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১২৩
শিশু মৃত্যুর হার ৯৪
শিশু শিল্প ১৪৬
শুয়রের দর্শন ১৫১
শুল্কের হার ২৭
শেয়ার ৪৫
শেয়ার বাজার ৪৫
শোষক শ্রেণী ৭৪
শোষণ ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৭, ৮৫
শোষণ ব্যবস্থা ৭৭

শোষণের স্তর ৭৫
শোষিত শ্রেণী ৭১, ৭৪
শ্রমবাজারে নারী ৯৩
শ্রমিক ৭৪
শ্রমিক শ্রেণী ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬
শ্রমিক শ্রেণীসমূহের ক্রমবর্ধমান
দুর্দশায়নের বিধি ৭২, ৭৬
শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ২৪, ৭৫
শ্রমিকদের মজুরির হার ৫৭, ৭২, ১৩৩
শ্রমের বাজার ৮৯, ৯০
শ্রমের বাজারে পুরুষদের একচেটিয়া
নিয়ন্ত্রণ ৯০
শ্রমের বাজারে নারীদের অবস্থান ৯১
শ্রীলঙ্কা ৪৭
শ্রীহট্ট ১৩১
শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ৯৫-৯৬
শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ ৯৭

সক্রেটিস ১১৮, ১২০, ১৬৩
সক্ষমতার অভাবের পরিমাপ ৯৪
সংখ্যাতত্ত্ব ১৭১
সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান ১৬৪
সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ১৬৪
সংবংগীয় গোবর্ধন ১৩০
সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ৯৭
সংশয়বাদ ১৬১, ১৬২
সংস্কার ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮,
৩০, ৩১, ৪১, ১০১, ১০২
সংস্কার বাস্তবায়নের পরম্পরা নির্ণয় ২৮
সংস্কারের কৌশল সম্পর্কে মতবাদ ২৭
সড়ক ও জনপথ বিভাগ ১১৪
সড়ক ব্যবস্থা ৯৭
সত্য ৩৬
সত্যের আপাত স্ববিরোধিতা ১৬২
সদুক্তি কর্ণামৃত ১৩১
সনাতন আমলতন্ত্র ২৬
সফিস্ট ১১৮
সর্বনিম্ন মজুরি ৬৪
সর্বহারা শ্রেণী ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬
সর্বহারাদের বিপ্লব ৭২
সর্বোচ্চ শ্রেণীর গড় মজুরি ৬৪
সমষ্টিগত অর্থনীতি ১৪৭
সমগ্রতাভিত্তিক প্রকরণ ১৫৪
সমগ্রতাবাদী রাষ্ট্র ৭৬
সমাজতন্ত্র ৬৯, ৭৬, ৭৮
সমাজতন্ত্রের আদর্শ ৭৬
সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ২৫
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ৭২
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ১২৩
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রবীভবন ৭২
সমাজবিজ্ঞানের রানী ১৫১
সমাজের ধনবণ্টন ৯৪
সম্পদ পাচার ১৪১, ১৪২
সম্পদ-পাচার তত্ত্ব ১৪১, ১৪৩
সম্পদের বৈচিত্র্যায়ন ৩৮
সম্পদের অসম বণ্টন ১৩৬
সম্পদের সুষম বণ্টন ৭৭
সম্ভবশ্রেষ্ঠ পরম্পরাভিত্তিক পদ্ধতি ২৯, ৩০
সম্ভাব্য তথ্যের আস্থার ব্যবধান ১৬৪
সরকারী খয়রাত ৮
সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৯৬
সরকারের আয়তন ২৬
সরকারের নিয়ন্ত্রণ ২৭
সরকারের বাজেট ঘাটতি ২৫
সরবরাহ রেখা ১৬১
সলিমুল্লাহ হল ৫৩
সাইমন, জুলিয়ান ৬১-৬২
সাউদি, রবার্ট ১৫১
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে ১২৭
সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ৩০
সার্বিয়া ৭৪
সামগ্রিক কাঠামোগত সমস্যা ১৮
সামষ্টিক অর্থনীতি ১৫
সামাজিক অবকাঠামো ১৪৭

সামাজিক ন্যায় বিচার ১৬
সামগ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতি ৯৫
সামাজিক অবকাঠামো ২৫
সামাজিক কাঠামো ৬৫, ৭১
সামাজিক কাঠামোর অকার্যকরতা ২৫
সামাজিক-জৈববিজ্ঞান ৪
সামাজিক দূরত্ব ৪
সামাজিক দূরত্বের মাপকাঠি তত্ত্ব ৪
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৭, ৮, ৭৬
সামাজিক পুঁজি ৬৫, ১৩৩
সামাজিক একক-বন্ধন ৭৩
সামাজিক বহুবিধ বন্ধন ৭৩
সামাজিক বৈষম্য ১০৭
সাম্যবাদী আন্দোলন ১১
সাম্রাজ্যবাদ ১১, ৭৩, ১৪১-১৪৩, ১৪৬
সার ৬, ৬২, ১০৬
সিং, খুশওয়ান্ত ৯৯
সিংগার, ম্যাক্স ৬২, ৬৩
সিনিয়র ৭
সিরাজগঞ্জ শহর ১১৪
সিলেট ১১৫
সুইডেন ৬৫, ৮৭, ৮৮
সুদের ব্যয় ৩০
সুদের হার ২৫
সুশাসন ৯৮, ৯৯, ১০২
সে, জঁ ব্যাপটিস্ট ১৪০
সেক্সপীয়র ৮১
সেচ ৬২, ৯৭, ১০১, ১০৬
সেন, অমর্ত্য ৭, ৮২, ৮৩, ৯০, ১৫৪
সেন্টপিটার ১৬৮
সেনাবাহিনীর প্রকৌশল সংগঠন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৯-১১০
সেবাখাত ৭৪, ৭৫
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ৯৯
সেবার নিয়ন্ত্রণ ১০০
সেবার মূল্য ২৭, ১০০
সোনার বাংলা ১২৭, ১৩০, ১৩৬
সোভিয়েত রাশিয়া ৭৪
সৌদি আরব ৪৬
সোমালিয়া ২
সৌরশক্তি ৬২
স্যাকস, জেফরি ২৭
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ১৯
স্যামুয়েলসন ১২৩, ১৬৬
স্কট, মাইকেল ১১
স্টুয়ার্ট, জেমস ১৩৮
স্নায়ুযুদ্ধ ২৫
স্থানীয় অবকাঠামো ১০০
স্থানীয় উপকারভোগী ১০১
স্থানীয় নেতৃত্ব ১০১
স্থানীয় সেবা ১০১
স্থিতিশীলতা ৬৪
স্থূল জাতীয় আয় ৯৩
স্থূল জাতীয় উৎপাদ ৪৫, ৪৬
স্পেন ৩১, ১১১
স্পেন্সার, হার্বার্ট ১৬৬
স্বচ্ছতা ১৯
স্বর্ণযুগ ৫৫, ১২৯
স্বতশ্চলন ৬৪
স্বয়ংসিদ্ধ সত্য ১৬২
স্বল্পোন্নত দেশ ৪৬
স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৭
স্বাভাবিক পণ্য ৫, ৬
স্বাস্থ্য খাত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯
স্বাস্থ্য বীমা ৪৭, ৪৮, ১০২
স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা ৪৮
স্বাস্থ্য সেবা ৪৮, ৫৩
স্বাস্থ্যসেবার প্রতিযোগিতামূলক দাম ৪৮
স্বেচ্ছাশ্রম ৩
স্বৈরাচারী সরকার ৩১
স্মিথ, এডাম ২, ৩, ৩৬, ৫৭, ১৩৯

হংকং ১৭
হতাশাবাদী বিজ্ঞান ৬৩, ১৫১

হবস ১৪৫
হবসন ১৪৩
হল্যান্ড ১০৭
হর্ষবর্ধন ১, ২, ৯
হস্তচালিত নলকূপ ৯৬-৯৭
হাইলিবারি কলেজ ৫৮, ১৪০
হাইতি ৩১
হাচিনসন, টি. ডাবলু ১৬৬
হার্টম্যান, বেটসি ৮৮
হার্ডার ১৩৯
হার্ডি, জি. এইচ ৪২
হান্টিংটন ১৪
হামুরাবির সংহিতা ৫০
হার-জিতের খেলা ১২৫, ১৪১
হারবারগার, আর্নল্ড সি ২৬
হিউম, ডেভিড ৪
হুগলী জেলা ১৩৫
হুতোম পেঁচার নকসা ১২৮
হিকস, জন ২৫
হেগেল ১৩৯
হিতবাদ ৭
হিন্দু ধর্ম ৫৫, ৮৫, ১৪৩
হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার ১৪৬
হিপোক্রেটিসের শপথ ৫১-৫২
হ্যানসন ৬১

Against the Gods the Remarkable Story of Risk 37-38
An Essay on the Principle of Poulation as it affects the Future Improvement of Society with remarks on the speculations or Mr. Godwin, M. Condorect and other 58
An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations 36, 139
Asian Drama 15
*Ceteris paribus* 165
Limits to Growth 61
*Modus ponens* 164
*Modus tollens* 164
Philosophy of History
Poverty and the Un-British Rule in India 141
The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasruddin 38
The Theory of Moral Sentiments 3
Wealth of Nations 3

## ইউপিএল প্রকাশনা

দ্বিজেন শর্মা
নিসর্গ, নির্মাণ ও নান্দনিক ভাবনা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বাঙালীর জাতীয়তাবাদ

মঈদুল হাসান
মূলধারা '৭১

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
যথাশব্দ: বাংলাভাষার প্রথম ভাব-অভিধান

এ. কে. নাজমুল করিম
*অনুবাদ*: রংগলাল সেন ও *অন্যান্য*
পরিবর্তনশীল সমাজ:
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

ভিস্ম সাহনি
আবু জাফর *অনূদিত*
তমস

এম. রুহুল আমিন
গল্পে গ্রিক ট্রাজেডি সমগ্র

শ্যামলী ঘোষ
আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১

নারিয়াকি নাকাজাতো ও *অন্যান্য*
পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১৮৭০-১৯১০

জয়া চ্যাটার্জী
বাঙলা ভাগ হল
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও
দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭

ISBN 978 984 8815 31 1
9 789848 815311